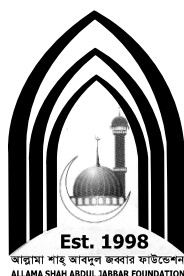


কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের বিধান

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের বিধান

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

টাকা ও উপাত্ত সম্পাদনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন হাসনাত, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১৩, জামাদিউস সানী ১৪৩৪, বৈশাখ ১৪২০

প্রকাশনা ক্রমিক: ৯৪, বিষয় ক্রমিক: ০৩

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফা মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ২০০ [দুইশত] টাকা মাত্র

Quran-Sunnah Alope Namazer Bidhan: By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 200

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

www.sajbd.org

সূচিপত্র

আহ্বান	০৫
প্রাথমিক কথা	০৬
সালাতের বিবরণ	০৬
সালাতের গুরুত্ব	০৭
সালাতের ফযীলত	১৩
ইসলামে সালাতের গুরুত্ব	১৫
সালাতের প্রকার	২৭
সালাতের শর্তাবলি	২৯
সালাতের রুকনসমূহ	৩০
সালাতের ওয়াজিবসমূহ	৩২
সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ	৩৩
জামাআতে নামায	৩৬
কুরআন দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ	৪৮
সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অবলম্বন	৫১
গোসলের বিবরণ	৫৯
তাওয়াম্মুমের বিবরণ	৬৭
অযুর বিবরণ	৭২
ইসতিনজার বিবরণ	৭৯
সালাত আদায়ের ওয়াক্ত ও সময়মতো সালাত আদায়	৮২
হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা	৯১
বিতরের নামায	৯৬
জুমার নামায	৯৬
সুন্নত ও নফল নামাযের সময়	৯৬
দু'ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়ার হুকুম	১০০
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময়	১০৩
নামাযের নিষিদ্ধ সময়সমূহ	১০৫
নামাযের মাকরুহ সময়সমূহ	১০৬
কুরআনের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ	১০৭

কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায়	১০৯
ইসলামের প্রথম কিবলা কোনটি?	১১৫
কিবলা পরিবর্তনের সময়	১১৬
যে-মসজিদে কিবলা পরিবর্তন সংঘটিত হয়	১১৬
কিবলা পরিবর্তনের কারণ	১১৭
কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা	১১৮
মুসলমানদের কিবলা	১২১
নামাযে কিবলামুখী হওয়ার হুকুম	১২৩
সালাত আদায়ের পদ্ধতি	১৩১
কাসারের বিবরণ	১৩৪
নামায আদায়ের পদ্ধতি	১৪৩
সালাতে কুরআন পাঠ এবং তাহাজ্জুদের সালাত	১৫৩
তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ	১৫৮
নামাযের মধ্যে কিরআতের সর্বনিম্ন পরিমাণ	১৬৭
নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার বিধান	১৬৭
ইমামের পেছনে কিরআত পড়ার বিধান	১৬৮
প্রত্যেক রাকাআতে কিরআত ফরয কিনা	১৭৩
শেষ দু'রাকাআতের কিরআতের হুকুম	১৭৪
কোন নামাযে কোন সূরা পড়া মুস্তাহাব	১৭৫
সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ অর্জন করা	১৭৬
মুমিনের পরিচয়	১৮০
মুমিনের সাতটি গুণাবলি	১৮৪
সালাত নিয়ে উপহাসকারীদের পরিণাম	১৯৯
মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্কের বৈধ ও অবৈধ দিকসমূহ	২০৪
শরয়ী বিধি-বিধান নিয়ে উপহাসকারীদের হুকুম	২০৫
মুনাফিকের সালাত আদায়ের বর্ণনা	২২৫
মুনাফিকদের পরিচয়	২২৯
রিয়াজ বিবরণ	২৪৩
প্রমাণঞ্জি	২৫০

আহ্বান

সালাত বা নামায ইসলামের অন্যতম রুকন বা প্রধান ইবাদত। নামাযকে সকল আমলের জননী বলা হয়। এটা মুমিন ও কাফিরদের মাঝে প্রার্থক্যকারী ইবাদত। আল-কুরআনের প্রায় ৮২ স্থানে সালাত কায়েমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন- বলা হয়েছে, ‘আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ করুন এবং নিজেও সেটার ওপর অটল থাকুন।’^১

সালাত কায়েমের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরী করল।’^২

সুতরাং প্রত্যেকের ওপর কর্তব্য হলো যথানিয়মে যথাসময়ে সালাত আদায় করা। আর কিয়মতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের।

এই গ্রন্থে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ নামাযের ওপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব ও তথ্য-সহকারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক-পাঠিকা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক।

মহান আলহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে যথাযথভাবে নামযের যাবতীয় আহকাম জানার ও আদায় করার তওফীক দিন। আমীন।

০১ এপ্রিল ২০১৩
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

^১ আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১৩২: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

^২ আত-তাবারানী, আল-মুজামিল আওসাত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩, হাদীস: ৩৩৪৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক

থেকে বর্ণিত: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جَهْرًا»

প্রাথমিক কথা

সালাতের বিবরণ

আভিধানিক অর্থ

صَلَاةُ (সালাত) শব্দটি اسْمٌ مَصْدَر (ক্রিয়ামূল) এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে صَلَوَاتٌ (সালাওয়াত) স্থান-কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থ ব্যবহার করে। যেমন—

১. আলাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে: اِلٰهِيَّةٌ (রহমত) তথা অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি।
২. বন্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে: اِلْدُعَاءُ (দুআ) তথা প্রার্থনা।
৩. ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে: اِلْاِسْتِغْفَارُ (ইস্তিগফার) তথা ক্ষমা প্রার্থনা।
৪. নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে: দরুদ।
৫. পশু-পাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে: তাসবীহ।
৬. এখানে নির্দিষ্ট আরকান-আহকামের সমষ্টি নামায অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সালাতের পরিভাষিক সংজ্ঞা

১. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন,

عِبَارَةٌ عَنِ الْأَرْكَانِ الْمَعْهُودَةِ وَالْأَفْعَالِ الْخُصُوصَةِ .

‘কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টিই হল সালাত।’^১

২. মু’জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوصَةُ الْمُبَيَّنَةُ خُذُودَ أَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيعَةِ.

‘সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, ইসলামী শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সীমা বর্ণিত আছে।’^২

৩. ইমাম শরীফ আল-জুরজানী رحمته الله تعالى বলেন,

عِبَارَةٌ عَنِ أَرْكَانٍ مَّخْصُوصَةٍ، وَأَذْكَارٍ مَّعْلُومَةٍ، بِشَرَائِطٍ مَّخْصُورَةٍ فِي أَوْقَاتٍ مُّقَدَّرَةٍ.

^১ (ক) আল-বাবরতী, আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ২১৬; (খ) মাওলানা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত লি-হল্লি আওয়ীয়াতিল মিশকাত, খ. ১, পৃ. ২২০

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, আল-মু’জামুল ওয়াসীত, খ. ১, পৃ. ৫২২

‘সালাত একটি ইবাদত, যার জন্য কিছু রোকন রয়েছে এবং তা নির্ধারিত কিছু যিকর (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করতে হয়।’^১

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থাকারের মতে,

الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ أَقْوَالَ وَأَفْعَالًا مَخْصُوصَةً، مُفْتَتَحَةً بِتَكْبِيرِ اللَّهِ تَعَالَى، مُحْتَمَّةٌ بِالتَّسْلِيمِ.^২

৫. আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআর প্রণেতা বলেন,

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، مُحْتَمَّةٌ بِالتَّسْلِيمِ، بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ.

‘নির্দিষ্ট শর্তাদিসহ বিশেষকিছু কথা ও কাজকে সালাত বলে, যা শুরু হয় তাকবীর দিয়ে এবং শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।’^৩

মোটকথা নির্দিষ্ট কিছু রুকনসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম সালাত। যা আলাহ তাআলা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর আর শেষে রয়েছে তাসলীম বা সালাম।

সালাতের গুরুত্ব

ইসলামে সালাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ গুরুত্বসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. আধ্যাত্মিক ও খ. সামাজিক।

ক. আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

১. ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো সালাত। তাই সালাতের গুরুত্ব অত্যাধিক। রাসূল ﷺ বলেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

‘ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আলাহ ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রামাযানের রোযা পালন ও সামর্থ্যবানদের ওপর হজ পালন করা।’^৪

^১ শরীফ আল-জুরজানী, *আত-তা’রীফাত*, পৃ. ১৩৪

^২ সাইয়েদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ. ১, পৃ. ৯০

^৩ আবদুর রহমান আল-জযীরী, *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ*, খ. ১, পৃ. ১৬০

^৪ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১১, হাদীস: ৮, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযী থেকে বর্ণিত

২. কিয়ামতের দিন সালাতের দ্বারা হিসাব শুরু হবে। পৃথিবীর সবকিছু যখন প্রলয় হয়ে যাবে, তখন সকলকে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হয়ে দুনিয়ার জীবনের হিসাব দিতে হবে। সেখানে সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ».

‘বান্দা থেকে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতেরই হিসাব হবে।’^১

৩. সালাত ত্যাগকারী ইসলামের অংশবিহীন হবে। যারা সালাত ত্যাগ করল তারা যেন আলাহর আবশ্যিক কার্যাবলি ত্যাগ করল। সুতরাং যারা এরূপ করেছে, ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই। রাসূল ﷺ বলেন,

«لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ».

‘সালাত ত্যাগকারীর জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই।’^২

৪. সালাত ইসলামী জীবন দর্শনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান স্তম্ভ। তাই আলাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ

‘তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর।’^৩

সালাতের আবশ্যিকতার কথা কুরআন মজীদে ৮২ স্থানে এসেছে। সুতরাং সালাত কায়ম করা মুসলমানের ওপর অবশ্য কর্তব্য।

৫. আলাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলো সালাত, আলাহ তাআলার নৈকট্য লাভই মুমিনদের প্রধান প্রত্যাশা। সালাতের মাধ্যমেই আলাহর প্রতি বন্দার ভালোবাসা প্রকাশ পায় এবং সে আলাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়।
৬. সালাত মুসলমানের সর্বোত্তম ইবাদত। হাদীসে এসেছে, মানবদেহের মধ্যে মাথা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ইবাদতের মধ্যে সালাত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলাহ বলেন,

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ۖ

‘সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও।’^৪

^১ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৮, পৃ. ১৫২, হাদীস: ১৬৯৫৪, হযরত তামীম আদ-দারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^২ আল-বায়হার, *আল-মুসনদ*, খ. ১৫১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৮৫৩৯, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৪৩, ৮৩, ১১০, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৭৭, *সূরা আন-নূর*, ২৪:৫৬, *সূরা আল-মুম্বাযিল*, ৭৩:২০

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৩৮

৭. কোন ব্যক্তি মুসলিম না অমুসলিম তা পার্থক্য করার একমাত্র মানদণ্ড হলো সালাত। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন,

«يَنَّ الْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

‘কুফরি ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাতত্যাগ।’^১

৮. রুকু-সাজদা ও কিয়াম ইত্যাদির সমন্বিত রূপই সালাত। এগুলোর মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার আলাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার পাশাপাশি আলাহর প্রতি বন্দা আনুগত্য ও দাসত্বে পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। তাই আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সাজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’^২

৯. দিন-রাত বিভিন্ন সময়ে সালাত কয়েমের মাধ্যমে বন্দা আল্লাহকে স্মরণ করে। ফলে আলাহর ভয়ে সে যাবতীয় অন্যায় ও অশীল কর্ম থেকে বিরত থাকে, এতে নির্মল চরিত্র গঠন হয়। যেমন— কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٢١﴾

‘নিশ্চয় নামায অশীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।’^৩

১০. দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি হলো সালাত। সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন,

«الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ».

‘সালাত হলো দীনের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত প্রতিষ্ঠা করে সে যেন দীন প্রতিষ্ঠা করলো, আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে দীন পরিত্যাগ করে, দীনকে ধ্বংস করে।’^৪

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ১৩, হাদীস: ২৬১৮, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-আনকাবুত*, ২৯:৪৫

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-হজ্জ*, ২২:৭৭

তাই বলা যায় সালাতই হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি।

১১. সালাত আলাহকে স্মরণের উত্তম মাধ্যম। সালাতে রুকু-সাজদা ও কিয়ামসহ প্রত্যেক পর্যায়ে আলাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়। তাই সালাত বন্দার জন্য আলাহকে স্মরণেরও উত্তম ইবাদত। মহান আলাহ বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

‘এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।’^১

১২. আলাহর নৈকট্য লাভের প্রধান শর্ত হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি ও উন্নতি অর্জন। সালাতের প্রভাবে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে বন্দার আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়। এই মর্মে আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

‘জেনে রাখ, আলাহর যিকর দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।’^২

১৩. আলাহর সাহায্যপ্রাপ্তির মাধ্যম হবে সালাত। আর আলাহর সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলে আলাহ তাআলার দরবারে তা গৃহীত হয়। কেননা আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَسْتَعِذُّوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝

‘ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে।’^৩

১৪. পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা সালাতের মাধ্যমেই আর্জিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আলাহ তাআলার বাণী:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝

‘মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।’^৪

১৫. সালাত হলো ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। তাই মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন,
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ ۝

‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরী করল।’^৫

^১ আল-আজলুনী, *কাশফুল বিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আশ্ব ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস*, খ. ২, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৬২১

^২ আল-কুরআন, *সূরা তাহা*, ২০:১৪

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আর-রা’দ*, ১৩:২৮

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৪৫

^৫ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুমিনুন*, ২৩:১-২

১৬. সালাত জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কেননা মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন,
 «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ».

‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরী করল।’^১

১৭. সালাত মানুষের যাবতীয় গোনাহ মার্জনা করে দেয়। যেমন- রাসূল ﷺ বলেন, ‘মুসলির অযুর সময় তার সকল সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়।’ এ ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সকল গোনাহ মাফ করে দেয়।

১৮. সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন ঈমানের পূর্ণতা লাভ করে। আলাহর কাছে সালাত আদায়কারী ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ‘প্রত্যেক বস্তুর একটি পরিচয় আছে এবং ঈমানের বিশেষ পরিচয় হলো সালাত।’

১৯. সালাত ত্যাগকারী আলাহ তাআলার জিম্মায় থাকে না। যেমন- হাদীসে আছে,

«مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرَّئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ».

‘যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায পরিত্যাগ করে তার ওপর থেকে আলাহর জিম্মা উঠে যায়।’^২

২০. সালাতের ওপর অন্যান্য আমলের কবুলিয়ত নির্ভর করে। যেমন- হাদীসে আছে,

«أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ،

وَأِنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ».

‘কিয়ামত দিবসে প্রথমে বন্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। নামায ঠিক হলে সব আমল ঠিক হয়ে যাবে। আর নামায ঠিক না হলে কোন আমলই ঠিক হবে না।’^৩

^১ আত-তাবারানী, *আল-মুজাম্মল আওসাত*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩, হাদীস: ৩৩৪৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^২ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নিফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ১৭১, হাদীস: ৩০৪৩৮

^৩ আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘উল কবীর*, খ. ১, পৃ. ১০, হাদীস: ৪, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^৪ আলী ইবনে নসর আত-তুসী, *মুখতাসরুল আহকাম*, খ. ২, পৃ. ৩৬৫, হাদীস: ২৬৫-৩৯৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

খ. সালাতের সামাজিক গুরুত্ব

১. মুসলিম সমাজে মানুষ প্রত্যহ পাঁচবার সালাত কয়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে সমবেত হওয়াই তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।
২. মুসলমানরা মসজিদে একত্রিত হয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। সালাতের মধ্য দিয়েই ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা একে অপরের বংশ কৌলিন্যের মর্যাদা ভুলে গিয়ে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।
৩. সালাতের মাধ্যমে আনুগত্যের প্রশিক্ষণ। সালাতের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে মুসল্লিগণ পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্ষণ লাভ করে।
৪. মুসলমানগণ সালাত আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যহ পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে মসজিদে একত্রিত হয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সাথে সালাত আদায় করে। এতে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়।
৫. মানব সমাজে যখন নৈতিক ও আত্মিক অধঃপতন ঘটে, তখনই দেখা দেয় সামাজিক দন্দ-কলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব। সালাত মানুষের মাঝে নৈতিক সত্তা জাগ্রত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে সহায়তা করে।
৬. একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।
৭. জামাআতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের ঐক্যের সূত্রে গাঁথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দিনাতিপাত করার নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়।
৮. সালাতের জন্য মুসল্লিকে পরিধেয় বস্ত্র, সালাতের স্থান ও শরীর পরিষ্কার এবং পাবিত্র রাখতে হয়। একজন লোক পূর্ণ সালাত আদায়কারী হলে তার সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা এসে যায়। এতে ব্যক্তি মনের সুস্থ বিকাশ ঘটে ও অসুস্থতা দূরীভূত হয়।
৯. যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করে সে অন্যায়, অশ্লীল, যুলুম ইত্যাদি কাজ হতে দূরে থাকে। কেননা সালাতের মাঝে মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
১০. সাম্য বলতে Equality of opportunity-কে বোঝায়। এটা হলো No man shall be placed in society that constitutes denial of

the letter citizenship. বাস্তবে এ সাম্য খুলাফায়ে রাশিদা, বিশেষ করে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিআল্লাহু আনহু-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর পেছনে সবচেয়ে প্রভাবক শক্তি ছিল সালাত। সালাত হলো সাম্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ফকির বাদশাহ, রাজা প্রজা, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে। সুতরাং সাম্যের বুনিয়াদ পত্তনে সালাতই সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা।

১১. সালাতের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মানুষ সবসময় পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিতে পারে না। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জুমার সালাত এবং দুই ঈদের সালাতে যখন মুসল্লিগণ সমবেত হয় তখন একে-অন্যের খোঁজখবর নিতে পারে এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়।
১২. সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন কর্তব্যপরায়ণতার অনন্য শিক্ষা লাভ করতে পারে। এর ফলে সে পার্থিব জগতে যাবতীয় কার্যাবলি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হয়।
১৩. সালাত নিত্যদিনের বাধ্যতামূলক এক সমাবেশ। এ সমাবেশে ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় হিদায়তী ভাষণ দিয়ে থাকেন। তাঁর বক্তব্যে সমকালীন সমস্যাগুলো সমাধানের পছা বিবৃত থাকে। বিশেষ করে জুমার খুতবায় এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে।
১৪. যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে অভ্যস্ত তার চরিত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার বুনিয়াদ গড়ে উঠে। সালাত সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক হওয়ার পথে পরিচালিত করে। যার ফলে ইসলামী সম্রাজ্যের নাগরিকরা আদর্শ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান পায়।

সালাতের ফযীলত

সালাত যেহেতু সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। সে জন্য এর অনেক ফযীলত রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১. সালাত হলো মুসলমানদের জান্নাত লাভের পূর্ণ নিশ্চয়তা। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».

‘আলাহ তাআলা বন্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে এ অবস্থায় উঠবে যে, এর হককে

হালকা মনে করে তা নষ্ট করা হয়নি, তবে আলাহর নিকট তার জন্য ওয়াদা হলো, তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।^১

২. সালাত ইসলামের সকল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

«إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ».

‘নিশ্চয় তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো নামায।’^২

৩. সালাতের দ্বারা সকল গোনাহ মফ হয়ে যায়। যেমন- হাদীসে আছে,

«إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تُحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةٍ».

‘নিশ্চয় প্রত্যেক নামায তার পূর্বের গোনাহ মিটিয়ে দেয়।’^৩

৪. কিয়ামত-দিবসে নামাযের দ্বারাই জাহান্নামের আগুন নিভে যাবে এবং সহযেই সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। যেমন- হাদীসে আছে,

«إِنَّ اللَّهَ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: يَا بَنِي آدَمَ! قُومُوا إِلَيَّ نِيِّرَ أَنْكُمُ النَّارِ أَوْ قَدْ نَمُوتُهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَأَطِئُوهَا بِالصَّلَاةِ».

‘আলাহ তাআলার একজন ফেরেশতা আছে, প্রত্যেক নামাযের সময় বলে, হে বনী আদম! ওঠ এবং যে আগুন তোমরা প্রজ্জ্বলিত করেছিলে তা নির্বাপিত কর।’^৪

^১ (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৪৯, হাদীস: ১৪০১, (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৬২, হাদীস: ১৪২০, (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৩০, হাদীস: ৪৬১, হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাঃ থেকে বর্ণিত

^২ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরক আলাস-সাহীহাইন*, খ. ১, পৃ. ২২১, হাদীস: ৪৪৮, ৪৪৯, হযরত সওবান রাঃ থেকে বর্ণিত ও পৃ. ২২২, হাদীস: ৪৫০, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত

^৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ৪৮৯-৪৯০, হাদীস: ২৩৫০৩, হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত

^৪ আত-তবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৯, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৯৪৫২, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত

ইসলামে সালাতের গুরুত্ব

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রোকন এবং প্রধান ইবাদত। সালাতই হচ্ছে মুমিন এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। তাই একে বিশুদ্ধভাবে একনিষ্ঠতার সাথে নিজে আদায় করার পাশাপাশি পরিবারে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়ম করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

الْمَلَأَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

‘আলিফ লাম মিম (এর অর্থ আলাহ তাআলাই ভালো জানেন)। এটা সে কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে সম্পদ বা জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত। আর তারাই যথার্থ সফলকাম।’^১

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ۖ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

‘আর তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান কর এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করতে পার না? তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আলাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এটা (নামায) অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে অনুগত বন্দাদের জন্য তা কঠিন নয়। যারা ধারণা

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১-৫

করে যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবেন এবং নিশ্চয় তা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।^১

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

‘তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য আগে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আলহর নিকট পাবে। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আলহ তা প্রত্যক্ষকারী।’^২

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

‘(হে রাসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি সে বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি, যার আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম।’^৩

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ وَآخِرُ ۝ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

‘সূতরাং যারা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা পবিত্রতা রক্ষা করুন। সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা বর্ণনা করুন। রাতের কিছু অংশ দিবাভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আমি তাদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয়ক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। আর আপনি আপনার

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৪৩-৪৬

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১১০

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১৬২

পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং আপনিও এর উপরে অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিয়ক চাই না। আমি আপনাকে রিয়ক প্রদান করি এবং আলাহুভীরাতার জন্য রয়েছে ভালো পরিণাম।^১

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

‘তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করলে তারা নামায কায়ম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের প্রতিদান আলাহর ইচ্ছাধীন।’^২

মূল আলোচনা

ইসলামে সালাতের গুরুত্ব ও অবস্থান এবং বিশুদ্ধভাবে তা আদায় প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমের চার স্থান থেকে আয়াত উপস্থাপন করা হয়েছে। তা হলো সূরা আল-বাকারার ১-৫, ৪৩-৪৬ ও ১১০ আয়াত, সূরা আল-আনআমের ১৬২ ও ১৬৩ আয়াত, সূরা তাহার ১৩০-১৩২ এবং সূরা হজের ৪১ আয়াত।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য হলো, নামায আলাহ তাআলার ইবাদত, মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় একটি বৈশিষ্ট্য। তাই এটি নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে জামায়াতের সাথে আদায় করা কর্তব্য। যারা আলাহুভীরা তারা এর মাধ্যমেই আলাহর নিকট সাহায্য চেয়ে থাকেন, যার প্রতিদান আল্লাহ আখিরাতে প্রদান করবেন। তাই একনিষ্ঠ মনে নামায নিজে সম্পাদন করার পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

শানে নুযূল

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন—

১. আলোচ্য আয়াতসমূহ মালিক ইবনে সাইফ নামক ইহুদি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সে মুমিনদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির লক্ষ্যে বলত, এ কুরআন সে কিতাব নয়, যার সুসংবাদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছে। তখন আলাহ তাআলা তার বিদ্রোহিত উজ্জিতে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করেন।

^১ আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১৩০-১৩২

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৪১

অতঃপর মুমিনদের প্রশংসায় চারটি আয়াত, কাফিরদের অসৎ চরিত্র বর্ণনায় দুটি আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতটি মুনাফিকদের নিন্দায় নাযিল করেন।

২. কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলাহ তাআলা রাসূলুলাহ ﷺ-কে সুসংবাদরূপে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি আপনার ওপর অতি সুন্দর ও অতুলনীয় গ্রন্থ নাযিল করব। অতঃপর যখন পবিত্র কুরআন নাযিল হতে শুরু করে, তখন রাসূলুলাহ ﷺ আলাহ তাআলার দরবারে বলেন, হে প্রতিপালক! এটাইকি সেই কিতাব, যার সুসংবাদ আপনি পূর্বে দিয়েছিলেন? তখন মহান আলাহ স্বীয় রাসূলের ইচ্ছা ও প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল করেন।
৩. কতিপয় আলেমের মতে, রাসূলুলাহ ﷺ সুশীতল জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনা হিজরত করার পর যখন সেখানকার আধিবাসীগণ ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে এবং ইসলামের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন মদীনার ইহুদিরা তাঁর নুবুওয়ত, রিসালাত, আখিরাত ও পবিত্র কুরআনকে সত্য বলে মানতে অস্বীকার করে এবং জনমনে সন্দেহসৃষ্টির অপকৌশল অবলম্বন করে। তখন তার প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَللّٰهُ (আলিফ-লাম-মীম)-এর মর্মার্থ

সমগ্র কুরআনে ২৯টি সূরার শুরুতে এরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণ রয়েছে। এগুলোকে اَلْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتُ তথা বিচ্ছিন্ন হরফ বলা হয়। তফসীরকারকগণ এরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাকে আয়াতে মুতাশাবিহের মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে এসেছে, وَمَا عَلَّمُتُ تَائِيْدًا اِلٰلٰهًا ۝ (আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আলাহ ব্যতীত কেউ জানে না)।^১ এরপরও কোন মুফাসসির এ বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মর্মার্থ ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, اَللّٰهُ-এর অর্থ হলো: اَنَا اَعْلَمُ (আমি আলাহ অধিক জানি)।^২ তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে, اَللّٰهُ-এর اَلِفٌ দ্বারা আলাহ, لَامٌ দ্বারা জিবরাঈল এবং مِمْ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে।
২. ইমাম জামালুদ্দীন আস-সুয়ূতী রাঃ বলেন, اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ (এর মর্মার্থ সম্পর্কে আলাহ তাআলাই ভালো জানেন)।

^১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৭

^২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ালিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২০৭, হাদীস: ২৩৮

৩. আলামা জারুল্লাহ আয-যামাখশারী রহমতুল্লাহি বলেন, ٱللَّهُ দ্বারা পবিত্র কুরআনের একটি নাম উদ্দেশ্য ।
৪. কেউ কেউ বলেন, ٱللَّهُমহান আলাহর নামসমূহের একটি নাম ।
৫. কেউ কেউ বলেছেন, ٱللَّهُআলাহর শপথের অন্তর্ভুক্ত
৬. কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, ٱللَّهُপবিত্র কুরআনের একটি সূরার নাম ।
৭. কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ أَنَا لَطِيفٌ مُّبْعُودٌ (আমি সূক্ষ্মদর্শী মাবুদ) ।
৮. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, أَلْفٌ অর্থ: أَنَا أَحَدٌ, أَوَّلٌ, أَزَلِيٌّ, آخِرٌ, আর لَمْ
অর্থ: أَنَا لَطِيفٌ এবং مِنْ অর্থ: مَخِيذٌ, مَالِكٌ, مَعْبُودٌ ইত্যাদি ।

প্রকৃতপক্ষে ٱللَّهُসহ অন্যান্য الْمُقَطَّعَاتُ-এর অর্থ অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত না থেকে দ্বিধাহীন চিন্তে এ গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রকৃত মুমিনের কাজ ।

সূরার প্রথমে ٱللَّهُনেওয়ার কারণ

পবিত্র কুরআনের ২৯ টি সূরার প্রারম্ভে ٱللَّهُ-এর মতো কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণ পরিলক্ষিত হয় । সূরার শুরুতে এ সমস্ত বর্ণ নেওয়ার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন-

১. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রহমতুল্লাহি বলেন, প্রত্যেক আসমানী কিতাবের একটি বিশেষ নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে । আর أَلْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتُ হলো পবিত্র কুরআনের সে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য ।
২. আলামা জারুল্লাহ আয-যামাখশারী রহমতুল্লাহি-এর মতে, এর দ্বারা মহান আলাহর অলৌকিকত্ব প্রকাশ করা হয়েছে ।
৩. পবিত্র কুরআন একটি বিরাট মুজিয়া । সূরার শুরুতে এ ধরনের বর্ণ ব্যবহার করে বিরোধীদের দুর্বল ও অক্ষম করে দেওয়া হয়েছে ।
৪. অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার সহায়তাস্বরূপ উলিখিত মুতাশাবিহাত আয়াত সূরার প্রথমে আনা হয়েছে ।
৫. পবিত্র কুরআনের যে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ, আলাহ তাআলার সূরার প্রথমে ٱللَّهُব্যবহার করে তারই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন । বিরোধীরা এ সামান্য অক্ষর কটিরই মমার্থ যদি উদ্ঘাটন করতে না পারে, তাহলে কিভাবে তারা কুরআনের মুকাবেলা করবে?

৬. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত করার জন্যই আলাহ তাআলা সূরার শুরুতে আলোচ্য শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। কেননা মুমিনগণ তা বিশ্বাস করে এবং মুনাফিকরা এতে দোষ অশেষণ করে। তাই আলাহ তাআলা বলেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

تَأْوِيلِهِ ٥

‘সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাক্যার উদ্দেশে তার মধ্যকার রূপকগুলোর।’^১

৭. অথবা মুমিনদেরকে পবিত্র কুরআনের অর্থ ও মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটন এবং গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত সূরার শুরুতে ٱلْأَنْعَامُ বর্ণসমূহ প্রয়োগ করেছেন।

ٱلْكِتَابُ-এর পরিচয়

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ٱلْكِتَابُ শব্দটি فِعَال-এর ওয়ানে বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। তবে এখানে মাসদার দ্বারা اِسْمٌ مَّفْعُول উদ্দেশ্য। সুতরাং ٱلْكِتَابُ অর্থ হবে مَكْتُوبٌ তথা লিখিত গ্রন্থ।

আর পরিভাষায় কিতাব হলো:

১. ٱلْكِتَابُ فِيهِ অর্থাৎ যাতে কোন কিছু লেখা হয়ে থাকে।
২. আলামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী ^{মহানবী} বলেন,

ٱلْكِتَابُ: فَٱلْقُرْآنُ ٱلْمُنَزَّلُ عَلَى ٱلرَّسُولِ، ٱلْمَكْتُوبُ فِي ٱلْمَصَاحِفِ،
ٱلْمَنْقُولُ عَنْهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ نَقْلًا مُّتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ.

‘কিতাব হচ্ছে মহা গ্রন্থ আল কুরআন, যা মহানবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর ওপর অবতরিত, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং মহানবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে সন্দেহাতীতরূপে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত।’^২

আলোচ্য আয়াতে ٱلْكِتَابُ (কিতাব)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ:

১. অধিকাংশ তফসীরকারের মতে, ٱلْكِتَابُ দ্বারা সর্বকালের ও সর্বযুগের মানবতার মহাসংবিধান পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে।

^১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৭

^২ আন-নাসাফী, মনারুল আনওয়ার ফী উসুলিল ফিকহ, পৃ. ২

২. কতিপয় আলেমের মতে, এখানে كِتَابٌ দ্বারা ٱللَّهُ-কে বোঝানো হয়েছে ।
অবশ্যই এটা তখনই হবে যখন ٱللَّهُ দ্বারা সূরা উদ্দেশ্য হবে ।
৩. কারো কারো মতে, ٱللَّهُ দ্বারা মহান আলাহর বাণী: ۝ اِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ (আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী)^১ উদ্দেশ্য ।
৪. কারো মতে, كِتَابٌ দ্বারা لَوْحٌ مَّحْفُوْطٌ-এ সংরক্ষিত ٱلْقُرْآن-কে বোঝানো হয়েছে ।
যেমন- আলাহ তাআলার বাণী:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ ۝۱۱۱ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْطٍ ۝

‘বরং এটা মহান কুরআন, লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ ।’^২

رَبِّ (রায়বুন) শব্দের অর্থ

رَبِّ (রায়বুন) শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার । এর অর্থ হলো:

১. অস্থিরতা । যেমন- আরবগণ বলে থাকে: رَبِّیَ النَّیْءُ অর্থাৎ অমুক জিনিস আমাকে অস্থির করে ফেলেছে ।
২. সন্দেহ, সংশয় । যেমন- মহানবী ﷺ-এর বাণী:

«دَعْ مَا يَرْيَبُكَ إِلَى مَا لَا يَرْيَبُكَ»

‘যতক্ষণে সন্দেহ দূর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহের বস্তু পরিত্যাগ কর ।’^৩

৩. আলামা জারুল্লাহ আয-যামাখশারী رحمتهما اللہ বলেন, فَلَقْنَا النَّفْسَ وَاضْطَرَّ بِهَا (মনের ব্যাকুলতা) ।^৪

ٱلْكِتَابِ ٱلرَّحِيْمِ-এর মমার্থ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হলে কাফির-মুশরিকরা অপবাদ দিতে লাগল, এটি মুহাম্মদ ﷺ বিরচিত একটি কাব্যমাত্র; আলাহপ্রদত্ত কোন গ্রন্থ নয় । তখন আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ ٱلرَّحِيْمُ ۝ (এটা এমন কিতাব যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই) ।^৫

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাম্মিল, ৭৩:৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বুরূজ, ৩:৭

^৩ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ৪, পৃ. ৬৬৮, হাদীস: ২৫১৮, হযরত হাসান ইবনে আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^৪ আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল, খ. ১, পৃ. ৩৪

^৫ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২

এ ছাড়া আলাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۖ

‘তোমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ কর, তবে অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও।’^১

কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ (এটি মানবরচিত কোন গ্রন্থ নয়)। সর্বোপরি আলাহ তাআলা ۞

رَبِّ ۖ فَبِئْسَ مَا يَكْفُرُونَ ۝ বলে কুরআন মজীদে অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝-এর ব্যাখ্যা

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, সেসব লোক মুত্তাকী, যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে। সূরা আল-বাকারা ২ থেকে ৫ আয়াত পর্যন্ত আয়াতে মুত্তাকী বা মুমিন ব্যক্তির পাঁচটি অপরিহার্য গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছেন।

مُتَّقِينَ-এর পরিচয়

مُتَّقِينَ শব্দটি اِسْمُ فَاعِل-এর جَمْعُ مُذَكَّر-এর সীগাহ। এর একবচন مُتَّقِي, এটি تَقِي বা تَقِيَّة থেকে নির্গত।

আভিধানিক অর্থ: ক. আলাহভীরু, খ. পরহেযগারি, গ. সংযমী, ঘ. নিরাপত্তাকামী ইত্যাদি।

مُتَّقِينَ-এর পরিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে তফসীরকারকদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন, যারা ঈমানের সাথে শিরক ও কবীরা গোনাহ এবং অশীল কাজ থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে আলাহ তাআলার হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করে থাকে, তাদেরকে মুত্তাকী বলা হয়।

২. আলামা মাহমুদ আল-আলুসী রাযিআল্লাহু আনহু তাফসীরে রুহুল মাআনী গ্রন্থে বলেন,

صِيَانَةُ الْمَرْءِ نَفْسُهُ عَمَّا يَضُرُّ فِي الْآخِرَةِ.

‘নিজেকে পরকালের কষ্টদায়ক বস্তু হতে মুক্ত রাখাকে বলা হয় তকওয়া। আর তকওয়ার পথ যিনি অবলম্বন করেন তাকেই বলা হয় মুত্তাকী।’^২

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৩

৩. হযরত হাসান আল-বাসারী রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ‘যারা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ হতে বিরত থাকেন এবং ফরয কাজসমূহ পালন করেন, তারাই মুত্তাকী।’^২
৪. মুহাম্মদ ইবনুস সাযিব আল-কালবী রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ‘যে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকেন তাকেই বলা হয় মুত্তাকী।’
৫. তাফসীর ইবনে কাসীরে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাহমতুল্লাহি আনহি থেকে বর্ণিত আছে, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এবং যথাযথভাবে আলাহ তাআলার ইবাদত করে, তারাই মুত্তাকী।^৩
৬. আলামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ‘যারা আলাহ তাআলার আদেশ পালন ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে তাঁর রোযানল থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে আসন্ন শাস্তি থেকে রক্ষা করে, তারাই মুত্তাকী।’^৪
৭. মুত্তাকীদের পরিচয়দানে স্বয়ং আলাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

‘যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে সম্পদ বা জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।’^৫

৮. আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী রাহমতুল্লাহি আলায়হি বলেন, তাকওয়া হলো:

أَنْ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ فِيهَا نَهَاكَ.

‘তোমার প্রভু যেন তোমাকে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত না দেখেন। আর এটি করতে যে পারে সেই মুত্তাকী।’^৬

মুত্তাকীদের গুণাবলি

সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াতে বর্ণিত মুত্তাকী বা মুমিন ব্যক্তির গুণাবলি হলো:

১. অদৃশ্যভাবে আলাহ তাআলার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস।
২. সালাত কয়েম করা।
৩. যাকাত প্রদান করা।

^১ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ১, পৃ. ১১১

^২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ালিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ২৩৭, হাদীস: ২৬১

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ৩৫, হাদীস: ৬১, (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ৭৪

^৪ আস-সাবুনী, *সাফওয়াতু তাফসীর*, পৃ. ২৬

^৫ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৩

^৬ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ১, পৃ. ১১১

৪. মুহাম্মদ ﷺ এবং পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের প্রতি অবতারিত কিতাবের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ।
৫. আখিরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ।

এ আয়াতে **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ**, অন্য আয়াতে **هُدًى لِّلنَّاسِ** বলার কারণ

আলাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে হিদায়ত গ্রহণ প্রসঙ্গে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে আলোচ্য আয়াতে **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** বলেছেন, পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে **هُدًى لِّلنَّاسِ** (মানুষজাতির জন্য পথপ্রদর্শক)^১ বলেছেন । এর কারণ বর্ণনায় তফসীরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন—

১. পবিত্র কুরআন যেহেতু সকল মানুষের হিদায়ত গ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই **هُدًى لِّلنَّاسِ** দ্বারা সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । আর কুরআনের হিদায়ত যেহেতু মুত্তাকীরাই গ্রহণ করে, সেহেতু **هُদًى لِّلْمُتَّقِينَ** দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।
২. **هُদًى লِّلْمُتَّقِينَ** বলা হয়েছে মুবালাগা হিসেবে আর **هُদًى লِّلنَّاسِ** সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।
৩. আলামা কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বয়যাওয়া رحمته الله বলেন, হিদায়ত গ্রহণের দিক থেকে যেহেতু মুত্তাকীরাই বেশি হকদার, তাই তাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে ।^২
৪. আলামা জারুল্লাহ আযা-যামাখশারী رحمته الله বলেন, যেহেতু মুত্তাকীরা শিরক থেকে মুক্ত, সেহেতু কেবল তারাই হিদায়ত পাওয়ার উপযুক্ত । তাই **هُদًى لِّلْمُتَّقِينَ** বলা হয়েছে ।^৩
৫. তাফসীরে কবীর প্রণেতা বলেন, মুত্তাকীদের মৌলিক গুণাবলির পরিচয় তুলে ধরে তাদের প্রশংসা করার নিমিত্তে আলোচ্য আয়াতে **هُদًى লِّلْمُتَّقِينَ** বলা হয়েছে ।^৪
৬. যাদের হজমশক্তি ভালো কেবল তারাই কেবল সুখাদ্যের দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে । তদ্রূপ কুরআন হলো সুখাদ্যের ন্যায় । কুরআন নামক সুখাদ্যের দ্বারা পুষ্টি সাধন তথা হিদায়ত লাভ করতে হলে সবল পরিপাকশক্তি থাকতে হবে,

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৫

^২ আল-বয়যাওয়া, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরাফুত তাওয়াযীল*, খ. ১, পৃ. ৩৭

^৩ আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল*, খ. ১, পৃ. ৩৫

^৪ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২৬২

অর্থাৎ নির্মল বিবেকবান তথা মুক্তাকী হতে হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে هُدًى ۞ لِّلْأَنفُسِ ۝ না বলে هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ বলা হয়েছে।

৭. ইমাম জামালুদ্দীন আস-সুযুতী ^{মোহাম্মদ আলিয়াহ} বলেন, هُدًى بِحَازَ مَا يُؤْتَى হিসেবে هُدًى ۝ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ বলা হয়েছে। অর্থাৎ سَائِرِينَ إِلَى الْهُدَى (অতিশিগ্গিরই তারা আলাহভীরু হতে যাচ্ছে)।

৮. কেউ কেউ বলেন, هُدًى ۝ অর্থ জীবনযাপনের ব্যবস্থা। কুরআন হচ্ছে মুক্তাকীদের জন্য জীবন যাপনের ব্যবস্থা স্বরূপ।

الْإِيمَانُ (ঈমান বিলাহ)-এর পরিচয়

الْإِيمَانُ-এর আভিধান অর্থ

الْإِيمَانُ শব্দটি বাবে إِفْعَال-এর মাসদার, যা اَمْنٌ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। যেমন- বলা হয়, صَارَ الشَّخْصُ ذَا اَمْنٍ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الْإِيمَانُ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১. الْإِنْتِيَادُ তথা আনুগত্য করা। ২. الْخُضُوعُ তথা অবনত হওয়া। ৩. الْوُثُوءُ তথা নির্ভর করা। ৪. الْإِذْعَانُ তথা আস্থা স্থাপন করা। ৫. التَّصَدِيقُ তথা স্বীকৃতি দেওয়া। ৬. নিরাপত্তা প্রদান করা। ৭. বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

الْإِيمَانُ-এর পরিভাষিক সংজ্ঞা

ওলামায়ে কেরাম الْإِيمَانُ শব্দের পরিভাষিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. ইমাম গাযালী ^{মোহাম্মদ আলিয়াহ} বলেন,

تَصَدِيقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ.

‘নবী করীম ^{মোহাম্মদ আলিয়াহ} যেসব বিষয় নিয়ে আগমণ করেছেন, তার সবকিছুকে সত্যরূপে স্বীকারপূর্বক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়।’

২. আলামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ^{মোহাম্মদ আলিয়াহ} বলেছেন,

تَصَدِيقُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا جَاءَ بِهِ بِإِعْتِدَادٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

‘নবী করীম ﷺ যেসব বিষয় নিয়ে আগমণ করেছেন, নবী করীম ﷺ-এর ওপর বিশ্বাস রেখে তার সব কিছুকে সত্যরূপে স্বীকারপূর্বক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়।’

৩. ইমাম আবু জা’ফর আত-তাহাওয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الْقَدِيدُ بِمَا عَلِمَ مَجِيءُ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا.

‘নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতভাবে যা আনিত বিধান হিসেবে জানা গিয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান।’

তাই اٰلِ الْاِيْمَانِ-এর অর্থ হলো, ঈমানের অভ্যন্তরীণ মূলনীতিসমূহ তথা

ঈমানের রোকনসমূহ, যার ওপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলাহর প্রতি ঈমানের মর্মার্থ

আলাহ তাআলার প্রতি ঈমানের অর্থ হলো, আলাহর একত্বে বিশ্বাস করা এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা। যেমন- রাসূল রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ».

‘যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর রাসূল একথার সাক্ষ্য দেয় তার জন্য আল্লাহ আগুন হারাম করে দিয়েছেন।’^১

«أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ».

‘আলাহর ইবাদত করা এবং তিনি ছাড়া সবকিছু অস্বীকার করা।’^২

সুতরাং আলাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, একথার সাক্ষ্য প্রদান পূর্বক একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং অন্যসব কিছুকে অবিশ্বাস করার নাম ঈমান। তবে শুধু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট নয়, বরং এর ওপর দৃঢ় থাকা আবশ্যিক। এ মর্মে আলাহ তাআলা বলেন,

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ ۖ

‘অতএব তুমি সোজা পথে চলে যাও যেমন তোমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে।’^৩

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৭, হাদীস: ৪৭ (২৯), হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৫, হাদীস: ২০ (১৬), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

এখানে আলাহর একত্ববাদের প্রতি সাক্ষ্য দেওয়ার কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। যেমন—

১. مَوْءِدٌ -এর অর্থ হলো মহান আলাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।
২. বিভিন্ন হাদীসে পরিলক্ষিত হয়, وَحَدٌ مَوْءِدٌ এখানে وَحَدٌ পদটির অর্থ হলো, এক ও অদ্বিতীয় হওয়া।
৩. আর مَوْءِدٌ পদটি আলাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. مَوْءِدٌ -এর অর্থ: অংশীদার। শব্দটি আরবী হলেও বাংলায় ব্যবহার হয়।

সালাতের প্রকার

মিনহাজুল মুমিন গ্রন্থে আল্লামা আবু বকর আল-জাযায়রী رحمته الله সালাতকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন— ১. الْفَرَضُ (ফরয), ২. السُّنَّةُ (সুন্নত), ৩. النَّفْلُ (নফল)।

সুন্নতকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন,

১. $\text{السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ}$ (সুন্নতে মুয়াক্কাদা) ও
২. $\text{السُّنَّةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ}$ (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা)।

ওয়াজিব সালাতকে সুন্নতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত করে ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাকে সমপর্যায়ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখন প্রকরণ হিসেবে সালাত চার প্রকার। যথা—

১. الْفَرَضُ (ফরয),
২. $\text{السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ}$ (সুন্নতে মুয়াক্কাদা),
৩. $\text{السُّنَّةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ}$ (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা) ও
৪. النَّفْلُ (নফল)।

তবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব সালাতকে সুন্নতে মুয়াক্কাদা থেকে পৃথক করে এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাকে সুন্নত সালাতের অন্তর্ভুক্ত করে সালাতকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

১. الْفَرَضُ (ফরয),

^১ আল-কুরআন, সূরা হুদ, ১১:১১২

২. الْوَاجِبُ (ওয়াজিব),

৩. السُّنَّةُ (সুন্নত),

৪. النَّفْلُ (নফল) ।

১. الْفَرَضُ (ফরয): ফরয সালাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত । যথা- ১. ফজর, ২. যুহর, ৩. আসর, ৪. মাগরিব ও ৫. ইশা । এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,


«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْ جَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

‘আলাহ তাআলা বন্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । যে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে এ অবস্থায় উঠবে যে, এর হককে হালকা মনে করে তা নষ্ট করা হয়নি, তবে আলাহর নিকট তার জন্য ওয়াদা হলো, তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । আর যে তা করবে না তার জন্য আলাহর নিকট কোনো ওয়াদা নেই, তিনি তাকে ইচ্ছা করলে সাজা দিতে পারে, চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন ।’

২. الْوَاجِبُ (ওয়াজিব): ওয়াজিব সালাত হলো: ১. ইশার সালাতের শেষে বিতর সালাত ও ২. দু’ঈদের সালাত ।

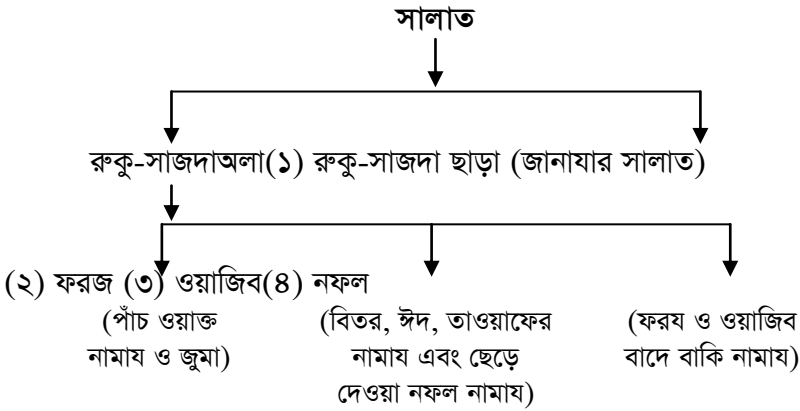
৩. السُّنَّةُ (সুন্নত): সুন্নত সালাত হলো:

১. ফজর সালাতের পূর্বের দু’রাকাআত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা) ।
২. মাগরিব সালাতের ফরযের পর দু’রাকাআত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা) ।
৩. ইশার সালাতের পর দু’রাকাআত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা) ।
৪. ফরয সালাতের সাথে পর্যায়ক্রমিক সালাত, যেমন- আসরের ফরয সালাতের পূর্বের চার রাকাআত সালাত । ইশার ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাআত ও পরে দু’রাকাআত সালাত (সুন্নতে গায়রে মুকয়াক্কাদা) ।
৫. কিয়ামুল লাইল । যেমন- তাহাজ্জুদ (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা) ।

^১ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৭, পৃ. ৩৬৬, হাদীস: ২২৬৯৩, হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত  থেকে বর্ণিত

৬. তারাবীহের সালাত (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা) ।
৭. তাহিয়্যাতুল মসজিদ (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদ) ।
৮. অযু শেষে দু'রাকাআত সালাত (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা) ।
৯. সালাতিদ যুহা (সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা) ।
১০. যুহরের পূর্বে এবং জুমার ফরযের পূর্বে ও পরে চার রাকাআত করে সালাত আদায় করা সুন্নত ।

৪. **النَّفْلُ (নফল):** নফল নামায হলো: ক. সালাতুল ইস্তিসকা, খ. সালাতুল কুসুফ । এ ছাড়া উপরে বর্ণিত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত ব্যতীত রাত-দিনের অন্যান্য সালাত নফল রূপে গণ্য হবে । *আল-ফিকহুল মায়সির* কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, সালাত মোট চার প্রকার । যেমন—



সালাতের শর্তাবলি

সালাতের শর্তাবলি দু'প্রকার । যথা—

ক. সালাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি

সালাত ফরয হওয়ার শর্ত ৪ টি । যথা—

১. মুসলমান হওয়া । সুতরাং কাফিরের ওপর নামায ফরয নয় ।
২. বালেগ হওয়া । সুতরাং নাবালেগের ওপর নামায ফরয নয় ।
৩. আকেল হওয়া । সুতরাং পাগলের ওপর নামায ফরয নয় ।
৪. হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া । সুতরাং হায়েয ও নেফাসওয়ালীর ওপর নামায ফরয নয় ।

খ. সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ৭টি । যথা—

১. নিয়ত করা । সালাত আদায়কারীকে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট সালাতের কথা পূর্ব থেকেই মনে মনে স্থির করতে হয় । কেননা হাদীসে এসেছে,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

‘নিশ্চয়ই আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।’^১

২. শরীর পাক। অযু কিংবা গোসলের প্রয়োজন হলে তা সমাধা করে শরীর পবিত্র করা। কেননা আলাহ বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۖ

‘যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও।’^২

৩. কাপড় পাক। যে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া। যেমন- মহান আলাহ বলেন,

وَيَسَابِكُ فُطْرَهُ ۖ

‘আপন পোশাক পবিত্র করুন।’^৩

৪. সালাতের জায়গা পাক। যে স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া।
৫. সতর ঢাকা। সতর ঢাকার পরিমাণ হলো, পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আর মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ ব্যতীত সমস্ত শরীর।
৬. কেবলামুখী হওয়া। কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা। কেননা আলাহ পাক বলেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

‘এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর।’^৪

৭. নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা। শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۖ

‘নিশ্চয় নামায মুসলমানদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।’^৫

সালাতের রুকনসমূহ

কুদূরী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সালাতের রোকন ৬টি। যা নিম্নরূপ:

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৬, হাদীস: ১, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:৬

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুদ্দাসসির*, ৭৪:৪

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৪৪ ও ১৫০

^৫ আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:১০৩

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা । সালাতের শুরুতে اللهُ أَكْبَرُ বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা সালাত শুরু করা । কেননা আলাহ তাআলা বলেন,

وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ ۝

‘এবং আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন ।’^১

২. কিয়াম করা । সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে । যেমন- আলাহ তাআলার বাণী:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝

‘আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও ।’^২

তবে অসুস্থতা বা অন্যকোন ওযরে বসে কিংবা শুয়ে সালাত আদায় করতে পারবে ।

৩. কিরাআত পাঠ করা । ফরয সালাতের প্রথম দু’রাকাআতে এবং অন্যান্য সালাতের সকল রাকাআতে সূরা আলফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের যে কোন সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা । যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

فَأَقْرءْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۝

‘কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর ।’^৩

৪. রুকু করা । সাজদায় যাওয়ার পূর্বে সামনে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে রুকু করতে হয় । এ সম্পর্কে আলাহ তাআলার নির্দেশ:

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرُّكُعِينَ ۝

‘এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয় ।’^৪

৫. সাজদা করা । নাক ও কপাল দ্বারা জমিনের ওপর সাজদা করা । যেমন- আলাহ বলেন,

وَأَسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ ۝

‘সাজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ।’^৫

৬. তাশাহহুদ পাঠ । শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ পর্যন্ত বসা ।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির, ৭৪:৩

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৩৮

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাশ্শিল, ৭৩:২০

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৪৩

^৫ আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতে এমন কিছু কাজ আছে যা পরিত্যাগ করলে সালাত অসম্পন্ন হয়ে যায় এবং সাজদা সাহ্ ছাড়া এর ক্ষতিপূরণ হয় না। সে কাজগুলোকে সালাতের ওয়াজিব বলে।

ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা অনুযায়ী সালাতের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ্ আকবর বলে নামায শুরু করা।
২. সালাতের প্রতি রাকাআতে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা। হাদীসে এসেছে,
«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

‘সূরা আল-ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।’^১

৩. সূরা আল-ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো। আল্লাহ বলেন,
فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

‘কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।’^২

৪. সূরা আল-ফাতিহা প্রথমে পাঠ করা।
৫. প্রথম সাজদার পর কোন ফাসিলা ছাড়া দ্বিতীয় সাজদা করা।
৬. তাদীলে আরকান ও তারতীলসহ আদায় করা। অর্থাৎ রুকু-সাজদা ইত্যাদি ধীর-স্থিরভাবে এবং তারতীবসহ আদায় করা। যেমন- তাদীলে আরকান না করার কারণে রাসূল ﷺ এক সাহাবীকে বলেছিলেন,
«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثلاثًا.

‘আবার গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাত আদায় করনি।’
এভাবে তিনবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।’^৩

৭. তাশাহহুদ পরিমাণ প্রথম বৈঠক করা।
৮. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।
৯. তাশাহহুদ থেকে ফারিগ হয়ে দেরি না করে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানো।
১০. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ বলে সালাত শেষ করা। ইমাম শাফিযী رحمته الله-এর মতে সালাত দ্বারা সালাত শেষ করা ফরয।

^১ আল-বুখারী, *জুযউল কিরাআতি খলফাল ইমাম*, পৃ. ২৫, হাদীস: ৫৫, হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুযাম্মিল*, ৭৩:২০

^৩ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯৩

১১. বিতির নামাযের ওয় রাকাআতে সূরা আল-ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর পর দুআ কুনুত পাঠ করতে হবে ।
১২. ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা ।
১৩. ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকু তাকবীর বলা ।
১৪. ফরয, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাআত, জুমার নামায, ঈদের নামায, তারাবীহের নামায এবং রামাযান মাসের বিতির নামাযে ইমামের জোরে কিরাআত পড়া ।
১৫. যুহর, আসর এবং মাগরিবের শেষ রাকাআত ও ইশার শেষ দুই রাকাআতে ইমামের চুপে কিরাআত পাঠ করা, অনুরূপ দিনের নফল নামাযে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা ।

সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ

সালাত ভঙ্গের কারণ অনেক । যেমন—

১. সালাতের কোন শর্ত বাদ গেলে ।
২. সালাতের কোন রুকন বাদ গেলে ।
৩. সালাতের মাঝে কথা বললে ।
৪. সালাতের মাঝে এমন দুআ করা, যা মানুষের কথা সাদৃশ্য ।
৫. সালাম দিলে বা সালামের জবাব দিলে ।
৬. আমলে কসীর করলে । এমন কাজকে আমলে কসীর বলে, যা করলে দূরের কেউ মনে করবে যে, সে নামাযে নেই ।
৭. কেবলা থেকে বক্ষ ঘুরে গেলে ।
৮. কোনো কিছু খেলে বা পান করলে ।
৯. দাঁতে লেগে থাকা ছোলা পরিমাণ খাবার খেলে ।
১০. বিনা প্রয়োজনে কাঁশি দিলে ।
১১. উহ আহ শব্দ করলে ।
১২. নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করলে ।
১৩. এক রোকন আদায় করা যায়, এমন পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকলে ।
১৪. মুসল্লির গায়ে, কাপড়ে বা নামাযের স্থানে নাপাক লেগে থাকলে ।
১৫. পাগল হলে ।
১৬. বেহুশ হলে ।
১৭. ফজরের নামাযে সূর্যোদয় হলে ।
১৮. ঈদের নামাযে সূর্য ঢলে পড়লে ।
১৯. জুমার নামাযে আসরের সময় এসে পড়লে ।
২০. নামাযের সময় তায়াম্মুমকারী পানি পেলে ।

২১. নামাযের অযু ছুটে গেলে ।

২২. اللَّهُ أَكْبَرُ-এর হামযার মাদ করলে ।

২৩. কুরআন শরীফ দেখে পড়লে ।

২৪. পূর্ণ এক রুকন ঘুমন্ত অবস্থায় আদায় করলে ।

২৫. ইমাম যদি অযোগ্যকে নায়েব বানায় ।

২৬. নামাযে শব্দ করে হাসলে ।

২৭. মোজা মাসেহকারী মোজা খুলে ফেললে বা মাসেহের সময় চলে গেলে ।

২৮. ইমামের আগে মুজাদী পূর্ণ এক রোকন আদায় করলে ।


২৯. নামাযাবস্থায় জুন্‌বি হলে ।

৩০. পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কম কাযা নামায রেখে নামায শুরু করে যদি নামাযাবস্থায় কাযা নামাযের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি ।^১

إِقَامَةُ-এর পরিবর্তে إِدَاءُ الصَّلَاةِ আল-কুরআনের সর্বত্র আলাহ তাআলা صَلَّاهُ বলেছেন অর্থাৎ তোমরা নিজেরা নামায আদায় কর এবং সমাজে তা প্রতিষ্ঠা কর ।

১. মাআরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, إِقَامَةُ الصَّلَاةِ-এর إِقَامَةُ বা প্রতিষ্ঠা বলতে নামাযের সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সবসময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করাকে বোঝায় । এক কথায় নামাযে অভ্যস্ত হওয়া, শরীয়তের নিয়ম মতো তা আদায় করা এবং সকল নিয়ম পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইকামতে সালাত ।^২

২. কেউ কেউ বলেন, (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর) ।^৩ আয়াতটি যদিও বনি ইসরাইলকে উপদেশ প্রদানে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম ব্যাপক । মুসলমানরাও আদিষ্ট । কারণ তারা মুমিন না হয়ে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না । অতঃপর অর্থ হলো আগে ঈমান আনো, তারপর সালাত আদায় কর ।

৩. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী  বলেন, এখানে أَمُرُ টি وَجُوبٌ বা আবশ্যিকতা বোঝাতে ব্যবহার হয়েছে ।^৪

^১ শফীকুর রহমান নদবী, আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা আন-নু'মান, পৃ. ৯০-৯৩

^২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ১৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৪৩

^৪ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩৪৩

৪. আলামা কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বয়যাওয়াযী رحمہ اللہ স্বীয় তফসীরে **إِقَامَةُ الصَّلَاةِ**-

এর চারটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. **أَدَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ وَحِفْظِ الْأَفْعَالِ** তথা তাদীলে আরকান ও সকল হুকুমসহ সালাত আদায় করা।
২. **الْمَوَاطَبَةُ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْإِدَامَةُ عَلَيْهَا** তথা নামায সর্বদা পড়া বা জারি করা।
৩. **الْإِجْتِهَادُ فِي الْأَدَاءِ** তথা গুরুত্বের সাথে পড়া।
৪. **الْإِدَاءُ** তথা নামায আদায় করা।

মোটকথা গুরুত্বের সাথে সমস্ত হুকুম পালনপূর্বক নিয়মিত আদায় করাকে ইকামত বলে। আয়াতে **أَمْرٌ**-এর সীগাহ দ্বারা নামায কায়েম করা ফরয করা হয়েছে।

সালাত কায়েম করার পদ্ধতি

আলাহ রাব্বুল আলামিন নামাযের কথা যেখানেই উল্লেখ করেছেন, সেখানেই তা কায়েম করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর)। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তা কায়েম করার কথা উল্লেখ করা হলো:

১. সালাত কায়েম করার একটি মাধ্যম হলো: আলাহ যেভাবে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে আদায় করা। যেমন- কিরাআত, রুকু-সাজদা সবই যথাযথভাবে ও যথানিয়মে আদায় করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ও ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর رحمہ اللہ অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।
২. সালাতকে পরিপূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে কায়েম করা সম্ভব। যেমন- নির্দিষ্ট সময় ও পরিপূর্ণ অযু।
৩. সালাত হতে কোন অবস্থায় গাফেল না হওয়া। সর্বদা সালাতে মশগুল থাকা। যেমন- কোন সালাত বাদ না দেওয়া, সকল সালাত আদায় করা ইত্যাদি।
৪. সালাত শুধু নিজে আদায় করলেই কায়েম হবে না, বরং পরিবার ও সমাজের অনুরূপ পালনে উৎসাহিত করা এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করা।
৫. রাষ্ট্রের যেকোন নির্দেশ অধিবাসীগণ মানতে বাধ্য। তাই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের ফরমানের মাধ্যমে সালাত কায়েম সম্ভব।

৷ **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** আয়াতের অর্থ হলো: ‘রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।’ প্রাধান্যযোগ্য যে, ইহুদিদের নামাযে সাজদাসহ অন্যান্য সব কাজই ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে অন্যতম। এখানে

الرُّكُوعَيْنِ ৩০ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামায আদায়কারীদের বোঝানো হয়েছে, যাদের নামাযে রুকু অন্তর্ভুক্ত আছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামায়াতের সাথে নামায আদায় কর। কেননা একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামায়াতে নামায আদায়কারী সাতাশগুণ বেশি সওয়াব পাবে।

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে আল্লামা আলুসী رحمته الله বলেন, আয়াতের অর্থ হলো: صَلَّوْا مَعَ الْمُصَلِّينَ (নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর)।^১ এখানে صَلَاةٌ বোঝাতে রুকু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ইহুদিদের নামাযে রুকু ছিল না। তাই মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীত করতে বলা হয়েছে। অথবা ইহুদিদেরকে ঈমান এনে রুকুবিশিষ্ট নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছে।

আর বলার কারণ এই যে, ইহুদিরা সর্বদা একাকী নামায পড়ত। তাই মুসলমানদেরকে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে বলা হয়েছে অথবা ইহুদিদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা প্রথমে ঈমান আন। অতঃপর জামায়াতের সাথে নামায আদায় কর।

জামাআতে নামায

جَمَاعَةً শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়:

هِيَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي مَكَانٍ ظَاهِرٍ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ
خَلْفَ الْإِمَامِ.

‘ফরয সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ বা পবিত্র কোন স্থানে ইমামের পেছনে একত্রিত হওয়াকে জামাআত বলে।’

জামাআতের হুকুম

জামাআতের সাথে নামায আদায়ের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رحمته الله ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস رحمته الله-এর মতে, জামাআতে নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অধিকাংশ ফকীহ এ রূপ মত পোষণ করেন। মহানবী صلوات الله وسلامه عليه এর বাণী:

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

^১ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ১, পৃ. ২৪৯

‘জামায়াতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে
সাতাশ গুণ বেশি।’^১

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইমাম মুহাম্মদ আল-করখী রহমতুল্লাহু আলাইহ, আবু জা’ফর আত-তাহাওয়ী রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতে, জামাআতে নামায আদায় করা ফরযে কিফায়া। ইবনে আবদুল বর রহমতুল্লাহু আলাইহও অনুরূপ মত পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا صَلَاةَ لَجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».

‘মসজিদের নিকটে অবস্থানকারীদের জন্য মসজিদ ছাড়া অন্যত্র নামায আদায় হবে না।’^২

৩. আহলে যাওয়াহিরের মতে, জামায়াতে নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَّ مُمْ تَقْبَلُ مِنْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا».

‘যে আযান শোনার পর ওয়র ব্যতীত জামায়াতে অনুপস্থিত থাকে, সে একাকী যে নামায আদায় করেছে তা কবুল হবে না।’^৩

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে খুযায়মা রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল মুনিযির রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ রহমতুল্লাহু আলাইহ প্রমুখ ইমামের মতে, জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা ফরযে আইন।

আল-ফিকহুল মায়সির কিতাবে বলা হয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। শরয়ী ওয়র ছাড়া জামাআত তরক করা জাযিয় নেই। বরং জামাআত তরককারী পাপী বলে গণ্য হবে এবং নামায তরককারীর জামাআত অসম্পূর্ণ হবে।

আর জুমা ও দু’ঈদের নামাযের জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ছাড়া উক্ত দু’নামায আদায় শুদ্ধ হয় না। তারাবীহের জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। অনুরূপ সূর্যগ্রহণের জামাআত।

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদীস: ৬৪৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^২ আবদুর রাযযাক আস-সান’আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ১, পৃ. ৪৯৭, হাদীস: ১৯১৫, হযরত আবু হুরায়রা রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^৩ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুস সগীর*, খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস: ৪৮৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

আর রামাযান মাসে সালাতুত তারাবীহের জামাআত করা মুস্তাহাব এবং রামাযান মাস ছাড়া তা মাকরুহ। অনুরূপ চন্দ্রগ্রহণের জামাআত। অনুরূপ ডাকাডাকি ও ঘোষণা দিয়ে নফলের জামাআত করাও মাকরুহ। তবে ঘোষণা ও আহ্বান ছাড়া করলে মাকরুহ হবে না। অনুরূপ যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াযযিন নির্ধারিত আছে তাতে দ্বিতীয় জামাআত করা মাহরুহ। তবে প্রথম অবস্থা পরিবর্তন করে পড়লে অর্থাৎ প্রথম জামাআতে ইমাম যেখানে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় জামাআতের ইমাম সে স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে দাঁড়িয়ে জামাআত করলে তা মাকরুহ হবে না।^১

জামাআতের গুরুত্ব ও ফযীলত

জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে,
 «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

‘একাকী নামায অপেক্ষা জামাআতের নামাযে ২৭ গুণ ফযীলত রাখে।’^২

অন্য হাদীসে আছে,

«لَا صَلَاةَ لَجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».

‘মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ (জামাআত) ছাড়া নামায হবে না।’^৩

আরেক হাদীসে আছে,

«مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».

‘যে ব্যক্তি আযান শুনল, অথচ মসজিদে আসল না, তার নামায হবে না। অবশ্য যদি কোনো ওয়র থাকে।’^৪

হাদীসে আরও আছে,

«وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْ مُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ».

^১ শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আ’যম আবী হানিফা আন-নুমান*, পৃ. ১০৭

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৫০, হাদীস: ২৪৯ (৬৫০), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিহা থেকে বর্ণিত

^৩ আবদুর রাযযাক আস-সান’আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ১, পৃ. ৪৯৭, হাদীস: ১৯১৫, হযরত আবু হুরায়রা রাযিহা থেকে বর্ণিত

^৪ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৬০, হাদীস: ৭৯৩; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিহা থেকে বর্ণিত

‘যদি তোমরা এই পশ্চাদপদের ন্যায় বাড়িতে নামায আদায় কর, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা নবীর সুন্নত পরিত্যাগ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।’^১

রাসূল ﷺ রাসূল ﷺ জামাআত ত্যাগকারীর বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন,

«لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ»

‘আমরা জামাআত ত্যাগকারীকে মুনাফিক মনে করতাম।’^২

জামাআত সুন্নত হওয়ার শর্তাবলি

কোন ব্যক্তির ওপর জামাআতে নামায আদায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা— ১. পুরুষ হওয়া, ২. বালেগ হওয়া, ৩. জ্ঞানবান হওয়া, ৪. স্বাধীন হওয়া, ৫. শরীয়ত-সম্মত ওয়র না থাকা।^৩

যেসব ওয়ের নামাযের জামাআত তরক করা জাযিয়

নিম্নোক্ত ওয়ের যে কোন একটি পাওয়া গেলে তার জন্য জামাআতে হাজির না হওয়া জাযিয়। যেমন—

১. প্রবল বৃষ্টি হলে।
২. প্রচণ্ড শীত পড়লে, যদি বাইরে বের হলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. রাতের বেলা ঝড়ো হাওয়া বইলে।
৪. অসুস্থ হলে (যে মসজিদে যেতে অক্ষম)।
৫. অন্ধ হলে।
৬. অতি বৃদ্ধ (হাঁটতে অক্ষম) হলে।
৭. কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবক হলে।
৮. পেশাব বা পায়খানার চাপ থাকলে।
৯. বন্দী হলে।
১০. পা কঠিত হলে।
১১. পক্ষাঘাতগ্রস্থ হলে।
১২. এমন খাবার উপস্থিত হলে, যার প্রতি ব্যক্তির আগ্রহের প্রবলতা বিদ্যমান।
১৩. সফরের প্রস্তুতি নিলে।

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ২৫৭ (৬৫৪), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ২৫৬ (৬৫৪), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত

^৩ শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা আন-নু'মান*, পৃ. ১০৯

১৪. মাল-চুরি হওয়া বা হারিয়ে যাবার ভয় থাকলে ।^১

আলাহ তাআলা বলেন, ﴿أَمْ مِّنَ النَّاسِ بِآلٍ﴾ আয়াতে ইহুদি আলেমদের সম্বোধন করে তাদেরকে ভর্তসনা করা হয়েছে। যেহেতু তারা তাদের শুভাকাজীদেবকে ইসলাম গ্রহণের আদেশ দিত। কিন্তু নিজেরা তা মানত না। অপরকে ভালো কাজের আদেশ করা কিন্তু নিজে তা না করার পরিণতি সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١﴾

‘তোমরা যা কর না, তা মানুষকে করতে বলাটা আলাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয়।’^২

কিয়ামতের দিন তাদের জিহ্বা আগুনের কাচি দ্বারা কাটা হবে বলে হাদিসে উল্লেখ আছে। অনুরূপ কতিপয় জান্নাতী কিছু জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের কথা শুনেই তো আজ আমরা আমল করে জান্নাতে এসেছি, তো তোমাদের এ অবস্থা কেন? তখন তারা বলবে, আমরা তোমাদের কে উপদেশ দিয়েছি কিন্তু নিজেরা তা পালন করিনি।

তবে এর দ্বারা এ কথা বুঝার অবকাশ নেই যে, কোনো পাপী উপদেশ দিতে পারবে না। কেননা কোন আমল ত্যাগ করা যেমন পাপ তদ্রূপ কোনো আমল পালন করা পুণ্যের কাজ। আর পাপ করলে পুণ্যের কাজ করতে পারবে না এমনটা নয়। যেমন— কেউ নামায আদায় করে না বলে সে অন্যকে নামায বা রোযার উপদেশ দিতে পারবে না এমনটা নয়; বরং এমন হলে পৃথিবীতে কোন উপদেশ দাতাই বাকি থাকবে না। কারণ নবীগণ ছাড়া আর সকল মানুষই কিছু না কিছু পাপকাজ করতে পারে। এ জন্য ইমাম হাসান আল-বাসারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘শয়তান তো চায় যে, মানুষ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাকুক।’

তবে কথা হলো সাধারণ মানুষ পাপ করলে যে গোনাহ হবে, উপদেশ দাতা পাপ করলে তার চেয়ে বেশি গোনাহ হবে। কারণ সে পাপের পরিণতি সম্পর্কে যতটা জানে সাধারণ মানুষ ততটা জানে না। এ ছাড়া ওয়ায়েজ বা আলেম যদি কোন গোনাহ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকার পরিহাস। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘কিয়ামত দিবসে আলাহ তাআলা অশিক্ষিত লোকদের যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদের ততটা ক্ষমা করবেন না।’^৩

^১ শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা আন-নু'মান*, পৃ. ১১০-১১১

^২ আল-কুরআন, *সূরা আস-সফ*, ৬১:৩

^৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৩৩

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, ‘তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর’। এর মর্মার্থ হলো: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আমার অনুগত বন্দাগণ! তোমরা আমার কাছে পরিকল্পনার দৃঢ়তা, ইচ্ছার পরিপক্বতা এবং যেকোন কাজে ধীর-স্থির নীতি অবলম্বনপূর্বক ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে নামায ও দুআর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। রাসূল ﷺ কোন সমস্যায় পড়লে দু’রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতেন। যেমন-হাদীসে আছে,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى».

‘নবী করীম ﷺ-এর কোন বিপদ এলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।’

আল্লাহর অনুগত বন্দাদের প্রতি এরূপ আদেশ প্রদানের কারণ নিম্নরূপ:

১. ধৈর্য মুমিনের অন্যতম গুণ, আর নামায হলো আল্লাহ ও বন্দার মাঝে সেতু বন্ধন, তাই ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।
২. ধৈর্য হলো নবীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ ধৈর্যশীলের সাথে থাকেন। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী: ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন)।^১ তাই ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে।
৩. নামায মুমিনের মিরাজস্বরূপ। যেমন- রাসূলের বাণী: «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ» (নামায মুমিনের মিরাজস্বরূপ)।^২ বন্দা নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, তাই নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, صَبْرٌ অর্থ صَوْم বা রোযা। তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা নামায ও রোযার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।

মোটকথা মুমিনের জন্য সংকট উত্তরণের উপায় হলো ধৈর্য ও নামায। এর সমন্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।

সবর এবং সালাতের মধ্যে কোনটি উত্তম

নামায সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। ধৈর্যশীলদের সাথেই যখন আল্লাহর সহচর্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তখন নামাযের স্থান ধৈর্যের চেয়েও উর্ধ্বে। তাতে সহচর্যের সুসংবাদ থাকার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নামায দ্বারা ঈমান আর

^১ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৩১৯, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৫৩ ও *সূরা আল-আনফাল*, ৮:৪৬

^৩ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ২২৬

কুফরের মধ্যে ভাগ করা যায়, কিন্তু ধৈর্যের দ্বারা তা হয় না। নামাযই ঈমানের পরিচয়ক, কিন্তু ধৈর্য ঈমানের প্রতীক নয়।

সাবিরীনের ব্যাখ্যা

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে صَابِرٌ শব্দটি صَابِرٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ- ধৈর্যশীলতা। শব্দটি صَبْرٌ মাসদার হতে নির্গত। এর অর্থ: ধৈর্য, ধৈর্যধারণ করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিপদাপদে মহান আলাহর আদেশ ও নিষেধের যথার্থ আনুগত্যে, আত্মিক, আর্থিক ও দৈহিক কষ্টে নিজেকে সু-প্রতিষ্ঠিত রেখে আপন দায়িত্ব পালন করাকে সবর বলা হয়।

এখানে সবর দ্বারা কেউ কেউ বলেছেন যে, রোযার উদ্দেশ্য। মোটকথা নামায এবং সহনশীলতার মাধ্যমে আলাহর সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম সবরকে তিনটি শ্রেণী বিভক্ত করেছেন। যথা—

১. الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ তথা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ: দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুহিবত ও অভাব-অনটনে ভেঙে না পড়া। ৪টি বিষয় দুনিয়া আখিরাতে অত্যন্ত কল্যাণকর। এর মধ্যে এটি অন্যতম। যেমন— হাদীসে আছে,

«وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ».

‘বিপদাপদে ধৈর্যশীল শরীর।’^১

২. الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ তথা আলাহর আনুগত্যের ধৈর্যধারণ করা: মহান আলাহর আদেশ ও নিষেধ পালনে যে ঘাতপ্রতিঘাত আসে তাতে অবিচল থাকা। যেমন— অসুস্থ অবস্থায় নামায আদায় করা, রোযা পালন করা ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের কটুক্তি, গালাগালি, তিরস্কার, গুলি, টিয়ার গ্যাস, জেল হাজত, মৃত্যু ইত্যাদি বরণ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আলাহর বাণী:

يُبَيِّنُ آتِمِ الصَّلَاةِ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

‘হে বৎস! নামায কয়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।’^২

^১ আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৪১১৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, *সূরা লুকমান*, ৩১:১৭

৩. الصَّبْرُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ তথা আলাহর অবাধ্য হওয়া থেকে ধৈর্য ধারণ করা: অন্যায় কাজ হতে দূরে থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। যেমন- অসংখ্য লোক বর্তমান সমাজে অশীল কাজকর্মে নিয়োজিত। কিন্তু এ সকল কাজে নিজেকে না জড়িয়ে পাপকাজ থেকেই মুক্ত থাকার নামই الصَّبْرُ عَلَى اجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ।

আলাহ তাআলা বলেন, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (আর নিশ্চয় এ নামায আলাহভীরু ছাড়া অন্যদের নিকট বড় কঠিন বিষয়)।

খাশি'ঈনের পরিচয়

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الْخَاشِعُونَ শব্দটি বহুবচন, একবচন الْخَاشِعُ অর্থ: অনুগত ব্যক্তি, বিনীত ব্যক্তি, নম্র ব্যক্তি ইত্যাদি। الْخَاشِعِينَ শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. খাশি'ঈন সেসব লোকদের বলা হয় যারা নিজেদের ভীতি-বিহ্বলতা ও বিনীত ভাবসহ মহান আলাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করে এবং তারা আরও বিশ্বাস করে যে, অবশ্যই একদিন স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, খাশি'ঈন দ্বারা কুরআনের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে।
৩. ইমাম আবুল আলিয়া আহমদ ইবনে আলী রাঃ এর মতে, মহান আলাহ ও পরকালের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।
৪. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাঃ বলেন, খাশি'ঈন দ্বারা খাঁটি মুমিনগণ উদ্দেশ্য।
৫. ইমাম ইসহাক রাঃ বলেন, সত্যনিষ্ঠ, বিনয়ী ও আলাহভীরুদেরকে বোঝানো হয়েছে।
৬. কারো মতে খাশি'ঈন দ্বারা বিনয়ী ও নিরহঙ্কারীদের বোঝানো হয়েছে। যেমন- আলাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَنْشِسْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۝

‘তোমরা গর্ব সহকারে জমিনে চলা ফেরা করো না।’

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহে যেখানে খুশ বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সেখানে এর অর্থ। অক্ষমতা ও অপরাগতাজনিত সে মানষিক অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা আলাহ

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩৭ ও সূরা লুকমান, ৩১:১৮

তাআলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইবাদত করা সহজতর হয়।

কখনো এর লক্ষণসমূহ দেহেও প্রকাশ পেতে পারে। তখন সে শিষ্টাচার সম্পন্ন বিনম্র ও কোমল বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আলাহভীতি ও নম্রতা না থাকে, তবে সে বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর ইবনুল খাতাব রাঃ একদিন এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, মাথা উঠাও। বিনয় হৃদয়ে অবস্থান কর।

ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী রাঃ বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাবার খাওয়া এবং মাথা নত করে রাখার নামই খুশু নয় খুশু বা বিনয় অর্থ হকের ক্ষেত্রে ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সবার সাথে একই রকম ব্যবহার করা এবং আলাহ তাআলা তোমার ওপর যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া।

সারকথা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা নিতান্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে তা ক্ষমার্হ।^১

সূরা আল-বাকারার ১১০ আয়াতে বলা হয়েছে, **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَوَمَا** **تَقْرَأُوا مِنْ حَبِيرٍ تُجَدُّوهُ عَنِ اللَّهِ ۝** ‘তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও আর যে ভালো কাজ তোমরা পূর্বে পাঠাবে তা অবশ্যই আল্লাহর নিকট পাবে।’^২ অর্থাৎ তিনি তোমাদের সৎকাজের বদলা ও প্রতিদান দেবেন। যেমন— তিনি অন্যত্র বলেন,

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ۝

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না।’^৩

তাই আমাদের বেশি বেশি নেক কাজ করে আখিরাতের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা উচিত। কেননা হাদীসে আছে,

«مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ».

‘যা তুমি আগে পাঠিয়ে দেবে সেটা তোমার সম্পদ, আর যা রেখে যাবে তা তোমার ওয়ারিসদের সম্পদ।’^৪

^১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৩৮

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১১০

^৩ আল-কুরআন, *সূরা হুদ*, ১১:১১৫ ও *সূরা ইউসুফ*, ১২:৯০

তাই আমাদের সৎ ও সুন্দর জীবন যাপন করা উচিত। সুন্দর জীবন গঠনে উৎসাহমূলক কবিতা:

وَالْقَوْمُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُورًا	*	وَلَدَتِكَ إِذْ وَلَدْتِكَ أُمُّكَ بَاكِيًا
فِي يَوْمٍ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا	*	فَاعْمَلْ لِيَوْمٍ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْا

যে দিন তুমি এসেছিলে ভবে

কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিলে সবে,

এমন জীবন তুমি করিও গঠন

মরিয়া হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।^১

নামায-রোযা তথা সকল ইবাদত ইখলাস বা একনিষ্ঠতা প্রমাণের পক্ষে এ আয়াতটি একটি শক্ত দলীল। সূরা আল-আনআমের ১৬১-১৬৩ আয়াতে যা বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো।

এখানে صَلَاتِي ۞ অর্থ: আমার নামায। এটা স্পষ্ট। আর نُسُكُ শব্দের

অর্থ: কুরবানী। হজের কাজ-কর্মকেও نُسُكُ বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন- অভিধানে عَابِدٌ কে نَاسِكٌ বলা হয়। এ আয়াতে সবকটি অর্থ নেওয়া সম্ভব। তবে এখানে সাধারণ ইবাদত অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করাই বেশি সংঘত। অতএব আয়াতের অর্থ হবে- আমার নামায আমার সমস্ত ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আলাহ তাআলার জন্য নিবেদিত।

এখানে ধর্মের শাখাগত কাজ-কর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও ধর্মের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য কাজ ও ইবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমার এসবকিছু একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আলাহর জন্য নিবেদিত, যার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল।

আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কদম ও পদক্ষেপ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ ধ্যান ও মোরাকাবা

^১ আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরদ*, পৃ. ৬৫, হাদীস: ১৫৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরতুবী, *আত-তায়কিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরা*, পৃ. ৩০৭

সর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে, আমাকে আলাহর পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলিম। কেননা প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলিম স্বয়ং তিনিই নবী হন, যার প্রতি অহী অবতরণ করা হয়। প্রথম মুসলিম হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্টজগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্ট জগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। যেমন— এক হাদীসে বলা হয়েছে,

«أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي».

‘আলাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।’

নুসুকের পরিচয়

অভিধানে نُسْكُ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন— কুরবানী, ইবাদত, নফল ইবাদত, আলাহর অধিকার ইত্যাদি। তবে আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ নির্ণয়ে একাধিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

১. অধিকাংশ তাফসীর কারকের মতে, আয়াতে নুসুক শব্দটি ইবাদত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম দাহহাক ইবনে মুযাহিম রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বলেছেন, এ আয়াতের দ্বারা হজ ও ওমরার পশু কুরবানী করার স্থানকে বোঝানো হয়েছে।
৩. কতিপয় তাফসীরকারক বলেন, আয়াতে নুসুক দ্বারা দেবে হজের কার্যাবলি বোঝানো হয়েছে।
৪. কেউ কেউ বলেন, এখানে নুসুক দ্বারা নামায, কুরবানী ও অন্যান্য যেসব ইবাদত আলাহর নৈকট্য লাভের জন্য করা হয় সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে।
৫. তাফসীরে খাযিনে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে নুসুক দ্বারা সর্বপ্রকার ইবাদত-বন্দেগির কথা বলা হয়েছে।^১

^১ (ক) আল-হালবী, *ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন মামুন*, খ. ১, পৃ. ২১৪, (খ) আবদুল হাই লাখনবী, *আল-আসারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওযুআ*, পৃ. ৪৩: বলেছেন, জনসাধারণে প্রচলিত এই বাক্যখানা নবী ﷺ-এর হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়।

আওয়ালুল মুসলিমীনের ব্যাখ্যা

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলেন, আমি হলাম সর্বপ্রথম মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী)। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম হলেন, সর্বপ্রথম মুসলমান।

আলামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী আলায়হি বলেন, তিনি হলেন সর্বপ্রথম সমর্থনকারী, স্বীকারকারী ও আলাহর জন্য বিনয়কারী।^১

ইমাম হাসান আল-বাসারী আলায়হি ও ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা আলায়হি বলেন,

«أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ».

‘এই উম্মতের প্রথম মুসলমান।’^২

عَصِيْبُ عَلَى مَا يُوْثِقُونَ ৷ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গাঁ বাঁচানোর জন্য নানা রকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূল আলায়হিস সালাম-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ যাদুকর, কেউ কবি, কেউ গণক, আবার কেউ মিথ্যাবাদী বলত। কুরআনুল করীমে তাদের এই যন্ত্রণাদায়ক কথা-বার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

১. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি দ্রুক্ষেপ করবে না, বরং সবর করবেন।
২. আলাহর ইবাদত ও তাঁর স্মরণে মশগুল থাকবেন। বলাবাহুল্য একমাত্র এ দুটি ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই অন্যের অনিষ্ট ও কটুকথা থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব, অন্য মাধ্যমে নয়। কারণ ব্যক্তি যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন সবসময় শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা তার জন্য আরেক আঘাবে পরিণত হয়। সুতরাং সে যদি এসব চিন্তা বাদ দিয়ে সবর করত আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ধ্যান করে যে, আলাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ তার অনিষ্ট করতে পারে না। তাহলে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।^৩

আলাহ তাআলা বলেন, وَسَيُخْرِجُكَ رَبُّكَ ৷ (আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করণ)। এ আয়াতে وَسَيُخْرِجُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বাবে تَفْعِيلٌ-এর মাসদার تَسْيِيْعٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো: ১. صَلِّ তথা রহমত কামনা করা, ২. سُبْحَانَ اللَّهِ বলা।

^১ আল-খাযিন, *নুবাবুত তাওয়াযীল ফী মা‘আনিত তানযীল*, খ. ২, পৃ. ১৭৮

^২ আস-সাবুনী, *সাফওয়াতুত তাফসীর*, পৃ. ৪০০

^৩ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়াযীল কুরআন*, খ. ১০, পৃ. ৪৮, হাদীস: ১৪৩০৬

^৪ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৮৬৯

আলোচ্য আয়াতে **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** ১ দ্বারা সাধারণ যিকর এবং বিশেষভাবে নামায দুই অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। তবে তাফসীরবিদগণ দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাহমতুল্লাহি বলেন, এ আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

কুরআন দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ

আলাহ তাআলার বাণী: **قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا** ২ দ্বারা ফযরের নামায, **وَقَبْلَ غُرُوبِهَا** ৩ দ্বারা আসরের নামায, **وَمِنْ آتَائِ اللَّيْلِ** ৪ দ্বারা ইশার নামায, কেউ বলেন, এর দ্বারা রাতের সব নামায তথা মাগরিব, ইশা ও তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য, আর **وَاطْرَافِ الْهَجْرِ** ৫ দ্বারা মাগরিব ও যুহরের নামায উদ্দেশ্য।

এ আয়াতে **وَلَا تَسُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا لَهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** ৬ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করা হলেও এর দ্বারা আসলে উম্মাতকে হিদায়ত দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি দ্রুক্ষেপ করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আলাহ তাআলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যবস্থায় মুমিনদেরকে দান করেছেন তা এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উত্তম।

আলাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের আদেশ দিয়ে বলেন, **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا** ৭ (আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন)। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে। যথা—

১. পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দেওয়া।
২. নিজেও নামায অব্যাহত রাখা।

যেমন— অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ৮

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও।’ ৯

আর নিজের নামায পুরোপুরি অব্যাহত রাখার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যিক। কেননা পরিবেশ ভিন্ন হলে মানুষ স্বভাবত অলসতার স্বীকার হয়। ১০

১ আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬

তাফসীরে কুরতুবীতে ও তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, স্ত্রী, সন্তানাদি ও সম্পর্কশীল সবাই আহালের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারা মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত। হাদীস শরীফে আছে,

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ يَذْهَبُ كُلَّ صَبَاحٍ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ وَعَلَى رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَيَقُولُ: «الصَّلَاةُ».

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূল ﷺ প্রত্যেহ ফযরের নামাযের সময় হযরত আলী রাঃ ও হযরত ফাতিমা রাঃ-এর ঘরে গমন করে ‘আস-সালাত, আস-সালাত’ বলতেন।^২

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ يُوقِظُ أَهْلَ دَارِهِ لَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَيُصَلِّي وَهُوَ يَتِمَّتُ بِالْآيَةِ.

‘হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন পারিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এ আয়াত পাঠ করে শোনাতেন।’^৩

অতঃপর বলা হয়েছে, ‘আমি তোমার এবং তোমার পরিবারের কাছে রিয়ক চাই না যে, তোমরা রিয়কের তালাশে ব্যস্ত থেকে নামায থেকে গাফিল থাকবে, বরং আমিই তোমাদেরকে রিয়ক দিই।’ হাদীসে আছে,

فَكَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ ضَيَّقُ أَمْرَهُمْ بِالصَّلَاةِ.

‘রাসূল রাঃ এর পরিবারে রিয়কের সমস্যা হলে তিনি পরিবার সদস্যদেরকে নামাযের আদেশ দিতেন।’^৪

কেননা আলাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِّينِ ﴿٥٣﴾

^১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৮৭০

^২ (ক) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১১, পৃ. ২৬৩, (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৮৭০

^৩ (ক) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১১, পৃ. ২৬৩, (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৮৭০

^৪ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১১, পৃ. ২৬৩

‘আমি আমার ইবাদত করার জন্য জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি । আমি তাদের কাছে রিয়ক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খানা খাওয়াবে । আলাহ তাআলাই তো রিয়কদাতা, শক্তিধর, পরাক্রান্ত ।’^১

৞ الْزَّيْنِ إِنَّ مَكْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তারা এমন লোক, যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে ।’ এখানে ٱ বা তারা বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, এ প্রশ্নের জবাবে নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত হয়:

১. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, তারা হলেন চার খলীফা ।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিরাহু আনহুমা-এর মতে, তারা হলেন মুহাজির, আনসার এবং তাবেরীনে কেরাম ।
৩. হযরত ইকরামা রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, তারা হলেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী ।
৪. ইমাম হাসান আল-বাসারী রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, তারা এ উম্মত ।
৫. ইবনে আবু নাজীহ রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতে, তারা হলেন শাসক ।
৬. ইমাম দাহহাক ইবনে মুযাহিম রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, এটা একটা শর্ত, যা আলাহ তাআলা নির্ধারিত করেছেন তার জন্য, যাকে রাজ ক্ষমতা দেওয়া হবে । এ মতটি ইমাম কুরতুবী সুন্দর মত বলে দাবি করেছেন ।^২

প্রকাশ্য কথা হলো এ আয়াত দ্বারা খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । তারাই এর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি । কিন্তু আল-কুরআনের বিধান সর্বদা ব্যাপক হয়, তাই ভবিষ্যতের সকল শাসকের কর্তব্য এখানে বলে দেওয়া হয়েছে । আর এ কর্তব্যের মধ্যে নামাযের কথা আগে এনে তার সবিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব

ইসলামী সরকারের চারটি প্রধান দায়িত্বের কথা এখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে । যথা—

১. নামায কায়েম করা,
২. যাকাত আদায় করা,
৩. সৎ কাজের আদেশ করা ও
৪. অসৎকাজ হতে বাধা দেওয়া ।

^১ আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬-৫৮

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১২, পৃ. ৭৩

সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অবলম্বন

তাহারাৎ বা পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। এটা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। কেননা পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না। তাইতো পবিত্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়া হারাম বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمْ تُجِدُوا الْمَاءَ فَمَنْ تَمَضَّىٰ فَطَيَّبُوا صَعِيدًا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَسْحُوحًا أَوْ جُوهَكُمْ ۖ وَإَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۝۳

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হইও না, যে পর্যন্ত না তোমরা তা ভালোভাবে বুঝতে পার যা তোমরা মুখে বলে থাক। আর নাপাক অবস্থায়ও তোমরা শুধু পথ অতিক্রম ব্যতীত নামাযের নিকটবর্তী হইও না, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল করে নেবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, অতঃপর এ সমুদয় অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। (উক্ত মাটি দ্বারা) স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত পা মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।’^১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمْ تُجِدُوا الْمَاءَ فَمَنْ تَمَضَّىٰ فَطَيَّبُوا صَعِيدًا ۚ فَمَسْحُوحًا أَوْ جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ۖ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তবে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত ধোয়ে নাও। আর তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পদযুগল গোড়ালি

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৪৩

পর্যন্ত ধোয়ে নাও। আর যদি তোমরা (গোসল ফরয হয়েছে এমন) অপবিত্র থাক, তাহলে (গোসল করে) উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন কর। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা ভ্রমণে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা স্ত্রী সহবাস করে থাক, অথচ পানি পাচ্ছ না, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন কর। অতঃপর তোমরা মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত পাসমূহ মাসেহ করবে। আলাহ তাআলা তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করার ইচ্ছা পোষণ করেন না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের ওপর তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।^১

মূল আলোচনা

নামায যেহেতু মহান ইবাদত, তাই পবিত্রাবস্থায় আদায় করতে হয়। নামায আদায় করতে হয় সুস্থ ও সুন্দর মন নিয়ে। সে জন্য মাতাল অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়া হারাম। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে নামাযকে সুন্দরভাবে আদায়ের জন্য যা প্রয়োজন, তথা নেশামুক্ত মন, অযু, গোসল এবং অপারাগতাবস্থায় তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করে মানবমণ্ডলীকে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, এগুলো আলহর করণা। তিনি বন্দাদেরকে কাঠিণ্যে ফেলতে চান না, বরং সর্বদা তাদের জন্য যা সহজ তাই চান।

শানে নুযূল

১. সুনানে আবু দাউদ, জামিউত তিরমিযী, সুনানে নাসায়ীসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে, “ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিহাউল আনহু একদিন কতিপয় মুসলমানকে দাওয়াত করেছিলেন। ইসলামে তখনও মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি। সুতরাং প্রচলন অনুযায়ী আহারের পর সকলে প্রচুর মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হয়। সকলে হযরত আলী রাযিহাউল আনহু-কে ইমাম নিযুক্ত করলেন। কিন্তু হযরত আলী রাযিহাউল আনহু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সূরা আল-কাফিরুন পড়তে গিয়ে যে চার স্থানে ۞ রয়েছে তা পড়েননি। তখনই এ আয়াত বর্ণিত হয়।^২

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৫

^২ (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৩৬৭১, (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ৩০২৬, হযরত আলী রাযিহাউল আনহু থেকে বর্ণিত, (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৮, পৃ. ২৮৬, হাদীস: ৫৫৪০, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিহাউল আনহু থেকে বর্ণিত

২. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তবারী আল-মুহাজ্জি আল-আলম বলেন, এটি মাগরিবের নামাযের সময় ঘটেছিল এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ আল-মুহাজ্জি আল-আলম কিরাআত পড়তে ভুল করে সূরা আল-কাফিরুনের চার স্থান থেকে ১ বাদ দিয়ে পাঠ করেছিল।^১
৩. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী আল-মুহাজ্জি আল-আলম বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম নামাযের সময় তা পান করতেন না, বরং ইশার পর পান করতেন, যাতে ফযর হতে হতে নেশার ভাব কেটে যায়। অতঃপর কিছুদিন পর সূরা আল-মায়িদার ৯১ আয়াত দ্বারা মদ্যপানকে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়।^২
৪. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব আল-মুহাজ্জি আল-আলম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রথম মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা আসল, তখন আমি বললাম, **اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا** (হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট বর্ণনা দিন)। তখন সূরা আল-বাকারার ২১৯ আয়াত নাযিল হলো: **يَسْتَوُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ**। অতঃপর আমাকে ডেকে তা পড়িয়ে শুনিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর আমি রাসূল আল-মুহাজ্জি আল-আলম-এর দরবারে আবার বললাম, **اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَفَاءً**। অতঃপর সূরা আন-নিসার ৪৩ আয়াত নাযিল হলো এবং রাসূল আল-মুহাজ্জি আল-আলম-এর ঘোষক তা নামাযে ঘোষণা করল, মাতাল অবস্থায় যেন কেউ নামাযে না আসে এবং তা আমাকে ডেকে শুনিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর আমি আবারও বললাম, **اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَفَاءً**-এর পর সূরা আল-মায়িদার ৯১ আয়াতে মদ্যপান হারাম হওয়া প্রসঙ্গে চূড়ান্ত ঘোষণা নাযিল হয়।^৩

(ঘ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরক আল-আলম-সাহীহাইন*, খ. ২, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ৩১৯৯, খ. ৪, পৃ. ১৫৮-১৫৯, হাদীস: ৭২২০, ৭২২১ ও ৭২২২, (ঙ) আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৩, পৃ. ৩৭:

عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ، قَالَ: «صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ طَعَامًا، فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأْتُ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: ২-৩] وَتَحَنَّنَ عَبْدُ مَا تَعْبُدُونَ، فَزَكَتُ».

^১ (ক) ইবনে জরীর আত-তবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ালিল কুরআন*, খ. ৭, পৃ. ৪৬, হাদীস: ৯৫২৫, (খ) আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৩, পৃ. ৩৭

^২ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কবীর*, খ. ১০, পৃ. ৮৫

^৩ (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৩৬৭০, (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ২০০: =

৫. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله স্বীয় তাফসীরে বলেন, সূরা আন-নিসার ৪৩ আয়াতে উলিখিত **التَّيْمُّ**-এর বিধান সম্পর্কিত আয়াতাংশ সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আওফ رحمته الله প্রসঙ্গে নাযিল হয়। তিনি যুদ্ধাহতবস্থায় জানাবতগ্রস্ত হন, অতঃপর তাকে অসুস্থতার জন্য গোসলের পরিবর্তে **التَّيْمُّ**-এর অনুমতি দিয়ে এ আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তীতে আয়াতটি সকলের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়।^১
৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী رحمته الله বর্ণনা করেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিম رحمته الله থেকে, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর رحمته الله থেকে, তিনি হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে আমার গলার হার হারিয়ে যায়। এ কারণে নবী করীম صلى الله عليه وسلم সেখানে যাত্রাবিরতি ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় আমার পিতা হযরত আবু বকর আস-সিদীক رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হয়ে খুব বকাবকি করেন এবং আমার পাজরে আঘাত করে বলেন, তোমার কারণেই কাফিলার যাত্রাবিরতি করতে হয়েছে। যাই হোক প্রভাত হয়ে গেলে পানি সন্ধান করা হলো, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। তখন আলাহ তাআলা তায়াম্মুম সম্পর্কীয় দীর্ঘ আয়াতটি নাযিল করেন।^২

= عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتِ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ২১৭] الْآيَةُ، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتِ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ : ﴿إِنَّمَا أَهْلُ الذِّمِّ أَمْنُوا لَا يَفْرِقُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ৫৪]، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: «أَلَا لَا يَفْرِقُ الصَّلَاةَ سُكَارَى»، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتِ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُتْنَهُونَ﴾ [المائدة: ৭২] .

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ২১৪

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ৫০-৫১, হাদীস: ৪৬০৭:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، رَوَى النَّبِيُّ ﷺ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْحِجْشِ، انْقَطَعَ عَقْدِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّبَاسِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، فَأَمَتَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعُ رَأْسِهِ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ

৭. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, আলোচ্য আয়াতে করীমাটি গয়ওয়ায়ে যাতুর রিকা' থেকে ফেরার পথে নাযিল হয়েছে। নবীপত্নী হযরত আয়িশা রাযীয়ালাহু আনহা-এর গলার হার দু'বার হারানো গিয়েছিল। প্রথমবার বনী মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে। সেবার ইফকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়বার গয়ওয়ায়ে যাতুর রিকা' থেকে ফেরার পথে, তখন তায়াম্মুম সংক্রান্ত অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ﴾ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত

অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না)। মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, আয়াতটিতে মদ্যপান চূড়ান্তভাবে হারাম হওয়ার পূর্বের কথা বলা হয়েছে।

১. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাযীয়ালাহু আনহা বলেন, এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামের প্রথম যুগে এ পরিমাণ মদ্যপান জাযিয় ছিল, যাতে মাতাল না হয়।^১

২. ইমাম যাহ্‌হাক রাযীয়ালাহু আনহা বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ঘুমে এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, সে কি বলছে তা বুঝতে পারছে না বা ঢলে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে সে নামাযে দাঁড়াবে না। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَا

يُدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ».

‘তোমাদের কেউ যদি নামাযে ঝিমায়, তাহলে তার থেকে ঘুমের ভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন ঘুমিয়ে নেয়। কেননা সে বুঝতে পারবে না যে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে নাকি নিজেকে গারি দিচ্ছে।’^২

তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা এ অবস্থায় নামাযে দাড়াতে বিকৃতির আশঙ্কা থাকে।

عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مَنِ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فُجْزِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ النَّيْمِ ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ৫৬].

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ২০২

^২ (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ২০১, (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৫৩, হাদীস: ২১২, হযরত আয়িশা রাযীয়ালাহু আনহা থেকে বর্ণিত

সুকারার পরিচয়

سُكْرَى শব্দটি سُكْرَانُ-এর বহুবচন। ইমাম রাগিব আল-আসবাহানী رحمتهما বলেন, سُكْرٌ এমন অবস্থাকে বলা হয়, যা মদ্যপানের ফলেই সাধারণত সৃষ্টি হয়। অবশ্য কখনও এ অবস্থা অধিক রাগ, প্রেম কিংবা আসক্তির কারণেও হয়ে থাকে।^১ যেমন- বলা হয়: أَخَذَهُ سُكْرُ الشَّبَابِ، أَوِ الْهَالِ، أَوِ السُّلْطَانِ، أَوِ النَّوْمِ।^২ বস্তুত শব্দটি س-এর ওপর পেশ দিয়ে পড়া হয়। আর মৌলিক দিক এটা س-এর নীচে যের দিয়ে পড়া হয়, যার অর্থ হয়: مَا يُسَدُّ بِهِ النَّهْرُ وَنَحْوُهُ (এমন বস্তু যা নদি বা অন্যকিছুতে বাঁধ সৃষ্টি করে)। যেহেতু سُكْرٌ দ্বারা عَقْلٌ বিলুপ্ত হয়ে জ্ঞানের পথে বাঁধ পড়ে, সেহেতু একে سُكْرٌ বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ অর্থে মৃত্যুর সময় যে ভয়াবহতার সৃষ্টি হয়, তাকে سُكْرَةُ الْمَوْتِ বলা হয়।

সুকারার দ্বারা উদ্দেশ্য

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী رحمتهما বলেন, আয়াতে سُكْرَى দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

১. মদ্যপানে মাতাল ব্যক্তি। অধিকাংশ মুফাসসির এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
২. ঘুমে অচেতন ব্যক্তি। ইমাম যাহ্‌হাক رحمتهما এরূপ বলেছেন।^৩

সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য

আয়াতে الصَّلَاة দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

- ইমাম আবু হানিফা رحمتهما বলেন, الصَّلَاة দ্বারা স্বয়ং তথা শরয়ী নামাযই উদ্দেশ্য। হযরত আলী رحمتهما, ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর رحمتهما এবং ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা رحمتهما প্রমুখ থেকে এ মতের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী رحمتهما বলেন, আয়াতে الصَّلَاة দ্বারা مَوْضِعُ الصَّلَاة তথা নামায আদায়ের স্থানের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেওনা তথা নামায পড়ো না। নামায

^১ আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, পৃ. ৪১৬

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, খ. ১, পৃ. ৪৩৮

^৩ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ১, পৃ. ৪০৮

অত্যন্ত পবিত্র ইবাদত। এতে অনেক পুণ্য রয়েছে। কিন্তু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ থেকে এমন আশালীন উক্তি বের হয়ে আসে, যা নামাযের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেমানান। তাই আলহ রাকবুল আলামীন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামায আদায়ের ধারে কাছেও যেয়ো না।

وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرُ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۖ (অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যাবে না)। তবে মুফাসসির ব্যক্তি এ হুকুম থেকে স্বতন্ত্র। ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী রাহমাতুল্লাহু আলায়হ বলেন, আয়াতাংশে عَابِرُ السَّبِيلِ প্রসঙ্গে দু'ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা—

১. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাহমাতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা রাহমাতুল্লাহু আলায়হ হযরত আলী রাহমাতুল্লাহু আলায়হ হতে বলেন, আয়াতের অর্থ হলো: অপবিত্র অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না সে মুসাফির হলে পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করে।
২. ইমাম হাসান আল-বাসারী রাহমাতুল্লাহু আলায়হ, হযরত আনাস ইবনে মালেক রাহমাতুল্লাহু আলায়হ ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহমাতুল্লাহু আলায়হ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামাযের স্থানের নিকটবর্তী হইও না এবং সেখানে বসো না।^১

وَلَا جُنْبًا-এর বিশ্লেষণ

অভিধানে جُنْبًا-এর অর্থ বীর্য। হানাফী আলেমগণ বলেন, جُنْبًا-এর শাব্দিক অর্থ হলো: خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ (কামভাবের কারণে বীর্য বের হওয়া)।^২ কোনো কোনো আলেমকে সাধারণভাবে جُنْبًا-এর সাথে ব্যবহার করেন। কিন্তু جُنْبًا-এর প্রকৃত অর্থ البُغْيُ বা দূরত্ব, সম্পর্কহীনতা। এটা থেকে أَجْنَبِيٌّ শব্দের উৎপত্তি। শরীয়তের পরিভাষায় جُنْبًا বলতে বোঝায় স্ত্রী সহবাসজনিত অথবা নিদ্রাবস্থায় নির্গমণ হওয়ার কারণে যে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় তা। কারণ এ অবস্থায় মানুষ পবিত্রতা থেকে দূরে সরে যায়, তার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে।

وَلَا جُنْبًا-এর মর্মার্থ

عَابِرُ শব্দটি عُبُورٌ মাসদার থেকে উৎকলিত। আর عُبُورٌ অর্থ হলো বা অতিক্রম করা। যেমন— বলা হয়: عَبَرْتُ الطَّرِيقَ তথা قَطَعْتُ الطَّرِيقَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى

^১ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ১, পৃ. ৪০৮

^২ আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী*, খ. ১, পৃ. ১৯

جَانِبٍ (আমি রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়েছি)। আর سَبِيلٌ ১ অর্থ: রাস্তা। অতএব عَابِرٌ سَبِيلٍ অর্থ: রাস্তা অতিক্রমকারী, পথিকগণ, মুসাফির দল অথবা সেই সব ব্যক্তিবর্গ, যারা মসজিদে গমন করে এবং মসজিদ দিয়ে পথ অতিক্রম করে।

আলাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে গমন করা যাবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা থেকে বাদ দিয়েছেন সেই সব ব্যক্তিবর্গকে, যারা মসজিদ দিয়েই পথ অতিক্রম করে। আর এ ক্ষেত্রে বলেছেন, اِلَّا عَابِرٌ سَبِيلٍ ১।

এ অংশের মর্মার্থ বর্ণনায় অধিকাংশ ফকীহ ও মুফাস্সির বলেন, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তিকে মসজিদের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করতে হয়, তাহলে তা অবৈধ হবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিহু আনহু, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিহু আনহু, ইমাম হাসান আল-বাসারী রাযিহু আলায়হি ও ইমাম ইবরাহীম আন-নাখায়ী রাযিহু আলায়হি এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

আয়াতের অংশটুকু নাযিলের ব্যাপারে একটি ঘটনাও বর্ণিত আছে। ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী রাযিহু আলায়হি বর্ণনা করেন, আনসারদের কতিপয় লোকের বসবাসের ঘর ছিল মসজিদেরই একপাশে। তাদেরকে অপবিত্রতার গোসল করার জন্য মসজিদ অতিক্রম করে যেতে হয়। এতে তারা অসুবিধা অনুভব করলে আলাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করলেন। অর্থাৎ যাদের একান্ত প্রয়োজনে মসজিদের মধ্যদিয়ে অপবিত্র অবস্থায় বাইরে যেতে হয়, তাদের জন্য কোন অসুবিধা হবে না।^১

اِلَّا عَابِرٌ سَبِيلٍ-এর মধ্যকার ইসতিসনার উদ্দেশ্য

মহান আলাহর বাণী: اِلَّا عَابِرٌ سَبِيلٍ-এর মধ্যে যে, اِسْتِثْنَاءٌ রয়েছে, তা হলো اِسْتِثْنَاءٌ مُفْرَعٌ; আর ইসতিসনায়ে মুফাররাগ হলো, যার مُسْتَشْتِئٌ مِنْهُ উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি হবে, لَا تُصَلُّوْا جُنُبًا فِي عَامَّةِ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي حَالَةِ السَّفَرِ إِذَا لَمْ تَحْدُوا (তোমরা অপবিত্র থাকাকালীন সময়ে কোন অবস্থাতে নামায আদায় করো না। তবে ভ্রমণ কালে পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে)। অথবা বাক্যটি এরূপ হতে পারে: لَا تَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ فِي حَالَةِ الْجُنُبِ، وَلَا فِي حَالَةِ السُّكْرِ،

^১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়াযীলিল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৭, হাদীস: ৯৫৬৭

إِلَّا أَنْ تَعْبُرُوا بِلَا بُدِّ (তোমরা অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ধারে কাছেও যেয়ো না এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ও নয়, তবে সেখানদিয়ে অবস্থান না করে পথ অতিক্রম করতে পারবে) ।

গোসলের বিবরণ

ক. অভিধানিক অর্থ

غُسْلٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার । অভিধানে এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায় । যেমন—

১. إِفَاضَةُ الْمَاءِ (পানি প্রবাহিত করা) ।
২. إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ (নাপাক পানি দূর করা) ।
৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাজার আল-আসকলানী ^{মোহতাজ আলিয়াহ} বলেন, سَيْلَانُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ (শরীরে পানি প্রবাহিত করা) ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. শরীয়তের পরিভাষায়: গোসল বলা হয়:

الْغُسْلُ: هُوَ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ.

‘পবিত্রতার নিয়ত করে মাথা থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গে পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলে ।’

২. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থাকার বলেন,

الْغُسْلُ: تَغْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ.

‘পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে ।’^১

গোসলের প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় গোসল চার প্রকার । যথা—

১. ফরয গোসল: স্ত্রী সহবাস, উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত ও হাযিয়-নিফাস থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ফরয ।
(ক) মহান আলাহর বাণী:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۖ

‘যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও ।’^২

^১ সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ, খ. ১, পৃ. ৬৪

(ক) মহানবী ﷺ-এর বাণী:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

‘হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘স্ত্রী সহবাসকালে বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়।’^২

২. ওয়াজিব গোসল: যে গোসল হাদীসে ওয়াজিব হয়েছে তাই ওয়াজীব গোসল। যেমন- মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়া। ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব।

৩. সুন্নত গোসল: জুমা, দু’ঈদ, আরাফার দিন ও ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা সুন্নত। যেমন- রাসূল ﷺ-এর বাণী:

«مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

‘যে জুমার নামাযে আসবে সে যেন গোসল করে।’^৩

৪. মুস্তাহাব গোসল: আলহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে যে গোসল করা হয়, তাই মুস্তাহাব গোসল। যেমন- ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা।

যেসব কারণে গোসল করা ফরয

গোসল ফরয হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. বীর্যপাত হওয়া: বীর্যপাত চাই স্বপ্নাবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক উভয় অবস্থায় গোসল ফরয হবে। যেমন- হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْ مَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

‘হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘স্ত্রী সহবাসকালে বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়।’^৪

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৬

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ৮১ (৩৪৩)

^৩ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৪৬, হাদীস: ১০৮৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

^৪ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ৮১ (৩৪৩)

اللَّهُ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْإِلَهِ حَقٌّ، فَهَلْ عَلَى الْإِلَهِ مَرَّةٌ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ».

‘হযরত উম্মে সালামা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জনৈক হযরত উম্মে সুলাইম رضي الله عنها নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? আল্লাহর রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘হ্যাঁ, যদি বীর্যপাত দেখতে পায় তাহলে গোসল করতে হবে।’^১

২. উভয় লিঙ্গের মিলন: লিঙ্গ যৌনদ্বারে প্রবেশ করলে যদি বীর্যপাত নাও হয়, তবুও গোসল করা ফরয হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«إِذَا تَقَى الْخِتَانَانِ، وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

‘যখন দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হয় এবং পুংলিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হয়, তখন ওয়াজিব হয়।’^২

৩. মাসিক ঋতুস্রাব: মহিলারা মাসিক ঋতুস্রাব থেকে অব্যাহতি লাভ করলে পবিত্রতা অবলম্বনের জন্য গোসল করা ফরয হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«فَإِذَا أَذْبَرَتِ الْحَيْضَةُ، فَأَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

‘যখন তুমি হায়েয থেকে অব্যাহতি লাভ করবে, সাথে সাথে তোমার রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং পরে নামায পড়বে।’^৩

৪. সন্তান প্রসবকালীন স্রাব: সন্তান প্রসবের পর নারীদের রক্তস্রাব হয়, তা বন্ধ হলে পবিত্রতার জন্য গোসল করা ফরয। মহানবী ﷺ হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক رضي الله عنه এর স্ত্রীর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

«يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهْلَ».

‘তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেওয়ার জন্য।’^৪

জুনুবী ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট কার্যাবলি

যে ব্যক্তির ওপর গোসল করা ফরয হয়েছে, তার জন্য গোসলের পূর্বে পাঁচটি কাজ করা হারাম। যথা—

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৫১, হাদীস: ৩২ (৩১৩)

^২ আত-তাবারানী, *আল-মুজাম্মুল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, হাদীস: ৪৪৮৯

^৩ আবু ইউসুফ, *আল-আসার*, পৃ. ৩৮, হাদীস: ১৯৫, হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

^৪ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৬৯, হাদীস: ১০৯ (১২০৯), হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

১. নামায আদায় করা। যেমন— আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۖ

‘আর নাপাক অবস্থায়ও তোমরা শুধু পথ অতিক্রম ব্যতীত নামাযের নিকটবর্তী হইও না, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল করে নেবে।’^১

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۖ

‘আর তোমরা যদি অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও তথা গোসল করো।’^২

২. কাবা শরীফ তওয়াফ করা। কেননা এটা নামাযতুল্য, হাদীস শরীফে আছে,

«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ».

‘তওয়াফ করা নামাযতুল্য। তবে এতে কথা বলা আলাহ তাআলা বৈধ করেছেন। সুতরাং যে কথা বলতে চায় সে যেন ভালো কথাই বলে।’^৩

৩. আল-কুরআন স্পর্শ করা। যেমন— আলাহ তাআলা বলেন,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۖ

‘যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।’^৪

৪. আল-কুরআন পাঠ করা। যেমন— হাদীস শরীফে আছে,

«لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ».

‘অপবিত্র ব্যক্তি এবং হায়িযা নারী কুরআন পাঠ করবে না।’^৫

৫. মসজিদে প্রবেশ করা বা অবস্থান করা। যেমন— হাদীস শরীফে আছে,

«إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَيْضٍ، وَلَا لِحَائِضٍ».

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৪৩

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৬

^৩ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নিফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৩, পৃ. ১৩৭, হাদীস: ১২৮০৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিহুমা থেকে বর্ণিত

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৯

^৫ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৯৬, হাদীস: ৫৯৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিহুমা থেকে বর্ণিত

‘অপবিত্র ব্যক্তি এবং হাযিয়া নারী কুরআন পাঠ করবে না।’^১

নিশ্চয় মসজিদ কোনো হায়েয়া নারী বা জুন্‌বী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।

গোসলের ফরযসমূহ

ইসলামী শরীয়তে গোসলের ফরয ৩টি। যথা—

১. কুলি করা।
২. নাকে পানি দেওয়া
৩. সমগ্র শরীর ধোয়া।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গোসলের ফরয দুইটি। যথা—

১. নিয়ত করা কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

‘প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত।’^২

২. সমগ্র শরীর ধোয়া।

ফরয গোসলের পদ্ধতি

কোন ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয প্রমাণিত হলে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে। তবে ফরয গোসলের কিছু নিয়ম রয়েছে। গোসলের সুন্নত নিয়ম হলো প্রথমে পবিত্র পানি ঢেলে দু’হাতের কজি পর্যন্ত তিনবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানসহ শরীরে বা কাপড়ে যেখানে নাপাক লেগেছে, তা ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর দু’হাত মাটিতে ঘষে বা সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর গঢ়গঢ়ার সাথে কুলি করা এবং নাকের ভেতরে পানি পৌঁছানোসহ নামাযের অযুর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ অযু করতে হবে। তবে গোসলের স্থানে পানি জমে থাকলে পা সবশেষে ধোয়ে নিতে হয়। অতঃপর পানি তিনবার এমনভাবে ধুয়ে নেবে যে, চুলের সকল গোড়ায় যেন পানি পৌঁছে যায়। অতপর প্রথমে ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধে তিনবার করে পানি ঢেলে পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে গোসল সমাপ্ত করাই সুন্নত।

জুন্‌বী মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে মতবিরোধ

জুন্‌বী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

^১ (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১২, হাদীস: ৬৪৫, (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু’জামুল কবীর*, খ. ২৩, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ৮৮৩, হযরত উম্মে সালামা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৬, হাদীস: ১, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

১. হানাফীর অভিমত: ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা এবং মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

«وَجَهُّوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ».

‘তোমাদের গৃহের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরাও। কেননা ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও অপবিত্র লোকদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হালাল (বৈধ) মনে করি না।’^১

২. মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ-এর অভিমত: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করা মুবাহ। উল্লেখ্য, মুসাফির অবস্থায় কেউ অপবিত্র হয়ে গেলে এবং গোসল করা সম্ভব না হলে সে তায়াম্মুম করেই নামায আদায় করবে, এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।

৩. অন্যান্যদের অভিমত: কারো কারো মতে, জুনুবী ব্যক্তি তাওয়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।

অধিকাংশ আলেমের মতে, মসজিদে অবস্থান করা জাযিয নয়। তবে যদি পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি মসজিদে থাকে অথবা পানি আনার জন্যই মসজিদের ভেতর দিয়েই যাওয়া আসা করতে হয়, তাহলে জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের ভেতর দিয়ে আসা যাওয়া করতে পারবে। হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ৫৪]

[৫৪]، أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَبْوَابُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانُوا تُصِيبُهُمُ

الْجَنَابَةُ، وَلَا مَاءَ عِنْدَهُمْ، فَيُرِيدُونَ الْمَاءَ ، وَلَا يَجِدُونَ مَرًّا إِلَّا فِي

الْمَسْجِدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ৫৪].

‘হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবিব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, আনসারদের কতিপয় লোকের ঘরের দরজা ছিল মসজিদের মধ্যে। অর্থাৎ তারা মসজিদেরই একপাশে অবস্থান করত আর সে অবস্থায় তারা জুনুবী হতো, কিন্তু পানি আনতে গেলে মসজিদে গমন ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা

^১ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬০, হাদীস: ২৩২, হযরত আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

নেই। তাদের সে অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে আলাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।^১

এতে বোঝা গেল, একান্ত প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর দিয়ে আসা যাওয়া করা যায়।

৩০-وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

مرضی শব্দটি مَرِيض-এর বহুবচন। এর অর্থ রোগী; مَرَض শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো রোগ। আর পরিভাষায় مَرَض হলো الْبَدَنُ عَنْ حَدِّ الْإِغْتِدَالِ إِلَى الْأَعْوَجَاجِ অর্থাৎ শরীর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বাঁকা বা অস্বাভাবিক অবস্থায় চলে যাওয়া। এ অবস্থা দু'রকমের হতে পারে: كَثِيرٌ (বেশি) ও يَسِيرٌ (কম)।

রোগ যদি বেশি হয়, তাহলে তায়াম্মুম করা যাবে। আর রোগের আধিক্যের পরিমাণ হলে, পানি ব্যবহার করলে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা অথবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া। এ ব্যাপারে সকল আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলেও পানি ব্যবহার করতে হবে। এ মত-অনুযায়ী শরীয়ত পালন করা অনেকটা কঠিন হয়ে যায়। অথচ ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে কোন কাঠিন্য নেই। যেমন- আলাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۝

‘এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।’^২

সুতরাং মারাত্মক অসুখ হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পানি ব্যবহারের পরিবর্তে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা জাযিয।

৩১-الْعَائِلُ-এর অর্থ

عَائِلٌ বলা হয় নীচু ভূমিকে। মানুষ যখন পায়খানা প্রস্রাব করার ইচ্ছা করত, তখন নীচু ভূমি তালাশ করত। যেন মানুষের দৃষ্টির আড়ালে প্রয়োজন সেরে নিতে পারে। এ পদ্ধতি যখন সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে, তখন স্থানের নামে কাজের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে।

আবার অভিধানে এই শব্দটিকে الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ বা প্রশান্তিময় স্থান বলা হয়েছে। কারণ সেখানে গিয়ে কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বস্তি

^১ ইবনে ওয়াহ্ব, তাফসীরুল কুরআন মিনাল জামি' লিবনি ওয়াহ্ব, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১২০

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৭৮

আসে। পায়খানা বা প্রস্রাবের বেগ হলে দুনিয়ার অন্যকিছু আর ভালো লাগে না, বরং সেই কাজটিকেই ভালো লাগে। সে জন্য ওই স্থানটিকে غَائِطُ বলা হয়ে থাকে।

⑩ لَمَسُ-এর মধ্যকার لَمَسُ-এর মর্মার্থ

لَمَسُ শব্দের আভিধানিক অর্থ ছোঁয়া, স্পর্শ করা, মিলানো। তবে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কী উদ্দেশ্য হবে, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

১. প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের অভিমত: হযরত আলী রَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, হযরত আয়িশা রَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا, হযরত আব্বাস রَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, হযরত হাসান রَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এবং ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রমুখ বলেন, আয়াতে لَمَسُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো جَمْعُ বা সহবাস। ইমাম আবু হানিফা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

২. আরেকদল মুফাসসিরের অভিমত: পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, হযরত আবদুল্লাহ ওমর ইবনে ওমর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, لَمَسُ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ هُوَ التَّفَاءُ الْبَشَرِيِّ (চামড়ায় মিলিত হওয়া)। ইমাম বায়হাকী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, لَمَسُ-এর অন্তর্ভুক্ত) ^১ الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمَسِ (চুম্বন করা

সূতরাং কেউ যদি তার স্ত্রীকে চুম্বন করে, তাহলে তার ওপর অযু আবশ্যিক হবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, ইমাম শিহাবউদ্দীন আয-যুহরী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ও ইমাম আবদুর রহমান আল-আওয়ালী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রমুখ বলেন, স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করলেই অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং নতুন করে অযু করতে হবে।

তবে ইমাম মালিক ইবনে আনাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, স্ত্রী কিংবা পুরুষ যদি কামাসক্ত হয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে, তবে তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং নামায আদায়ের জন্য তাকে নতুন করে অযু করতে হবে। কিন্তু কামভাব ছাড়াই যদি একজনের দেহের সাথে অন্যজনের দেহের স্পর্শ লেগে যায়, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না এবং অযুরও প্রয়োজন হবে না।

^১ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুস কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৯৮, হাদীস: ৬০৭

তাওয়াম্মুমের বিবরণ

ক. আভিধানিক অর্থ

تَيَمُّم শব্দটি বাবে تَفَعُّل-এর মাসদার, এটা يَمُّ মূলধাতু থেকে নির্গত।

এর আভিধানিক অর্থ হলো:

১. تَيَمَّمْتُ فَلَانًا أَي قَصَدْتُهُ (ইচ্ছা করা)। যেমন- বলা হয়: تَيَمَّمْتُ فَلَانًا أَي قَصَدْتُهُ।
২. تَيَمَّمْتُ فَلَانًا أَي قَصَدْتُهُ (সংকল্প করা বা ইচ্ছা করা)।
৩. تَيَمَّمْتُ فَلَانًا أَي قَصَدْتُهُ (ইচ্ছা পোষণ করা)।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাওয়াম্মুম বলা হয়:

عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ إِلَى الصَّعِيدِ لِلتَّطَهِيرِ.

‘পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মাটি ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করে তা বাস্তবায়ন করার নামই তাওয়াম্মুম।’^১

২. মু'জাম্মুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

مَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِالتُّرَابِ.

‘মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করাকে তাওয়াম্মুম বলে।’^২

৩. কেউ কেউ বলেন, পবিত্রতার নিয়তে মাটির দ্বারা মুখ ও হৃদয় মাসেহ করাকে তাওয়াম্মুম বলে।

এ তাওয়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দান। এটা এ উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য। এ উম্মতের সহজের জন্য এটাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

তাওয়াম্মুমের প্রকারভেদ

তাওয়াম্মুম মোট তিন প্রকার। যথা-

১. ফরয তাওয়াম্মুম। যেমন- ফরয নামাযের জন্য তাওয়াম্মুম করা।
২. ওয়াজিব তাওয়াম্মুম। যেমন- কাবা শরীফ তাওয়াফের জন্য তাওয়াম্মুম করা।
৩. নফল তাওয়াম্মুম। যেমন- ফরয, ওয়াজিব ইবাদত ছাড়া সাধারণভাবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাওয়াম্মুম করা।

^১ আস-সারাখসী, আল-মবসুত, খ. ১, পৃ. ১০৬

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, আল-মু'জাম্মুল ওয়াসীত, খ. ২, পৃ. ১০৬৬

তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৭টি শর্ত আছে। যথা—

১. সময় হওয়া,
২. নিয়ত করা,
৩. মুসলমান হওয়া,
৪. পানি তালাশ করে না পাওয়া,
৫. তায়াম্মুম করা হবে যে অঙ্গে তাতে কোন বাধা না থাকা। যেমন— রঙ, মোম ইত্যাদি।
৬. হায়িয-নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া,
৭. তায়াম্মুম বৈধকারী ওজর উপস্থিত থাকা।

যেসব কারণে তায়াম্মুম বৈধ

যে সকল কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে তা হলো:

১. অযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট পারিমাণে পানি না পাওয়া।
২. যদি রোগ বা ক্ষতের কারণে এ আশঙ্কা হয় যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে বা সুস্থতা বিলম্বিত হবে তাহলে তায়াম্মুম করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।
৩. পানি যদি এত বেশি ঠাণ্ডা হয় এবং নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, তা ব্যবহারে ক্ষতি হবে এবং তা গরম করার কোন মাধ্যমও না থাকে তাহলে তায়াম্মুম বৈধ।
৪. পানি নিকটে আছে কিন্তু তা উত্তোলনের ব্যবস্থা নেই কিংবা পানি আনতে গেলে শত্রু বা হিংস্র জন্তুর ভয় বা সম্পদ চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম বৈধ।
৫. সাথে পানি আছে কিন্তু তা ব্যবহার করে ফেললে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাহলে তা দ্বারা অযু না করে তায়াম্মুম করবে।
৬. যদি পানি ব্যবহার করতে গেলে এমন নামায ছুটে যায়, যার কোন বদলা নেই। যেমন— ঈদের নামায, তাহলে উক্ত অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ।

তায়াম্মুমের রুকন

আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ কিতাবে বলা হয়েছে যে, তাওয়াম্মুম এর রোকন মোট চারটি। যথা—

১. পবিত্রতার নিয়ত করা।
২. সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা।
৩. পবিত্র মাটি।
৪. দু'হাত কনুইসহ মাসেহ করা।^১

^১ আবদুর রহমান আল-জযীরী, আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫

তায়ম্মুম করার পদ্ধতি

এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলাইহ ও অধিকাংশ আলেমের মতে, তায়াম্মুমের সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে নিয়ত করা এবং দু'হাতের তালু ও আঙ্গুল খোলা রেখে মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিসের ওপর দু'বার হাত মেয়ে প্রথমবারে সমগ্র মুখমণ্ডল এবং দ্বিতীয়বারে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত এমনভাবে মাসেহ করতে হবে, যেন একটি চুল পরিমাণ স্থানও বাকি না থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْتَيْمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».

‘তায়াম্মুমের জন্য দু'বার হাত মারতে হবে, একবার মুখমণ্ডলে এবং দ্বিতীয়বারে দু'হাতে কনুই পর্যন্ত।’^১

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইসহাক রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইমাম আবদুর রহমান আল-আওয়ায়ী রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইমাম মাকছল ইবনে আবু মুসলিম রহমতুল্লাহু আলাইহ ও আহলে হাদীসের মতে, তায়াম্মুম করতে হাত মাটিতে একবার মারলেই চলবে। হাদীসের ভাষায়:

«فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيْهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন।’^২

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, তায়াম্মুমের জন্য হাত মাটিতে তিন বার মারতে হবে। প্রথমবার চেহারা মাসেহ করার জন্য, দ্বিতীয়বার দু'হাত মাসেহ করার জন্য এবং তৃতীয়বার চেহারা ও দু'হাত একত্রে মাসেহ করার জন্য।

যেসব কারণে তায়াম্মুম বিনষ্ট হয়

১. যেসব কারণে অযু ভঙ্গ হয় তাতে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়।
২. তায়াম্মুম অবস্থায় পানি পাওয়া গেলে।
৩. অক্ষম ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ক্ষমতা ফিরে পেলে।

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ১২, পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ১৩৩৭৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর

রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদীস: ৩৩৮, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

তবে তায়াম্মুমসহ নামায পড়ার পর যদি পানি পাওয়া যায় কিংবা তা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, তবে উক্ত নামায পূনরায় পড়তে হবে না।

⑦ صَعِيدٌ أَطْيَبٌ-এর অর্থ

ভাষাবিদগণ ⑦ صَعِيدٌ-এর অর্থ নির্ধারণে মতপার্থক্য করেছেন। যেমন-

১. ইমাম ইবরাহীম ইবনুস সার্বী আয-যাজাজ আলায়াহি বলেন,

الصَّعِيدُ: اسْمٌ لَّوَجْهِ الْأَرْضِ تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَلًا أَوْ جَصًّا أَوْ نَوْرَةً أَوْ حَجْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

‘صَعِيدٌ হলো জমিনের ওপরিভাগের নাম, চাই তা মাটি হোক কিংবা বালি-চূনা, সুরকি, পাথর যাই হোক সবগুলোই صَعِيدٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।’^১

এ অর্থের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা আলায়াহি বলেন, মাটি এবং জমিনের সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জাযিয় হবে।

২. ইমাম মুহয়ুউস সুন্নাহ আল-বগওয়ী আলায়াহি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আনহুমা বলেছেন, الصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ, صَعِيدٌ হলো মাটি।^২

এ অর্থের ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী আলায়াহি বলেন, তায়াম্মুম করার উপকরণ অবশ্যই মাটি হতে হবে। যে অংশ হাত দ্বারা স্পর্শ করবে, অন্ততপক্ষে সেখানে মাটির অংশ থাকতে হবে। তিনি দলীল হিসেবে হযরত হুযায়ফা আনহু-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। তা হলো:

«فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بَثْلًا: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ».

‘অন্য সব লোকের চেয়ে তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের (নামাযের) কাতার বা সারি ফেরেশতাদের কাতার বা সারির মতো করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য

^১ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাকসীরুল মাযহারী, খ. ২, পৃ. ১২৬

^২ (ক) আল-বগওয়ী, মা’আলিমুত তানযীল ফী তাকসীরিল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২২৬, (খ) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাকসীরুল মাযহারী, খ. ২, পৃ. ১২৬

মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে। আর পানি না পেলে পৃথিবীর মাটিকে আমাদের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেওয়া হয়েছে।^১

৩. ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি বলেছেন, মাটি আর বালি ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়য হবে না।
৪. আল-কামুস গ্রন্থকার বলেন, صَعِيدٌ অর্থ: মাটি এবং জমিনের উপরের ভাগ।^২
৫. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী রহমতুল্লাহু আলায়হি বলেন, صَعِيدٌ أَطْيَبٌ বলতে পবিত্র মাটিকে বোঝানো হয়েছে।^৩
৬. ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর মতে, صَحِيدٌ অর্থ: مَا تَصَاعَدَ مِنَ الْأَرْضِ (যা জমিন থেকে উপরে উঠে)।^৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ -এর ব্যাখ্যা

মহান আলাহর বাণী: إِذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ إِلَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ -এর অর্থ হলো: إِذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ إِلَى (হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর, তখন যদি তোমরা অযুহীন থাক, তবে তোমাদের মুখমণ্ডল ধোয়ে নাও)।^৫ এ আয়াতকে آيَةُ الْوُضُوءِ বা অযুর আয়াত বলে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায়, যে কেউ নামাযের ইচ্ছা করবে, তারই অযু করতে হবে। সে অপবিত্র থাক বা না থাক। কিন্তু হাদীস দ্বারা এ সমস্যার সামাধান পাওয়া যায় যে, নামাযের আগে অপবিত্র থাকলেই কেবল তার জন্য অযু ফরয। অন্যথায় প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করা মুস্তাহাব, ফরয নয়। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ!».

‘হযরত সুলায়মান ইবনে বুরায়দা রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা বুরায়দা রহমতুল্লাহু আলায়হি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা অযু করতেন। কিন্তু মক্কাবিজয়ের দিন তিনি এক অযু দ্বারা সমস্ত নামায আদায় করলেন। অতঃপর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রহমতুল্লাহু আলায়হি

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৭১, হাদীস: ৪ (৫২২)

^২ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ২, পৃ. ১২৬

^৩ ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, গরীবুল কুরআন, পৃ. ১২৭

^৪ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কবীর, খ. ১০, পৃ. ৯০

^৫ আল-বগওয়ী, মা‘আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২০

বললেন, হে রাসূল! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা আপনি আর কোন দিন করেননি। তখন হযরত নবী করীম ﷺ বললেন, ‘হে ওমর! আমি তা ইচ্ছাপূর্বক করেছি।’^১

এতে বোঝা গেল অযু থাকলে নতুন অযু করা ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব। যেমন— অন্য এক হাদীসে আছে,

«الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ».

‘অযুর ওপর অযু করা নূর বৃদ্ধিতে সহায়ক।’^২

«مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

‘যে ব্যক্তি অযু থাকাবস্থায় পুনরায় অযু করবে, আলাহ তাআলা তাকে দশটি নেকী দেবেন।’^৩

তবে এক অযুর পর কোন কোন ইবাদত করা জরুরি অন্যথায় তা মাকরুহ হবে।

অযুর বিবরণ

ক. অযুর আভিধানিক অর্থ

وُضُوءٌ শব্দের وَאוُّ বর্ণে হরকতের বিভিন্নতায় বিভিন্ন রকমের অর্থ হয়।

যেমন—

১. وُضُوءٌ শব্দটির وَאוُّ বর্ণে যবর যোগে অর্থ হচ্ছে, পানি।

২. وُضُوءٌ শব্দটির وَאוُّ বর্ণে যের যোগে অর্থ হচ্ছে, পানির পাত্র।

৩. وُضُوءٌ শব্দটির وَאוُّ বর্ণে পোশ যোগে অর্থ হচ্ছে, পাবিত্রতা অর্জন করা।

مُلْتَوًى শব্দটির বাস্তব অর্থ হচ্ছে, اَللُّمْعَانُ বা ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য। তবে

এর সাধারণ অর্থ হলো: اَلْحُسْنُ وَالنِّصَافَةُ (সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা)।

খ. অযুর পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় وُضُوءٌ বলা হয়: اِسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي اَعْضَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ বলা হয়: (নিয়তের সাথে নির্ধারিত কয়েকটি অঙ্গে পানি ব্যবহার করা তথা ব্যবহার করে দেওয়াকে অযু বলা হয়)।

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৩২, হাদীস: ৮৬ (২৭৭)

^২ (ক) আল-গাযালী, *ইয়াহইয়াউ উলুমিদীন*, খ. ১, পৃ. ১৩৫, (খ) আল-ইরাকী, *আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া মিনাল আখবার*, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৬, তিনি বলেন, এই হাদীসটির সূত্রগত ভিত্তির যথার্থতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

^৩ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৬২, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

২. কেউ কেউ বলেন, *وَمَسْحُ رُغْبِ الرَّأْسِ*, *وَالرَّجْلَيْنِ*, *وَالْيَدَيْنِ*, *وَالْوَجْهَ* (মুখগুণ, দু'হাত, দু'পা ও এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা অযু বলা হয়)।^১
৩. *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআর* প্রণেতা বলেন, *هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي* (নির্ধারিত নিয়মে নির্ধারিত অঙ্গসমূহে তথা মুখমণ্ডল ও দু'হাত ইত্যাদিতে পানি ব্যবহার করার নাম অযু)।^২

অযুর ফযীলত

ইসলামী শরীয়তে অযুর অনেক ফযীলত রয়েছে। কেননা অযু ছাড়া কোন ইবাদত সম্পাদন হয় না। বিশেষ করে করে নামায অযু ছাড়া কবুল হয় না। নিম্নে অযুর ফযীলত আলোচনা করা হলো:

১. অযুকারীর গোনাহ মাফ: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত ﷺ, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ‘যখন মুমিন বন্দা অযু করে ও চেহারা ধোয়, তখন তার চেহারা থেকে ঝরে পড়া পানির সাথে তার সকল গোনাহ বের হয়ে যায় এবং যখন হাত ধোয়, তখন তার দু'হাতের গোনাহসমূহ ঝরে যায়। একরূপে যখন সে পা ধোয়, তখন তার দু'পায়ের অর্জিত সকল গোনাহ ঝরে যায় এভাবে অযুকারী গোনাহ থেকে পূর্ণরূপে পাক সাফ হয়ে যায়।’^৩

২. মর্যাদা বৃদ্ধি: অযুর মধ্যে অযুকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

^১ মোত্তাা খসরু, *দুরারুল হক্কাম ফী শরহি গুরারিল আহকাম*, খ. ১, পৃ. ৬

^২ আবদুর রহমান আল-জযীরী, *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআর*, খ. ১, পৃ. ৪৫

^৩ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২১৫, হাদীস: ৩২ (২৪৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আবু হুরায়রা, আল্লাহর রাসুল আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) গোনাহসমূহ মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন’? সাহাবায়ে কেলাম বললেন, নিশ্চয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, ‘কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে অযু করা, নামাযের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা; আর এ কাজগুলোই হল সীমান্ত প্রহরা।’^১

৩. বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে: রাসূলুল্লাহ আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

‘তোমাদের মধ্য থেকে কেউ উত্তমরূপে অযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে কালিমা শাহাদত: আল্লাহ পাঠ করলে তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে ইচ্ছে মতো যেকোন দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।’^২

৪. নূরের অলঙ্কার দেওয়া হবে: রাসূলুল্লাহ আল্লাহ বলেছেন,

«يُبَلِّغُ الْحِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءَ».

‘মুমিন বন্দার হাতে পায় যার যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌঁছবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে পর্যন্ত নূরের অলঙ্কার দিয়ে বিভূষিত করে দেওয়া হবে।’^৩

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২১৯, হাদীস: ৪১ (২৫১)

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭ (২৩৪), হযরত আমির ইবনে ওকাবা আল্লাহ থেকে বর্ণিত

^৩ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ৪০ (২৫০), হযরত আবু হুরায়রা আল্লাহ থেকে বর্ণিত

৫. রোগমুক্তি: আয়ুর অবশিষ্ট পানিতে রয়েছে রোগমুক্তি। হাদীসে এসেছে, ‘অয়ুর অবশিষ্ট পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা উত্তম। এটা অনেক রোগের জন্য শিফা।’

৬. চেহারা উজ্জ্বল হবে: অয়ু করার ফলে চেহারার নূর সৃষ্টি হয়। ফলে কিয়ামতের দিন তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। সহীহ আল-বুখারী শরীফে আছে,

«إِنَّ أَمْتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ».

‘কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, অয়ুর প্রভাবে তাঁদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।’^১

৭. অয়ু নামাযের চাবি: অয়ু হচ্ছে নামাযের চাবি। যেমন- নামায বেহেশতের চাবি। নামায আদায় না করলে যেমন বেহেশতে যাওয়া যাবে না, তেমনি অয়ু আদায় না করলে নামায কবুল হবে না। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ».

‘অয়ু নামাযের চাবি।’^২

৮. মুমিনের চরিত্র সংরক্ষণকারী: অয়ু অবস্থায় মুমিনের চরিত্র সংরক্ষিত থাকে, যেমনি নাপাক অবস্থায় থাকে না। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

«وَلَا يَحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

‘আর মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ অয়ুর প্রতি যত্নবান হয় না।’^৩

অয়ুর হুকুম

অয়ুর হুকুম ২ প্রকার। যথা-

১. ফরয: যে সকল কাজে অবশ্যই অয়ু করতে হবে, অন্যথায় তা কবুল হবে না এবং গোনাহগার হতে হবে।
২. মুস্তাহাব: যে সকল কাজের জন্য অয়ু করা ভালো, তবে না করলে গোনাহগার হবে না।

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১৩৬, হযরত আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত

^২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১০১, হাদীস: ২৭৫, হযরত আলী রা থেকে বর্ণিত

^৩ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১০১, হাদীস: ২৭৭, হযরত সওবান রা থেকে বর্ণিত

অযুর ফরয:

যে সব কাজের জন্য অযু করা ফরয তা হলো:

১. অপবিত্র থাকা অবস্থায় নামাযের জন্য অযু করা ।
২. অপবিত্র থাকাকালীন কুরআন শরীফ স্পর্শ করে তিলাওয়াতের জন্য অযু করা ।
৩. তিলাওয়াতের সেজাদার জন্য ।
৪. শুকরের সাজদার জন্য ।
৫. বায়তুল্লাহ তাওয়াফের জন্য ।

অযুর মুস্তাহাব

যেসব কাজের জন্য অযু করা মুস্তাহাব তা হলো:

১. প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে নামায পড়া ।
২. অযু থাকা অবস্থায় অযু করা ।
৩. ইহরাম বাঁধার পূর্বে অযু করা ।
৪. গোসলের পূর্বে অযু করা ।
৫. মসজিদে প্রবেশের জন্য অযু করা ।
৬. যিকরের জন্য অযু করা ।
৭. দুআর জন্য অযু করা ।

অযুর শর্তাবলি

অযুর শর্তাবলি তিন প্রকার । যথা- ১. ফরয হওয়ার শর্ত, ২. শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ও ৩. আদায় হওয়ার শর্ত ।

১. অযু ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি । যথা-

- ক. বালেগ হওয়া; সুতরাং নাবালেগের ওপর অযু ফরয নয় ।
- খ. মুসলমান হওয়া; সুতরাং অমুসলিমের ওপর অযু ফরয নয় ।
- গ. নামাযের সময় হওয়া; সুতরাং নামাযের পূর্বে অযু ফরয নয় ।
- ঘ. বেঅযু থাকা; সুতরাং অযু থাকা অবস্থায় অযু করা ফরয নয় ।
- ঙ. পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া; সুতরাং অক্ষমের ওপর অযু ফরয নয় ।

২. অযু শুদ্ধ হওয়ার শর্ত তিনটি । যথা-

- ক. পানি পবিত্র হওয়া; সুতরাং অপবিত্র পানি দ্বারা অযু করা শুদ্ধ হবে না ।
- খ. অযুকরীর অঙ্গে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে পতিবন্ধকতা না থাকা ।
- গ. অযুচলাকালীন সময়ে অযুকরী থেকে অযু ভঙ্গের কারণ প্রকাশিত না হওয়া ।

৩. অযু আদায় হওয়ার শর্ত তিনটি । যথা-

- ক. জ্ঞানবান হওয়া; সুতরাং পাগলের ওপর অযু ফরয নয় । আর তার অযু শুদ্ধও নয় ।

- খ. মহিলাদের হায়ি ও নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া। সুতরাং উক্ত মহিলার ওপর অযু ফরয নয় আর তার অযু শুদ্ধও নয়।
- গ. ঘুমন্ত না থাকা; সুতরাং ঘুমে মাতাল ব্যক্তির ওপর অযু ফরয নয় এবং তার অযু শুদ্ধও নয়।

অযুর ফরযসমূহ

অযুর ফরয চারটি। এ প্রসঙ্গে সূরা মায়েরদার ৬ আয়াতে আলাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَسْجُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝

‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তবে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত ধোয়ে নাও। আর তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পদযুগল গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়ে নাও।’^১

এ আয়াতকে آيَةُ الْوُضُوءِ বলা হয়। যা দ্বারা অযুর ফরয চারটি প্রমাণিত হয়। যথা— ১. মুখমণ্ডল ধোয়া, ২. উভয় হাত ধোয়া, ৩. মাথা মাসেহ করা ও ৪. উভয় পা ধোয়া।

নিম্নে ইমামদের মতভেদ উল্লেখপূর্বক সীমাসহ অযুর ফরযগুলো আলোচনা করা হলো:

২. মুখমণ্ডল ধোয়া

১. ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু এবং অধিকাংশ ফকীহের মতে, মুখমণ্ডলের সীমা হচ্ছে, কপালের উপরিভাগে চুলের গোড়া থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত এবং এককানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।
২. ইমাম শামসুল আয়িম্মা আবদুল আযীয আল-হালওয়ানী রহমতুল্লাহু-এর মতে, কানের লতি থেকে আরম্ভ করে যে স্থানে স্বভাবত দাড়ি উঠে থাকে, সে অংশটুকু ধোয়া অপরিহার্য নয়, বরং ভিজিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

২. উভয় হাত ধোয়া

হস্তদ্বয় কি পরিমাণ ধোয়ে নেবে, এক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু-এর মতে, কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া ফরয। আলাহ তাআলা বলেন,

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৫

‘এবং হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত ধোয়ে নাও ।’^১

২. ইমাম যুফার ইবনুল হুযায়ল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কনুই ধোয়া ফরয নয়। তিনি দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করেছেন,

ثُمَّ اتَّيْتُ الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ ۝

‘অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত ।’^২

এখানে যেহেতু রাত রোযার অন্তর্ভুক্ত নয় (কেননা সীমা প্রাপ্তসীমার অন্তর্ভুক্ত হয় না), কাজেই কনুইও হাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩. মাথা মাসেহ করা

মাথা মাসেহের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরো মাথা মাসেহ করা ফরয।
২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে পরিমাণ মাসেহ করলে মাসেহ বলা যায়, সে পরিমাণ মাসেহ করা ফরয।
৩. ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ -এর মতে, মাথার চারভাগের এক ভাগ মাসেহ করা ফরয। হযরত মুগীরা রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত হাদীস:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سَبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتَيْهِ وَخَفَّيْهِ».

‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন এবং পেশাব করলেন তারপর অযু করলেন এবং মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন যা পুরো মাথার এক চতুর্থাংশ ।’^৩

৪. উভয় পা ধোয়া

পা ধোয়ার পরিমাণ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও হযরত সাহিবাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গোড়ালিসহ উভয় পা ধোয়া ফরয।
২. ইমাম যুফার ইবনুল হুযায়ল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গোড়ালি ধোয়া ফরয নয়।

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে **نَوَافِضُ الْوُضُوءِ** (অযু ভঙ্গ)-এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, ৫:৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৭

^৩ (ক) আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী*, খ. ১, পৃ. ১৫, (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৩০, হাদীস: ৮১ (২৭৪)

১. পায়খানা অথবা পত্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া। যথা— পেশাব, পায়খানা, মনি, মযি, অদি, হায়িয ও নিফাসের রক্ত, প্রদরের স্রাব, বাতাস ইত্যাদি।
২. শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত-পুঁজ বা পানি বের হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে পড়া।
৩. মুখভর্তি বমি করা।
৪. সংজ্ঞাহীনতা বা উন্মাদনতার কারণে জ্ঞানহার হওয়া।
৫. রুকু ও সাজদা বিশিষ্ট নামাযে অটুহাসি দেওয়া। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে (নামাযে) অটুহাসি দেয়, সে যেন পুনরায় অযু করে এবং সালাত আদায় করে।
৬. এমন জিনিসের ওপর ভর দিয়ে নিদ্রা যাওয়া, যা সরিয়ে ফেললে নিদ্রিত ব্যক্তি পড়ে যাবে।
৭. পাগল মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া। তাছাড়া পুরুষের লজ্জাস্থান স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের সাথে মিলনের ফলেও অযু নষ্ট হয়ে যায়, বরং গোসল ফরয হয়।

ইসতিনজার বিবরণ

ক. আভিধানিক অর্থ

الْأَسْتِنْجَاءُ শব্দটি বাবে الْأَسْتَنْفَالُ-এর মাসদার। অভিধানে এই শব্দটির অর্থ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন— ১. মুক্তি পাওয়া, ২. পরিত্রাণ কামনা, ৩. শৌচকার্য করা, ৪. পায়খানা-প্রস্রাব করার পর পরিষ্কার হওয়া, ৫. পবিত্রতা অর্জন। এখানে সর্বশেষ অর্থটিই প্রযোজ্য।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসতিনজা বলা হয়,

هُوَ حُضُولُ النَّظَافَةِ بَعْدَ الْبَوْلِ أَوْ الْبَرَّازِ بِالْحَجَرِ وَالزُّرَابِ وَالْمَاءِ.

‘পায়খানা প্রস্রাব করার পর পাথর, মাটি ও পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসতিনজা বলে।’

এককথায় নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের নামই ইসতিনজা।

ইসতিনজার বিধান

পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ইসতিনজা বা পেশাব ও পায়খানার নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। এজন্য কুলুখ ও পানি ব্যবহার করতে হয়। কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নত আর পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কিন্তু ময়লা দূর করা ফরয। তবে পেশাব বা পায়খানা যদি স্থায়ী রাস্তা অতিক্রম করে পার্শ্বে লাগে তবে তা পানি দ্বারা পরিষ্কার করা ফরয।

ইসতিনজার প্রকারভেদ

ইসতিনজা ৬ প্রকার। যথা—

১. ফরয ইসতিনজা: নাপাকি যদি বের হওয়ার স্থান থেকে এক দিরহার পরিমাণে বেশি ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইসতিনজা করা ফরয।
২. ওয়াজিব ইসতিনজা: বের হওয়া স্থানে নাপাকির পরিমাণ এক দিরহাম পরিমাণ হলে ইসতিনজা করা ওয়াজিব।
৩. সুন্নত ইসতিনজা: নাপাকির পরিমাণ এক দিরহামেরও কম হলে ইসতিনজা করা সুন্নত।
৪. মুস্তাহাব ইসতিনজা: নাপাকি বের হওয়ার স্থান অতিক্রম না করলে ইসতিনজা করা মুস্তাহাব।
৫. মাকরুহ ইসতিনজা: ওযর ছাড়া ডান হাতে ইসতিনজা করলে মাকরুহ হবে।
৬. বিদআত ইসতিনজা: নাপাকি বের হওয়ার স্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও ইসতিনজা করা বিদআত।

কোন কোন বস্তু দ্বারা ইসতিনজা জায়য

মাটি, ইট, পাথর বা অনুরূপ পবিত্র জিনিস দ্বারা ইসতিনজা করা উত্তম। আর যদি নাপাকি বের হয়ে নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে গড়িয়ে যায়, তবে পানি দ্বারা না ধোয়ে নিলে পবিত্র হবে না।

যেসব বস্তু দ্বারা ইসতিনজা জায়য নয়

যে সব বস্তু দ্বারা ইসতিনজা জায়য নয় তা হলো: গাছের পাতা, কাগজ, খাদ্যদ্রব্য, কয়লা, গোবর, হাড়, ডান হাত ইত্যাদি। যেমন— হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ.

‘হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সঃ গোবর ও হাড় দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন।’

ইসতিনজা করার পদ্ধতি

নিম্নোক্ত নিয়মগুলো পালনের মাধ্যমে ইসতিনজা সম্পন্ন করবে। যথা—

১. ইসতিনজার জন্য পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে এই দুআ পড়া সুন্নত:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ، وَالْخَبَائِثِ».

‘হে আল্লাহ! আমি কদাচারী ও নাপাক শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি।’

^১ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮৮, হাদীস: ১৫২

২. বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়া সুন্নত:

«غُفْرَانُكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ».

‘হে আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ যিনি আমার মধ্যে হতে অশুভ এবং নাপাক বস্তু দূরীভূত করে আমাকে শান্তি দান করেছেন।’^২

৩. প্রবেশকালে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হওয়া।

৪. কাপড় বা অন্যকিছু দিয়ে মাথা ঢেকে নেওয়া।

৫. বেজোড় সংখ্যক তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি টিলা ব্যবহার করা।

৬. শীতকালে প্রথম টিলা পেছন থেকে সামনে, দ্বিতীয়টি সামনে থেকে পেছনে তৃতীয়টি পেছন থেকে সামনে নিতে হবে এবং গ্রীষ্মকালে এর বিপরীত গ্রহণ করবে।

নামাযের জন্য শরীর ছাড়া আরও যা পবিত্র রাখতে হয়

নামাযের জন্য শরীর ছাড়া আরও যা যা পরিষ্কার করা ফরয তা নিম্নরূপ:

১. পোশাক পবিত্র রাখা: পোশাকের পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

‘আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।’^৩

সুতরাং যদি কাপড় নাপাক থাকে, তাহলে উক্ত কাপড় পরা অবস্থায় নামায পড়া জাযিয নয়।

২. স্থান পবিত্র রাখা: নামাযের স্থান পবিত্র রাখাও ফরয। যেমন— একজন বেদঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করলে মহানবী ﷺ এক বালতি পানি দিয়ে তা ধোয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

^১ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ১১৪, হাদীস: ২৯৯০২

^২ আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৯, পৃ. ৩৫, হাদীস: ৯৮২৪ ও ৯৮২৫

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুদদাস্‌সির*, ৭৪:৪

সালাত আদায়ের ওয়াক্ত এবং সময়মতো সালাত আদায়

ওয়াক্ত মতো নামায আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন। কেননা সকল ইবাদতের মতো এরও একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সময়মতো নামায আদায় না করে সময় পার করে নামায আদায় করলে গোনাহগার হতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿٢٦﴾

‘আর দিনের দু’প্রান্তে নামায প্রতিষ্ঠা করুন এবং রাতের একাংশে, অবশ্যই পূণ্যকাজ পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখো তাদের জন্য এটা উপদেশবাণী।’^১

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٢٧﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْبُودًا ﴿٢٨﴾

‘সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা করুন এবং ফজরের নামাযে কুরআন পড়ুন। অবশ্যই ফজরে কুরআন পড়ার সময় ফেরেশতাগণ হাজির থাকে। রাতের কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য একটি অতিরিক্ত বিষয়। হয়তো আপনার প্রতি পালক আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।’^২

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُّبُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿٣٠﴾

‘সুতরাং তোমরা আলাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা কর যখন তোমাদের সন্ধ্যা ও সকাল হয়। সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা।’^৩

মূল আলোচনা

নামায ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যথাক্রমে নামায সম্পন্ন করা আলাহ তাআলার আদেশ ও মুমিনের দায়িত্ব। আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফরয ও নফল নামাযের সময় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলো:

^১ আল-কুরআন, সূরা হুদ, ১১:১১৪

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৮-৭৯

^৩ আল-কুরআন, সূরা আর-রুম, ৩০:১৭-১৮

২. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাহমতুল্লাহি বলেন, অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূল আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আসরের নামাযের ইকামত দেওয়া হলো। নামায থেকে ফারেগ হলে হযরত জিবরাঈল আলয়হিস সালাম এই আয়াত নিয়ে আসলেন। নবী করীম আল্লাহ আমাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি কি আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর নবী করীম আল্লাহ বললেন, ‘যাও তুমি যা করেছ নামায তার জন্য কাফফারা হয়ে গেছে।’^১
৩. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাহমতুল্লাহি বলেন, আমি রাসূল আল্লাহ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এ অবস্থায় এক লোক রাসূল আল্লাহ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আলাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি গায়রে মুহাররম দ্বারা আক্রান্ত হলে তার হুকুম কি হবে? যদিও তার সাথে সহবাস হয়নি? রাসূল আল্লাহ বললেন, ‘তুমি অযু কর এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।’ তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইল।^২
৪. হযরত আবু সালেহ রাহমতুল্লাহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহমতুল্লাহি থেকে বর্ণিত করেন, আয়াতটি আমার ইবনে গাযযিয়া আল-আনসারী রাহমতুল্লাহি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি খেজুর বিক্রি করতেন। একদিন এক মহিলা খেজুর

= عَنْ أَبِي الْيَسْرِ، قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَةً تَبْتَاعُ تَمْرًا، فَقُلْتُ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ، فَدَخَلْتُ مَعِيَ فِي الْبَيْتِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا نَفْثًا لَهَا، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: اسْأُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَا تُخْزِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اسْأُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَا تُخْزِرْ أَحَدًا، فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَخْلَفْتَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا حَتَّى تَمَيُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلَّا تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: وَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَوِيلًا حَتَّى أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ٢٢٥]. قَالَ أَبُو الْيَسْرِ: فَأَتَيْتُهُ فَفَرَّأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْهَذَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ».

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৯, পৃ. ১১১-১১২:

وَقَدْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغْرَضَ عَنْهُ، وَأَقْبَمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا قَرَعَ مِنْهَا نَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ عَلَيْهِ بِالْأَيَّةِ، فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «أَشْهَدُ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟» قَالَ نَعَمْ، قَالَ: «أَذْهَبَ فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا فَعَلْتَ».

^২ আত-তিরমিযী, *আল-জামি উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২৯১, হাদীস: ৩১১৩:

عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ إِلَى امْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ٢٢٥]. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ.

ক্রয় করতে আসলে তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাড়িতে ভালো খেজুর আছে বলে বাড়িতে যাওয়ার প্রলোভন দেখায়। তখন উক্ত ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله বলেন, এখানে নামাযের দ্বারা ফরয নামাযকেই বোঝানো হয়েছে। আর ইকামতের সালাত বলে পূর্ণ পাবন্দির সাথে নিয়মিত নামায আদায় করাকে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো আলেমের মতে, নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো কারো মতে, এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া।^১

শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে নামাযকে সঠিক সময়ে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করার আদেশ করা হয়েছে। কারণ নামাযের নির্দিষ্ট সময় হেলায় কাটিয়ে অন্যসময়ে নামায পড়া মুনাফিকের আলামত। আর সময়মতো নামায পড়াই ফরয। যেমন— আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝

‘নিশ্চয় মুমিনদের ওপর নামায নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে।’^২

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী رحمته الله বলেন,

أَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا.

‘নামাযের রুকু ও সাজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় কর।’^৩

আলামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী رحمته الله বলেন, ‘ফরয পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর।’^৪

নামায কায়েমের নির্দেশদানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দিনের দু’প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষ প্রান্তে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।

ক. طَرَفِي النَّهَارِ ۝ (দিবসের দু’প্রান্ত)

الطَّرْفُ الْأَوَّلُ (প্রথম প্রান্ত): ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী رحمته الله বলেন, الطَّرْفُ الْأَوَّلُ বা প্রথম প্রান্ত প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা—

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৯, পৃ. ১০৯

^২ আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ২:১০৩

^৩ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ৪০৬

^৪ আস-সাবুনী, *সাফওয়াতুত তাফসীর*, পৃ. ৩১

১. অধিকাংশের মতে, এর দ্বারা ফযরের নামাযের উদ্দেশ্য ।

২. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী رحمہ اللہ বলেন, এর দ্বারা যুহর নামাযের উদ্দেশ্য ।^১

الطَّرْفُ الثَّانِي (দ্বিতীয় প্রান্ত): ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী رحمہ اللہ বলেন, এ প্রসঙ্গে তিনটি উক্তি পওয়া যায় । যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضی اللہ عنہما-এর মতে তা মাগরিবের নামায । কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া শুরু হয় ।

২. ইমাম হাসান আল-বাসারী رحمہ اللہ-এর মতে, সেটি আসরের নামায কেননা এটিই দিনের সর্বশেষ নামায । মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশে নয়, বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয় ।

৩. আল্লামা আবু মুহাম্মদ ইবনে আতিয়া আল-উন্দুলুসী رحمہ اللہ-এর মতে, শেষ প্রান্তের নামায দ্বারা যুহর ও আসর উভয় নামাযকে বোঝানো হয়েছে ।^২

খ. وَرُفْعًا مِّنَ الْيَلِّ (রাতের কিছু অংশ)

رُفْعًا শব্দটি رُفْعًا-এর বহুবচন অর্থ: অংশ । অতএব وَرُفْعًا مِّنَ الْيَلِّ-এর

অর্থ: রাতের কিছু অংশ । এ সময়ের নামাযের মতে, ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী رحمہ اللہ দুটি অভিমত বর্ণনা করেন । যথা—

১. অধিকাংশ তফসীরকারকের অভিমত হলো, তা صَلَاةُ الْغَرْبِ وَالْعِشَاءِ (মাগরিব ও ইশার নামায) ।

২. আলামা আবুল হাসান আল-আখফাশ رحمہ اللہ বলেন, রাতে যেকোন নামাযের উদ্দেশ্য, চাই ফরয হোক কিংবা নফল ।^৩

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশদানের সাথে সাথে তার উপকারীতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ (পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপকাজকে মিটিয়ে দেয়) ।

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী رحمہ اللہ বলেন, আয়াতে الْحَسَنَاتِ ۖ-এর ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় । যথা—

^১ (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৯, পৃ. ১০৯, (খ) ইবনুল জওযী, *তায়কিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গরীব*, পৃ. ১৬৮

^২ (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৯, পৃ. ১০৯, (খ) ইবনুল জওযী, *তায়কিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গরীব*, পৃ. ১৬৮, (গ) ইবনে আতিয়া, *আল-মুহাব্বারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাব আল-আযীয*, খ. ৩, পৃ. ২১২

^৩ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ৪০৬

১. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, এখানে পূণ্যকাজ বলতে অধিকাংশের মতে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযকে বোঝানো হয়েছে।
২. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, যিক্রসহ যাবতীয় ইবাদত বোঝানোই উদ্দেশ্য। তবে নামায এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য।^১

অনুরূপভাবে السَّيِّئَاتِ দ্বারা পাপ কার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে।^২ কিন্তু আল-কুরআনের অন্য এক আয়াত এবং হাদীসের দ্বারা বোঝা যায়, এখানে পাপকার্য বলে সগীরা গোনাহ বোঝানো হয়েছে। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, নেক কাজ সগীরা গোনাহ মিটিয়ে দেয়, তবে তার জন্য কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা শর্ত। যেমন- ইরশাদ হয়েছে,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۖ

‘যদি তোমরা কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাক, যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপ মিটিয়ে দেব।’

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসের আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যদি ব্যক্তি কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে।’^৩

অর্থাৎ কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মফ হয় না; কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক কাজ দ্বারা মফ হয়ে যায়। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

^১ (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৯, পৃ. ১১০, (খ) ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ৪০৬

^২ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ৪০৭

^৩ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৬ (২৩৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযিমালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘কবীরা গোনাহ হতে বেঁচে থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ মিটিয়ে দেয়।’^১

হাদীস শরীফে আরও আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ রাযিমালাহু আনহু، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَّانَا وَآخِثَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيَّانَا وَآخِثَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযিমালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় ও ঈমানের সাথে রোযা রাখবে, তার পেছনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ও ঈমানের সাথে নামায আদায় করবে, তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’^২

তবে আল-বাহরুল মুহিত তাফসীর গ্রন্থে মুহাক্কিক উসূলবিদদের অভিমত উল্লেখ করে বলা হয়েছে, নেক কাজ দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। মোটকথা আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন— হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ».

‘হযরত আবু যর আল-গিফারী রাযিমালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, ‘তুমি যেখানে থেক আল্লাহকে ভয় কর, তোমার থেকে কোন মন্দ কাজ হলে সাথে সাথে পূণ্য কাজ কর। তাহলে

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৪ (২৩৩)

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৫, হাদীস: ২০১৪

তা মন্দ কাজকে তা নিচিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।”^১

আলাহ তাআলা বলেন, **ذَلِكَ ذِكْرُى لِلَّذِينَ** (এটি উপদেশ গ্রহনকারীদের জন্য উপদেশ)। সুতরাং আলাহর এ উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। আয়াতে **ذَلِكَ** দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ প্রসঙ্গে ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী মোহাম্মাদ আল্লায়াহি বলেন, এ সম্পর্কে তিন ধরণের বক্তব্য রয়েছে। যথা—

১. কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্য।
২. কেউ বলেন, এটা দ্বারা নামায প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।
৩. কেউ বলেন, এটা দ্বারা পূর্ববর্তী সকল উপদেশ বোঝানো হয়েছে।^২

ذِكْرُى-এর দুটি অর্থ হতে পারে। যথা—

১. **التَّوْبَةُ** (অনুশোচনা),
২. **الْعِظَةُ** (উপদেশ)।^৩

আলাহ তাআলা বলেন, **اقْرَأِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى الشَّهِسِ** (তোমরা সূর্য ঢলে পড়া থেকে নামায প্রতিষ্ঠা কর)। আয়াতের মধ্যস্থিত **لَمْ** দু’অর্থে ব্যবহার হতে পারে। যথা—

১. এটা **فِي** (মধ্যে) অর্থে ব্যবহার হতে পারে।
২. অথবা তাগিদস্বরূপ ব্যবহার হতে পারে।

আর **لِذِكْرِى** শব্দের মূল অর্থ: **مِثْلٌ** বা ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। **لِذِكْرِى**-এর অন্য অর্থ: **عُرُوبٌ** (সূর্যাস্ত হওয়া)। কেননা সূর্যাস্তের সময়ই তা পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ে। তাই **لِذِكْرِى** শব্দের উদ্দেশ্য দুটি। যথা—

১. এটা দ্বারা দ্বিপ্রহরের সূর্য ঢলে পড়া বোঝানো হয়েছে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَوْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ شَاءَ مِنْ

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৫, পৃ. ২৮৪-২৮৫, হাদীস: ২১৩৫৪ ও পৃ. ৩১৮, হাদীস: ২১৪০৩, (খ) আবু হাইয়ান আল-উনদলুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফী তাফসীর*, খ. ৮, পৃ. ৩১৪

^২ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ৪০৭

^৩ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ৪০৭

أَصْحَابِهِ، فَطَعَمُوا عِنْدِي، ثُمَّ خَرَجُوا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَخَرَجَ
النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «اُخْرُجْ يَا أَبَا بَكْرٍ قَدْ دَلَكْتَ الشَّمْسُ».

‘হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ^{রাযী} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবাকে খাবারের দাওয়াত দেই। তাঁরা আমার নিমন্ত্রণে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন সূর্য ঝুঁকে যাচ্ছিল তখনে বেরিয়ে যান। সে সময় নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বেরলেন এবং বললেন, ‘হে আবু বকর! সূর্য ঢলে পড়ছে।’”

হযরত ইবনে ওমর ^{রাযী} ও আবু হুরাইরা ^{রাযী}, ইমাম হাসান আল-বাসারী ^{রাযী} ও ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর ^{রাযী}-সহ অধিকাংশই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ^{রাযী} ও ইমাম ইবরাহীম আন-নাখায়ী ^{রাযী}-এর মতে, এটা দ্বারা সূর্যাস্ত যাওয়ার উদ্দেশ্য। কেননা আরবরা এভাবেই ব্যবহার করে থাকেন।^১

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী ^{রাযী} বলেন, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এ স্থলে ^{عِنْدِي} শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই গ্রহণ করেছেন।^২

অধিকাংশ তফসীরকারকের মতে, এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ।

^{عِنْدِي} অর্থ: রাতের অন্ধকার সম্পূর্ণ হওয়া। আয়াতে ^{عِنْدِي} দ্বারা কোন কোন নামাযকে বোঝানো হয়েছে, এ নিয়ে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা—

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ^{রাযী} বলেন, ইশার নামায।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ^{রাযী} বলেন, মাগরিবের নামায।

৫. ইমাম হাসান আল-বাসারী ^{রাযী} বলেন, মাগরিব ও ইশার নামায।^৪

এ আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর তা হলো: যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এর মধ্যে দু’রাকাতাতের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে। যুহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে শুরু হয় এবং

^১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়ীলি কুরআন*, খ. ১৫, পৃ. ৩০

^২ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ৩, পৃ. ৪৫-৪৬

^৩ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১০, পৃ. ৩০৩

^৪ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ৩, পৃ. ৪৬

ইশার সময় عَشِيَ الْيَوْمُ^১ তথা অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে শুরু হয়। এ কারণেই ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি সেই সময়কে ইশার ওয়াক্ত শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যের রক্তিম আভার পর সাদা আভাও অন্তিমিত হয়।

এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পরই পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম আভা দেখা যায়। এর পর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। তারপর এই সাদা আভাও অন্তিমিত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য দিগন্তের সাদা আভা অন্তিমিত হয়ে গেলেই রাতের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এ আয়াতে এ শব্দের মাধ্যে ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি এ মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা বলেন, এখানে قُرْآن^২ দ্বারা নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর রহমতুল্লাহি ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রহমতুল্লাহি কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী আল-মায়হারী রহমতুল্লাহি সহ অধিকাংশ তাফসীরবিদই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কাজেই এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: لِيُؤْمِنُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ^৩ বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং الشَّيْءِ إِلَى عَشِيِّ الْيَوْمِ^৪ নামায ফজরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করার বর্ণনার মধ্যে এ নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের কথা ইঙ্গিত রয়েছে।

شَهَادَةُ শব্দ থেকে مَشْهُودٌ-এর উৎপত্তি। এর অর্থ: উপস্থিত হওয়া। সহীহ হাদীসমূহের বর্ণনানুযায়ী ফজরের সময়ে দিবারাত্রির উভয় হযরত আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত, মহান আলাহর বাণী: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا^৫-এর ব্যাখ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ».

‘এ সময় দিন ও রাতের ফেরেশতারা উপস্থিত হয়।’^৬

হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা

নিম্নে ইমামদের মতভেদসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা বর্ণনা করা হলো:

১. ফজরের নামাযের সময়সীমা: ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে ফজরের সালাতের সময় সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী:

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৩০২, হাদীস: ৩১৩৫

«وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ».

‘আর ফজরের নামাযের সময় শুরু হয় ফজর বা উষার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত।’^১

হাদীস শরীফে আরও আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، ... وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘নামাযের একটি প্রথম ও শেষ সময় রয়েছে। ফজরের নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে যখন উষা উদিত হয় আর শেষ সময় হচ্ছে যখন সূর্যোদয় হয়।’^২

তবে ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাযীয়াতুহু আনহু ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাযীয়াতুহু আনহু-এর মতে, إِسْفَارٌ পর্যন্ত ফজর নামাযের শেষ সীমা; সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়।

২. যুহরের নামাযের সময়সীমা: সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে গেলে যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। যেমন- আলহ তাআলার বাণী:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ ۖ

‘সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা করুন।’^৩

তবে যুহরের শেষ সময় সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।
যেমন-

ক. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাযীয়াতুহু আনহু ও ইমাম সাহেবাইন রাযীয়াতুহু আনহু বলেন, প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত বাকী ছায়া তার সমান হলে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী:

«وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَّلِهِ».

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪২৭, হাদীস: ১৭৩ (৬১২), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত

^২ আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ১, পৃ. ২৮৩-২৮৪, হাদীস: ১৫১

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৭৮

‘যুহরের নামাযের সময় শুরু হয় যখন সূর্য (মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে) হেলে পড়ে এবং মানুষের ছায়া তা দৈর্ঘ্যে সমান হয়।’^১

- খ. ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতে, যেকোন বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত অবশিষ্ট ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত থাকে। তার দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস:

«فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ».

‘অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার তার সমান হয় তখন যুহরের নামায পড়েন।’^২

অন্য স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

‘হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যুহরের নামায গরম কমলে আদায় কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।’^৩

একথা সুবিদিত যে, কোন কিছুর ছায়া দ্বিগুণ হলেই ঠাণ্ডার সময় প্রবেশ করে।^৪

৩. আসরের নামাযের সময়সীমা: উল্লিখিত মতানুসারে যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে আসর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। তবে শেষ সময় সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। যেমন—

- ক. ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম আবু সওর রহমতুল্লাহু আলাইহ প্রমুখের মতে, সূর্যের রঙ হলুদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত বাকী থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «... وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنْ آخَرَ وَقْتُهَا حِينَ تَصْفُرُ الشَّمْسُ».

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪২৭, হাদীস: ১৭৩ (৬১২), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২২, পৃ. ৪০৯, হাদীস: ১৪৫৩৮, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^৩ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১১৩, হাদীস: ৫৩৮

^৪ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ শারায়ি*, খ. ১, পৃ. ১২৩

‘হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘... আসরের নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে যখন আসরের সময় শুরু হয় আর শেষ সময় হচ্ছে যখন সূর্য হলুদ রঙ ধারণ করে।’^১

খ. ইমামে আযম আবু হানিফা রাঃ ও মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ রাঃ সহ জমহুর ওলামার মতে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত বাকি থাকে। যেমন- মহানবী সঃ-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «... وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘... আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের নামাযের এক রাকাত আত পেল সে আসরের সালাত পেল।’^২

৪. মাগরিবের নামাযের সময়সীমা: সূর্যাস্ত হলেই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। আর শেষ সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমামে আযম আবু হানিফা রাঃ-এর মতে, شَفَقُ বা পশ্চিমাকাশের ললিমা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময়সীমা অবশিষ্ট থাকে। হাদীসে এসেছে,

«وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ».

‘শফ় বা ললীমা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময়।’^৩

অন্য হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ ، وَآخِرُهُ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ».

‘নিশ্চয়ই মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্যাস্ত হয় এবং শেষ সময় হচ্ছে যখন ললীমা দূরীভূত হয়।’^৩

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ১, পৃ. ২৮৩-২৮৪, হাদীস: ১৫১

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১২০, হাদীস: ৫৭৯

^৩ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪২৭, হাদীস: ১৭৩ (৬১২), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত

খ. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফি'রী رحمہ اللہ-এর মতে, সূর্যাস্তের পর আযান, অযু এবং পাঁচ রাকাআত নামায নামায পড়তে যত সময় লাগে, সে সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বাকি থাকে।

শফকের পরিচয়

الشَّفَقُ সংজ্ঞা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান। যেমন—

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رحمہ اللہ বলেন, পশ্চিমাকাশে লাল রেখার পর যে সাদা রেখা দেখা যায়, তা-ই شَفَقُ।
২. ইমাম সাহিবাইন رحمہ اللہ বলেন, সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে ললীমা দেখা যায়, তাকেই شَفَقُ বলে।

এখানে ইমাম সাহিবাইন رحمہ اللہ-এর মতের ওপরেই ফতাওয়া দেওয়া হয়েছে।

৫. ইশার নামাযের সময়সীমা: ইশার নামাযের সময় শَفَقُ বিদূরিত হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় অবশিষ্ট থাকে। হাদীসে এসেছে,

«وَأَخْرُ وَقْتُ الْعِشَاءِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ».

‘ইশার নামাযের শেষ সময় হচ্ছে যখন ফজর (উষা) উদিত হয়।’^১

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

«وَأَوَّلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَآخِرُهُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ».

‘ইশার নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে যখন ললীমা দূরীভূত হয় এবং ইশার শেষ সময় হচ্ছে যখন ফজর (উষা) উদিত হয়।’^২

অবশ্য মধ্যরাতের পর ইশার নামায পড়া মাকরুহ, তবে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنِ اشْتُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».

^১ আস-সারাখসী, আল-মবসূত, খ. ১, পৃ. ১৪৪, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^২ আস-সারাখসী, আল-মবসূত, খ. ১, পৃ. ১৪৫, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^৩ আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ শারায়ি, খ. ১, পৃ. ১২৪, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সালাতুহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যদি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না করতাম, তবে অবশ্যই ইশার নামায আমি রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতাম।’^১

বিতরের নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়াও তিন রাকাতাত বিতরের নামায পড়া ওয়াজিব। যেমন— হাদীস শরীফে আছে,

«إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوُتْرُ، فَصَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ».

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি নামায অতিরিক্ত দিয়েছেন, তা হলো বিতরের নামায। সুতরাং ইশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে তা আদায় করে নাও।’^২

জুমার নামায

জুমা ও যুহরের নামাযের সময় একই। সুতরাং সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে জুমার নামায পড়া যাবে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সালাতুহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে ওমায়র রাযীয়াতুহু আলাইহ-কে চিঠি লিখেন যে,

«إِذَا مَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ».

‘যখন সূর্য ঢলে যায়, তুমি মানুষকে নিয়ে জুমার নামায আদায় কর।’^৩

সুন্নত ও নফল নামাযের সময়

সারাদিন বার রাকাতাত নামায সুন্নতে মুআক্কাদার নামায এবং কিছু নির্দিষ্ট নফল নামায আছে, যার সময় নির্ধারিত। অন্যথায় হারাম ও মাকরুহ সময় ছাড়া দিনে রাতে যে কোন সময় নফল নামায পড়া যায়।

সুন্নতে মুআক্কাদা

১. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে বার রাকাতাত সুন্নতে মুআক্কাদা। দু’রাকাতাত যুহরের ফরযের পূর্বে এবং দু’রাকাতাত তার পরে, মাগরিবের ফরযের পর

^১ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৬, হাদীস: ৬৯১

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৯, পৃ. ২৭১, হাদীস: ২৩৮৫১, হযরত আমার ইবনুল আস রাযীয়াতুহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^৩ আস-সারাখসী, *আল-মবসূত*, খ. ২, পৃ. ২৪

দু'রাকাআত এবং ইশার ফরযের পর দু'রাকাআত । এ বারো রাকাআত নামাযের সময় নির্ধারিত । যেমন- হাদীসে আছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».

‘হযরত আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি দিনে রাতে কমপক্ষে বারো রাকাআত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর বানাবেন যুহরের পূর্বের চার রাকাআত এবং পরে দু'রাকাআত, মাগরিবের পর দু'রাকাআত, ইশার পর দু'রাকাআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকাআত ।’^১

২. জুমার দিনে ফরজের পূর্বে চার রাকাআত এবং পরে ছয় (৪+২=৬) রাকাআত সুন্নতে মুআক্কাদা নামায আছে । যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে,
- «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ জুমার আগে চার রাকাআত এবং পরে চার রাকাআত নামায পড়তেন ।’^২

ইমাম আবু ইসহাক রাঃ বলেন, হযরত আলী রাঃ জুমার পরে ছয় রাকাআত নামায পড়তেন । হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً».

‘হযরত আলী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সঃ জুমার আগে চার রাকাআত আর পরে চার রাকাআত নামায পড়তেন এবং শেষের রাকাআতে সালাম ফিরাতেন ।’^৩

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ২৭৩, হাদীস: ৪১৪

^২ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৯, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৯৫৫৫

অবশ্য নবী করীম ﷺ হতে জুমার পরে ২ রাকাআত নামাযের হাদীসও বর্ণিত আছে। তবে সে দু'রাকাআত তিনি ঘরে পড়তেন। আর বদাল জুমা সম্পর্কে হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের কেউ জুমার পর নামায পড়তে চাইলে যে যেন চার রাকাআত পড়ে।’^২

এ জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াল্লাহু আনহুমা জুমার পর মসজিদে চার রাকাআত এবং ঘরে ফিরে আর দুই রাকাআত মোট ছয় রাকাআত নামায আদায় করতেন।

অনেকে বলে থাকেন, কাবলাল জুমা নামের কোন নামায নেই। প্রকৃতপক্ষে তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা জুমা যুহরের স্থলাভিষিক্ত। তাই যুহরের ন্যায় এর পূর্বে ও পরে সুন্নত থাকা বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া সহীহ আল-বুখারী শরীফের জুমুয়া অধ্যায় جُمُعَةٌ وَقَبْلُهَا একটি শিরোনাম এনেছে। যা প্রমাণ করে তার মতে কাবলাল জুমা নামায আছে। সন্দেহকারীদের সন্দেহ অপনোদনের জন্য কাবলাল জুমা সম্পর্কে আরও কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يُفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াল্লাহু আনহুমা জুমার পূর্বে এক সালামে চার রাকাআত নামায পড়তেন।’^৩

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

‘হযরত আবু আবদুর রহমান সুলামী রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে জুমার পূর্বে চার রাকাআত নামায

^১ আত-তাবারানী, *আল-মু'জাযুল আওসাত*, খ. ২, পৃ. ১৭২, হাদীস: ১৬১৭

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬০০, হাদীস: ৬৯ (৮৮১)

^৩ আত-তাহাওয়া, *শরহ মা'আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ১৯৬৫

পড়ার জন্য আদেশ করতেন।”^১

সুন্নতে মুআক্কাদা না হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিহু আনহু কখনো কাবলাল জুমার নির্দেশ দিতেন না।

সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা

সুন্নতে মুআক্কাদার বারো রাকাআত ব্যতীত আর কিছু নামায রয়েছে, যা সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। কিন্তু তার জন্য নির্ধারিত সময় আছে। যেমন—

১. আসরের আগে চার রাকাআত নামায: আসরের আগে চার রাকাআত নামায সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। যেমন— হাদীসে আছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ».

‘হযরত উম্মে সালামা রাযিহা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আসরের আগে চার রাকাআত নামায পড়বে, আল্লাহ তার দেহ জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।’^২

২. আওয়াবীনের নামায: মাগরিবের ফরয ও সুন্নতের পর ছয় রাকাআত নামায রয়েছে, যাকে সালাতুল আওয়াবীন বলে। যেমন—

«مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَابِينَ».

‘যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত নামায পড়বে কিয়ামতের দিন তাকে আওয়াবীনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।’^৩

অন্যএক হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسَوْءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযিহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি মাগরিবের পর দুনিয়াবী কোন কথাবার্তা না বলে ছয় রাকাআত নামায পড়বে, তাকে বারো বছর নফল ইবাদতের সমান সওয়াব দেওয়া হবে।’^৪

^১ আবদুর রাযযাক আস-সান‘আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ৫৫২৫

^২ আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল কবীর*, খ. ২৩, পৃ. ২৮১, হাদীস: ৬১১

^৩ আস-সারাখসী, *আল-মবসুত*, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিহু আনহু থেকে বর্ণিত

^৪ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩৬৯, হাদীস: ১১৬৭

৩. ইশারাকের দু'রাকাআত নামায: ইশরাক নামায সূর্যোদয়ের কমপক্ষে ২৩ মিনিট পর পড়তে হয়। যেমন- হাদীসে আছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَامَّةٌ ثَامَّةٌ ثَامَّةٌ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে ফজরের নামায পড়ে স্বীয় জায়গায় বসে যিকর করে, অতঃপর ভালোভাবে সূর্যোদয় হলে দু'রাকাআত নামায পড়ে তার পূর্ণ একটি হজ ও একটি ওমরার সওয়াব দান করা হবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল সঃ বলেন, ‘পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।’^১

৪. চাশতের নামায: পূর্বাহ্নে তথা সূর্যের আলো একটু তেজদীপ্ত হলে ৪ বা ৮ রাকাআত নামায রয়েছে। একে চাশতের নামায বলে। যেমন- হযরত উম্মে হানী রাঃ বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي يَتْبَهِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ».

‘আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সঃ-এর নিকট এসে দেখতে লাগলাম, তিনি গোসল করলেন, অতঃপর চাশতের সময় আট রাকাআত নামায পড়লেন।’^২

৫. তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নামায: তাহাজ্জুদের নামায রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়। এ ছাড়া জুমার আগে ও পরে সুন্নত নামায আছে। তা ছাড়া যেসব নামায আছে তার কোন নির্ধারিত সময় নেই। মাকরুহ সময় ছাড়া যেকোন নফল নামায পড়া যায়।

দু'ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়ার হুকুম

প্রত্যেক নামাযের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যেসময় রয়েছে, সে সময়ই তা আদায় করা ফরয। যেমন- কুরআনে উল্লেখ আছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿٢٠﴾

‘নিশ্চয় নামায মুমিনদের ওপর নির্ধারিত সময়ে (আদায় করা) ফরয করা

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪৮১, হাদীস: ৫৮৬

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১১০৩

হয়েছে।^১

তাই এক নামাযকে অন্য নামাযের সময়ে আদায় করা জাযিয় নয়। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَقَدْ أَتَىٰ أَبَا مَنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি বিনা ওয়রে দু’ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তে আদায় করবে, সে কবীরা গোনাহ করল।’^২

পবিত্র-কুরআনে মুনাফিকদের নামাযের বর্ণনায় বলা হয়েছে,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

‘সেসব নামাযীর জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামায থেকে গাফেল।’^৩

এখানে ‘নামায থেকে গাফেল’-এর ব্যাখ্যায় হযরত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন, নামাযকে স্থায় সময় থেকে সরিয়ে অন্য সময় পড়াই হলো নামায থেকে গাফেল থাকা।^৪

তবে হজের সময় আরাফা ও মুযদালিফা দু’ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া সুন্নত। অর্থাৎ আরাফায় যুহরের নামাযের শেষ ওয়াক্তে যুহর ও আসর নামায এক আযান ও দুই ইকামতে একই সময়ে পড়া এবং মুযদালিফাতে ইশার সময় মাগরিব ও ইশার নামায পূর্বোক্ত নিয়মে একই সময়ে পড়া সুন্নত।

এ ছাড়া আর কখনোই দু’ওয়াক্ত নামায এক ওয়াক্তে পড়া জাযিয় নয়। তবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সফর ও অসুস্থাবস্থায় যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়ার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা মূলত এক ওয়াক্তে নয়; বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযকে যুহরের শেষ ওয়াক্তে আর আসরের নামাযকে আসরের প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। তদ্রূপ মাগরিবের নামাযকে মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে আর ইশার নামাযকে ইশার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন। বাহ্যত একসাথে পড়েছেন বলে মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময়েই পড়া হয়েছিল। একে **الْجَمْعُ الصُّوْرِيُّ** (বাহ্যিক একত্রিকরণ) বলে। সফর

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১০৩

^২ আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ১৮৮

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মাউন, ১০৭:৪-৫

^৪ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন*, খ. ২৪, পৃ. ৬৬০

বা অসুস্থতার ওয়রে এরূপ করা বৈধ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া **الْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ** (প্রকৃত একবিত্রকরণ) জাযিয় নেই।

রাসূলে আকরম ﷺ যে, প্রয়োজনে **الْجَمْعُ الصُّورِيُّ** করতেন **الْجَمْعُ** করতেন না, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ لِّغَيْرِ مِيقَاتِهَا».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনও এক ওয়াক্তের নামায অন্য ওয়াক্তে পড়তে দেখিনি। তবে তিনি মুযদালিফায় দু’নামায একত্রে পড়েছেন এবং সেদিন ফজরের নামায নির্ধারিত সময় ছাড়া পড়েছেন।’^১

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ রাযীয়াল্লাহু আনহুমা حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتُصْرِخَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، فَرَأَحَ مُسْرِعًا، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَتَوَدَّيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْزِلْ، حَتَّى إِذَا أَمْسَى، فَظَنْنَا أَنَّهُ قَدْ نَبِيَّ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ، فَسَكَتَ، حَتَّى إِذَا كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ، نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ: «هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بَنَّا السَّيْرُ».

‘হযরত নাফে রাযীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াল্লাহু আনহুমা-এর সাথে আগমন করলাম। পথিমধ্যে তাঁর স্ত্রী আবু ওবায়দেদের মৃত্যুসংবাদ আসলে তিনি বিকালেই ছুটলেন। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। অতঃপর নামাযের জন্য ডাকা হলেও তিনি নামলেন না। অতঃপর সন্ধ্যা হলে আমরা ধারণা করলাম, তিনি ভুলে গেলেন, তাই আমি বললাম, নামায। তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো তখন তিনি নামলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর শফক ডুবে গেলে ইশা পড়লেন এবং বললেন, রাসূল

^১ আত-তাহাওয়ায়ী, *শরহ মা’আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৯৮৬

—এর সাথে থাকাকালে আমাদেরকে সফরে তাড়াছড়া ফেলে দিলে আমরা এরূপ করতাম।^১

এ হাদীসদ্বয় দ্বারা বোঝা গেল, রাসূল ﷺ কখনো এক ওয়াক্তে দু'নামায পড়তেন না; বরং বিশেষ প্রয়োজন হলে الْجَمْعُ الصُّورِيُّ করতেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময়

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময় নিম্নরূপ:

১. ফজরের নামায:

ক. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি—এর মতে, ফজরের নামায এমন সময় শুরু করা মুস্তাহাব, যখন রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে। রাসূল ﷺ—এর বাণী:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ».

‘হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ আল-আনসারী রাহমাতুল্লাহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ‘তোমরা ফজরের নামায (ভোরের অন্ধকার) ফর্সা করে আদায় কর। কেননা তাতে অনেক সওয়াব রয়েছে।’^২

খ. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহমাতুল্লাহি—এর মতে, عَكْسٌ তথা অন্ধকারে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। তার দলীল হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর হাদীস:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ... يُصَلِّي الصُّبْحَ بِعَكْسٍ».

‘আল্লাহর রাসূল ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন।’^৩

২. যুহরের নামায:

ক. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি—এর মতে, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায দেরি করে এবং শীত কালে তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। তাঁর দলীল হলো:

^১ আত-তাহাওয়া, শরহ মা’আনিয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৯৮৩

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩৯, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২৩৬৩৫

^৩ আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল-মুসনদ, খ. ৩, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ১৮২৮

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ গরমের মওসুমে রোদের তেজ কমলে (একটু দেরি করে) নামায আদায় করতেন।’^১

«إِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَصَلَّ الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ».

‘রাসূলুল্লাহ সঃ গরমকালে যুহরের নামায ঠাণ্ডা সময়ে এবং শীতকালেই বেলা গড়ালেই পড়তেন।’^২

খ. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাঃ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাঃ-এর মতে, সর্বাবস্থায়ই যুহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

৩. আসরের নামায:

ক. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী, ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাঃ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাঃ বলেন, আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

খ. ইমামে আযম আবু হানিফা রাঃ, ইমাম আবু ইউসুফ রাঃ ও ইমাম মুহাম্মদ রাঃ বলেন, সূর্য লাল রঙ ধারণ করার পূর্বে শেষ ওয়াঙ্কে আসর পড়া মুস্তাহাব। যেমন— মহানবী সঃ-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «... وَإِنَّ أَوَّلَ وَفْتٍ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَفْتِهَا حِينَ تَصْفُرُ الشَّمْسُ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘... আসরের নামাযের প্রথম সময় হচ্ছে যখন আসরের সময় শুরু হয় আর শেষ সময় হচ্ছে যখন সূর্য হলুদ রঙ ধারণ করে।’^৩

^১ আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৪৯৯

^২ আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ শারায়ি*, খ. ১, পৃ. ১২৫, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত

^৩ আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ১, পৃ. ২৮৩-২৮৪, হাদীস: ১৫১

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَظَاءَ نَفِيقَةٍ».

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ আসর পড়তেন এমতাবস্থায় যে, সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকত।’^১

৪. ও ৫. মাগরিব ও ইশার নামায:

মাগরিব ও ইশার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخْرُوا الْعِشَاءَ».

‘যতদিন আমার উম্মত মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি এবং ইশার নামায দেরী করে পড়ে, ততদিন তাদের কল্যাণ থাকবে।’^২

নামাযের নিষিদ্ধ সময়সমূহ

নামায আলাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও এমন কিছু সময় আছে, যখন নামায পড়া নিষিদ্ধ। যথা—

১. সূর্যোদয়ের সময়: সূর্যোদয়ের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ।
২. দ্বিপ্রহরের সময়: ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ।
৩. সূর্যাস্তের সময়: যখন সূর্য অস্ত যায়; তখন নামায আদায় করা হারাম। রাসূল ﷺ এর বাণী:

«وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

‘এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।’^৩

নামাযের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْفَعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».

^১ (ক) আস-সারাখসী, আল-মবসূত, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

(খ) আস-সারাখসী, আল-মবসূত, খ. ২, পৃ. ৪২-৪৩

^২ আস-সারাখসী, আল-মবসূত, খ. ১, পৃ. ১৪৪

^৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১২১, হাদীস: ৫৮৬, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

‘হযরত ওকবা ইবনে আমির আল-জুহানী রাযীল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়তে এবং আমাদের মৃতদেহ দাফন করতে নিষেধ করেছেন। তা হলো:

১. যখন সূর্য উদিত হয়; যতক্ষণ না উপরে উঠে।
২. যখন সূর্য মাথার ওপর থাকে; যতক্ষণ না হেলে না পড়ে।
৩. সূর্য যখন ডুবতে শুরু করে; যতক্ষণ না অস্তমিত হয়।’^১

নামাযের মাকরুহ সময়সমূহ

নামাযের মাকরুহ ওয়াজ্বসমূহ নিম্নরূপ:

১. ফজর সালাতের পর সুযোদয় পর্যন্ত।
২. আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত, তবে এ দু সময় নামায কাজা পড়া যাবে।
৩. সুবহে সাদেকের পর দু’রাকাআত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন সালাত আদায় করা।
৪. সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বে অন্য যেকোন নামায আদায় করা।
৫. মধ্যরাতের পর ইশার নামায আদায় করা।
৬. ঈদের নামাযের আগে বাড়িতে বা ঈদগাহে এবং নামাযের পর ঈদগাহে কোন প্রকার নফল নামায পড়া।

আলাহ তাআলার এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, ‘সকাল, সন্ধ্যায়, রাতে এবং দ্বিপ্রহরে আলাহর জন্য তাসবীহ বর্ণনা করণ। কেননা আসমান জমীনে কৃত সকল প্রশংসা তাঁরই।’ এখানে ① سُبْحَانَ শব্দটি মাসদার। এর পূর্বে فُئْلُ উহ্য আছে।

অর্থাৎ ① سُبْحَانَ اللَّهِ আর ② حِينَ تَسْجُدُونَ অর্থ: সন্ধ্যায় এবং ③ حِينَ تَصْبُحُونَ অর্থ: সকালে।

আর ④ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّيِّئَاتِ وَالْأَرْضِ বাক্যটি মাঝে আনা হয়েছে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরি। কারণ নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এই দুইয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষভাগে ⑤ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ বলে আরও দুসময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তা হলো অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী রাযীল্লাহু আনহু বলেন, এখানে তাসবীহ দ্বারা নামায উদ্দেশ্য। তবে নামাযকে তাসবীহ বলার কারণ হলো:

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৬৮, হাদীস: ২৯৩ (৮৩১)

১. নামাযের রুকু ও সাজদায় তাসবীহ আছে।

২. অথবা تَسْبِيحٌ শব্দটি السَّبْحَةُ থেকে এসেছে, যার অর্থ صَلَاة বা নামায। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো:

فَصَلُّوا لِلَّهِ ۖ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

‘তোমরা সকাল সন্ধ্যায় নামায আদায় কর।’^১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

কুরআনের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ

কুরআনুল করীমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়কে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

আলাহ তাআলা বলেন,

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّيْءِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ﴿٢٠﴾

‘সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা করুন এবং ফজরের নামাযে কুরআন পড়ুন। অবশ্যই ফজরে কুরআন পড়ার সময় ফেরেশতাগণ হাজির থাকে।’^২

অন্য আয়াতে বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴿٢١﴾

‘আর দিনের দু’প্রান্তে নামায প্রতিষ্ঠা করুন এবং রাতের একাংশে।’^৩

আরেকটি আয়াতে বলেন,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿٢٣﴾

‘সুতরাং তোমরা আলাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা কর যখন তোমাদের সন্ধ্যা ও সকাল হয়। সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা।’^৪

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ إِلَى

^১ আল-মাওয়ারদী, *আন-নুকাহ ওয়াল উয়ুন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩০৩

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৭৮-৭৯

^৩ আল-কুরআন, *সূরা হুদ*, ১১:১১৪

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আর-রুম*, ৩০:১৭-১৮

قَوْلُهُ: ﴿وَحِينَ تَظْهَرُونَ﴾ قَالَ: جَمَعَتِ الصَّلَوَاتِ، ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ أَلْ-مَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ صَلَاةُ الصُّبْحِ، ﴿وَعِشَاءً﴾ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ﴿وَحِينَ تَظْهَرُونَ﴾ صَلَاةُ الظُّهْرِ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর ইরশাদ: ﴿وَحِينَ تَظْهَرُونَ﴾ বিষয়ে তিনি বলেন, এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা উল্লেখ আছে, ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ শব্দে মাগরিবের নামায ও ইশার নামায, ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ শব্দে ফজরের নামায, ﴿وَعِشَاءً﴾ শব্দে আসরের নামায এবং ﴿وَحِينَ تَظْহَرُونَ﴾ শব্দে যুহরের নামাযকে উল্লেখ হয়েছে।^১

তবে ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা রাঃ হতে বর্ণিত আছে, আয়াতদুটি চার ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ বাহক। আর তা হলো: মাগরিব, ফজর, আসর এবং যুহর। আর ইশার নামাযের প্রমাণ রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনের সূরা হুদের ১১৪ আয়াতের ﴿وَرُفَعْنَا مِنَ الْأَيْلُ﴾ শব্দে।^২

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রাঃ বলেন, ‘আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজে সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত যিক্র এর অন্তর্ভুক্ত। যিক্রের যতপ্রকার আছে এর মধ্যে নামায শ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।’^৩

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের আগে আনার কারণ সম্ভবত এই যে, আসরের সময় সাধারণত কাজে কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দুআ, তাসবীহ অথবা নামায সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন কাজ। এ কারণে কুরআনে الصَّلَاةُ তথা আসরের নামাযের বিশেষ তাগিদ বর্ণিত হয়েছে,

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٣٠﴾

‘সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।’^৪

^১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন, খ. ১৮, পৃ. ৪৭৫

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৪, পৃ. ১৪

^৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ১০৪০

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৩৮

কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায়

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلِ اللَّهُ
 الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٨٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً
 وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
 الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ
 كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 بِالنَّاسِ لَعَزِيزٌ ﴿١٨١﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
 تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ
 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٨٢﴾ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ
 بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٨٣﴾ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
 يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

‘১৪২. মানুষের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের সেই কিবলা থেকে, যার ওপর তারা ছিল? আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আলাহ তাআলারই জন্যই, তিনি যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন। ১৪৩. এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থি জাতি করেছি, যেন তোমরা মানব-জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। আপনি এ যাবৎ যে কিবলার ওপর ছিলেন তাকে আমি কিবলা নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এ উদ্দেশ্যে, যাতে আমি জানতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে যায়। যদিও এ ব্যাপারটি বড় কঠিন, কিন্তু যাদেরকে আলাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা বাতীত বস্তুত আলাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমার বিনষ্ট করে দেবেন, নিশ্চয় আলাহ সময়ের প্রতি অতি দয়াশীল ও পরমগাম্য। ১৪৪. আমি আপনার চেহারা বারবার আকশের দিকে ফিরানোকে লক্ষ করেছি। আর শিগগিরই আপনাকে সে কেলার

দিকে ঘুরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব মসজিদুল হারামের দিকে আপনার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিন। (হে মসসলমানগণ!) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, নামাযে সেদিকেই মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় যারা আহলে কিতাব তারা অবশ্যই জানে যে, কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। আর আলাহ তারা যা করে সে সম্পর্কে অনবহিত নন। ১৪৫. যদি আপনি যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন। তারাও পরস্পর একে অন্যের কিবলার অনুসারী নয়। আর আপনার নিকট জ্ঞান আনার পর আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, নিশ্চয় আপনিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে তেমনীভাবে চিনে যেমন তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে। আর তাদের একদল সত্যকে গোপন করে অথচ তারা জানে।”

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۚ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿١٤٦﴾

‘হে নবী আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েয়েছেন। তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ তাঁরই দিকে সন্নিবেশিত করবে আর আনুগত্য শুধু তাঁরই প্রতি নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে।”

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿١٤٦﴾ মহান আলাহ মহৎ কাজেরই নির্দেশ দেন। কোন প্রকার অরুচিপূর্ণ কাজ করা মহান আলাহ তাআলার শানের বিপরীত। আরবদের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নির্দেশ প্রদান করে আলাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন যে, আমার রব আমাকে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যেসমস্ত অশীল ও ভ্রান্ত কাজের নির্দেশকে আলাহ তাআলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছ, সেগুলো অবাস্তব ভিত্তিহীন।’ আমার রব আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘তোমরা তোমাদের

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৪২-১৪৬

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭:২৯

মুখমণ্ডলসমূহ প্রত্যেক নামাযের সময় মহান আলাহর দিকে ফিরিয়ে রাখ ।’ অর্থাৎ আলাহ তাআলাকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে স্বীকারপূর্বক ইবাদতকে শুধু তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করবে, অন্য কারো জন্য নয় । আমার আনুগত্যের মস্তক তাঁর জন্য নিবেদিত করত তাঁকে ডাকতে হবে । তিনি তোমাদেরকে প্রথম যেভাবে শুধু মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, পুনরায় তোমরা আবার সৃজিত হবে এবং সেখানে তোমাদের সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে ।

শানে নুযূল

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ...﴾ আয়াতের শানে নুযূল

আলামা কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বয়যাওয়াসী আল-বয়যাওয়াসী সহ অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিস বলেন, মহানবী আল-বয়যাওয়াসী মক্কায় থাকাকালে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করেতেন । মদীনা শরীফ হিজরত করার পর বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসার পর মহানবী আল-বয়যাওয়াসী ষোলো-সতের মাস পর্যন্ত সেদিকে ফিরে নামায আদায় করেন । আলোচ্য আয়াত দ্বারা মহানবী আল-বয়যাওয়াসী কে আভাস দেওয়া হয়েছে যে, কিবলা পুনরায় পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এবং তখন বোকা ইহুদি, মুশরিক ও মুনাফিকরা সে সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক ও আপত্তিমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করবে, এ বিষয়টি অবগত করানোর জন্যই ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ...﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ।

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً﴾ আয়াতের শানে নুযূল

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী আল-বুখারী বর্ণনা করেন,
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ، أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، أَنْكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ

الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾.

‘হযরত আল-বারা ইবনে আযিব রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সঃ প্রথমে মদীনায়ে এসে তাঁর মামাদের বংশীয় বাড়িতে উঠলেন এবং তিনি ষোল মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়লেন। তবে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়তে তার ভালো লাগত। তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে প্রথম যে নামায পড়েন, তা ছিল আসরের নামায। তাঁর সাথে একদল মানুষ নামায পড়ল। অতঃপর তাদের থেকে একজন আবাদ ইবনে নুহায়ক বের হয়ে একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ছিল, অতঃপর সে বলল, আলাহর কসম! আমি নবী করীম সঃ-এর সাথে মক্কার দিকে ফিরে নামায পড়ে এসেছি। তখন নামাযের অবস্থায় তারাও বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে গেল। সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক বায়তুল্লাহর দিকে কিবলা পরিবর্তনের আগে মারা গিয়েছিল। তারা তাদের সম্পর্কে বলল, আমরা জানি না তাদের নামায কবুল হলো কি না? তখন আলাহ তাআলা নাযিল করেন, ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ ১

আয়াতের শানে নুযূল

ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর রাঃ ইমাম ইবনে আবু হাতিম রাঃ থেকে বর্ণনা করেন,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ۚ قَالَ: فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمْ الْيَهُودُ - مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৭, হাদীস: ৪০ ও খ. ৬, পৃ. ২১, হাদীস: ৪৪৮৬

‘হযরত আল-বারা ইবনে আযিব রাযীয়াতুল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ষোলো বা সতের মাস নামায পড়লেন। কিন্তু তাঁর মনের আশা ছিল যে, তাঁর কিবলাকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হোক। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, **قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ** ১। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। তখন নির্বোধ ইহুদিরা বলল, যে কিবলার দিকে এরা ছিল সেটা থেকে এদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল? তখন তাদের উক্ত কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, **قُلْ لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ** ২ **صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** ৩

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلَ مَا نَسَخَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْيَهُودَ، أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَعَةِ عَشَرَ شَهْرًا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَدْعُو اللَّهَ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুল্লাহু আনহুমা বলেন, কুরআনের কিবলা পরিবর্তনের এটিই প্রথম নির্দেশ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায হিজরতের পর সেখানে বসবাসরত ইহুদিদের মনস্তৃষ্টির জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়ার হুকুম প্রদান করেন। ইহুদিরা এতে আনন্দিত হয়। তিনি ষোলো বা সতেরো মাস সেদিকে ফিরে নামায আদায় করেন। নিজের একান্ত কামনা ছিল বায়তুল্লাহর দিকেই তাঁর কিবলা হোক। তাই তিনি এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করতেন এবং বারংবার আকাশের দিকে তাকাতেন এ আশায় যে, **قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي** ১ **السَّمَاءِ** ২ আয়াতটি নাযিল হয়।^{১২}

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ১৩২৮, (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ৩২৫

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ২৫৩, হাদীস: ১৩৫৫, (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১, পৃ. ৩২৫

وَلَكِنَّ آيَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِحُلٍّ آيَةً مَا تَتَّبِعُونَ ۖ قُلْتُمْ ۖ

বর্ণিত আছে যে, মদীনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানরা মহানবী ﷺ-কে বলল, পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় আপনিও নির্দেশ নিয়ে আসুন, তখন আলাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলাহ তাআলা বলেন, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلِيهَا ۚ (হে নবী!) লোকদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা অচিরেই বলবে, তোমরা যে কিবলায় ছিলে তা থেকে কেন তোমরা পশ্চাৎমুখী হলে।

আলামা কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বয়যাওয়ী رحمته الله تعالى বলেন, سَيَقُولُ-এর দ্বারা বোঝা যায়, আলাহ তাআলা নির্বোধদের ঠাট্টার আগেই সে সম্পর্কে স্বীয় রাসূলকে رحمته الله تعالى জানিয়ে দিয়েছেন। যাতে তিনি পরবর্তীতে তাদের ঠাট্টার কারণে বেশি ব্যথিত না হন বা তাদের ঠাট্টার জবাব প্রস্তুত করতে পারেন।^১

আস-সুফাহার অর্থ

السُّفَهَاءُ শব্দটি سَفِيْة-এর বহুবচন; سَفِيْة শব্দটি عَالِم-এর বিপরীতে ব্যবহার হয়; سَفِيْة শব্দের অর্থ হলো: নির্বোধ, বোকা, কানপুজ্ঞানহীনতা, দুর্বল মতামত পেষণকারী, স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী ইত্যাদি। যেমন- কবি বলেন,

إِذَا نَطَقَ السَّفِيْةُ فَلَا حِجْبَهُ	*	فَخَيْرٌ مِّنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ
-----------------------------------------	---	---------------------------------------

‘যখন বোকা কথা বলে তার জবাব দেবে না, রবং তার জবাব দেওয়ার চেয়ে নিশ্চুপ থাকাই উত্তম।’^২

আস-সুফাহা দ্বারা উদ্দেশ্য

আলাহ তাআলার বাণী سَفِيْة দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رحمته الله تعالى ও ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর رحمته الله تعالى-এর মতে سَفِيْة দ্বারা মদীনার ইহুদিদেরকে বোঝানো হয়েছে।
২. ইমাম হাসান আল-বাসারী رحمته الله تعالى বলেন, سَفِيْة দ্বারা আরবের মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

^১ আল-বয়যাওয়ী, *আনওয়ারুল তানযীল ওয়া আসরারুল তাওয়ায়ীল*, খ. ১, পৃ. ১১০

^২ আশ-শা‘রাওয়ী, *তাফসীরুল কুরআন*, খ. ১৭, পৃ. ১০৫০৩

৩. ইমাম ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী رحمۃ اللہ علیہ ও ইমাম শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী رحمۃ اللہ علیہ-এর মতে, سُفْهُاءٌ দ্বারা মুনাফিকদের বোঝানো হয়েছে।^১
৪. তাফসীরে জালালাইনের টীকায় বর্ণিত আছে, سُفْهُاءٌ দ্বারা ইহুদি ধর্মের পণ্ডিতবর্গ উদ্দেশ্য।
৫. ইমাম ইবরাহীম ইবনুস সাররী আয-যাজাজ رحمۃ اللہ علیہ বলেন, এখানে سُفْهُاءٌ বলে মক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তারা ঠাট্টা করে বলেছিল, কেবল মুসলমানরা মাতৃভূমির দিকে আকর্ষিত হয়েছে। অচিরেই তারা তাদের মূল দীনের দিকে ধাবিত হবে।^২

سَيِّئُونَ তথা ভবিষ্যতকালের ক্রিয়া ব্যবহারের হিকমত

কিবলা পরিবর্তন এবং নির্বোধদের কোন প্রকার মন্তব্য করার পূর্বেই আলাহ তাআলা মহানবী ﷺ-কে কিবলা পরিবর্তনের পর নির্বোধ লোকেরা কি বলবে, তা জানিয়ে দেন। স্বভাবকতই প্রশ্ন জাগে এর তাৎপর্য কি? মূলত এর মধ্যে কতিপয় হেকমত রয়েছে। যেমন—

১. নির্বোধদের মনের কথা রাসূল ﷺ যদি পূর্বেই বলে দেন, তাহলে তারা এটাকে মুজিয়া হিসেবে ধরে নেবে, যা হবে তার নুবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ।
২. নির্বোধদের অবাস্তুর প্রশ্নের জবাবে মহানবী ﷺ কী উত্তর পেশ করবেন, তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেন।
৩. কিবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধদের অশালীন বিদ্রূপাত্মক কথা থেকে রাসূল ﷺ যেন মনে কষ্ট অনুভব না করেন, তাই সেই কথা গুলো অগ্রিম জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামের প্রথম কিবলা কোনটি?

এ সম্পর্কে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা—

১. কেউ কেউ বলেন, মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল বায়তুল্লাহ। অতঃপর মদীনায আসার পর ১৬/১৭ মাস কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। তারপর আবার তাদের প্রথম কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।
২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী رحمۃ اللہ علیہ-এর মতে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, মুসলিমদেরকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে রাসূল ﷺ কখনও কাবার দিকে পেছন ফিরিয়ে

^১ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ১, পৃ. ১১৮

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ১৪৮

নামায পড়েনি বরং মক্কা থাকাকালীন সময়ে কাবাকে মাঝখানে রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়েতেন।

কিবলা পরিবর্তনের সময়

রাসূল ﷺ মদীনায হিজরতের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতেন। কিন্তু তার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষার কারণে আলাহ তাআলা কিবলার পরিবর্তন করে পুনরায় মক্কার কাবার দিকে মুখ ফিরানো নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের সময় সম্পর্কে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

১. দ্বিতীয় হিজরী ১৫ শাবান,
২. দ্বিতীয় হিজরী ১৫ রজব।

তবে অধিকাংশের মতে ১৫ রজবের মতটি অধিক বিশ্বুদ্ধ।

যে-মসজিদে কিবলা পরিবর্তন সংঘটিত হয়

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন,
'যেদিন কিবলা পরিবর্তনের বিধান অবতীর্ণ হয়, সেদিন মহানবী ﷺ বনু সালিমার বিশর ইবনুল বারার রযাযা/আনহু-এর বাড়িতে মেহমান ছিলেন। দুপুরের খাবার গ্রহণের পর মসজিদে বনু সালামাতে যুহরের নামায আদায় করা অবস্থায় এ নির্দেশ আসে। তখন তিনি নামাযের মধ্যে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে যান। এ কারণেই উক্ত মসজিদকেই মসজিদে যুল কিবলাতাইন বলা হয়।'^১

বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে মহানবী ﷺ-এর নামাযের সময়কাল

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী রযাযা/আনহু বলেন, মদীনায আগমনের পরে মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কতদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন, এ নিয়ে ছয়টি মতামত রয়েছে। যথা—

১. হযরত আল-বারা ইবনে আযিব রযাযা/আনহু-এর মতে ১৬ বা ১৭ মাস।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রযাযা/আনহু-এর মতে, ১৬ বা ১৭ মাস।
৩. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রযাযা/আনহু-এর মতে ১৩ মাস।

^১ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৫৩৬:

ثُمَّ أُمِرَ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَاسْتَدَارَ إِلَيْهِ، وَدَارَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَنُقِلَ: كُلُّ رَأَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ بِشَرِّ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوفٍ فِي نَبِيِّ سَلَمَةَ، فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا وَحَاتَتْ الظُّهْرَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ وَكُعْتَبِينَ، ثُمَّ أُمِرَ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ، فَاسْتَدَارَ إِلَى الْكُعْبَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ فَسَمَّى الْمَسْجِدَ: مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ.

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ-এর মতে ১৯ মাস ।
 ৫. ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা রাঃ-এর মতে ১৬ মাস ।
 ৬. ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা রাঃ-এর অন্য বর্ণনায় ১৬ মাস ।^১

কিবলা পরিবর্তনের কারণ

রাসূল সঃ-এর মাদানী জীবনের দ্বিতীয় বর্ষে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে । মদীনায় আসার পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত নবী করীম সঃ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন । অতঃপর তাঁর কিবলাকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় । এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাঃ কয়েকটি মতামত পেশ করেছেন । যথা—

১. মদীনায় আসার পর নবী করীম সঃ সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণের আশায় তাদের সাথে আনুকূল্য প্রমাণের জন্য ১৬/১৭ মাস তাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন । পরবর্তীতে যখন তাদের গোড়ামি প্রমাণিত হলো তখন রাসূল সঃ তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং কিবলা পরিবর্তন করে দেওয়া হলো ।
২. আল্লাহর রাসূল সঃ-এর ইচ্ছা ছিল স্বীয় পিতা হযরত ইবরাহীম রাঃ ও ইসমাঈল রাঃ-এর কিবলা তথা কাবার দিকে ফিরে নামায পড়া আর এ জন্য তিনি অহীর অপেক্ষায় বারবার আকাশের দিকে মুখ উঠাতেন । অতঃপর আলাহ তাআলা তাঁর নবীর কামনা কবুল করে কিবলা ঘুরিয়ে দেন । যেমন—
 ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَتَوَلَّيْنَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

‘আমি আপনার চেহারা বারবার আকাশের দিকে ফিরানোকে লক্ষ্য করেছি । আর শিগ্গিরই আপনাকে সে কেলার দিকে ঘুরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন । অতএব মসজিদুল হারামের দিকে আপনার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিন । (হে মসুসলমানগণ!) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, নামাযে সেদিকেই মুখ ফিরিয়ে নাও ।’^২

৩. কেউ কেউ বলেন কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের কারণ হলো: এটা আরবদেরকে ইসলামের দিকে ডাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।
৪. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাঃ বলেন, ইহুদিদের বিরোধিতা করার জন্য তাদের কিবলা থেকে মুসলমানদের কিবলাকে আলাদা করা হয়েছে ।

^১ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ১, পৃ. ১১৮

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৪৪

৫. হযরত আবু আলিয়া রাঃ বলেন, হযরত সালিহ রাঃ ও হযরত মুসা রাঃ সহ অধিকাংশ নবীর কিবলা ছিল কাবার দিকে। আর এটা হলো পৃথিবীর প্রথম ইবাদতগৃহ। তাই এ দিকে কিবলা পরিবর্তন করা হয়েছে।
৬. কতেক আলেম বলেন মুনাফিকদের পরীক্ষা করার জন্য কিবলা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন— ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَقْبَلُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۖ

‘এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থি জাতি করেছি, যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। আপনি এ যাবৎ যে কিবলার ওপর ছিলেন তাকে আমি কিবলা নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এ উদ্দেশ্যে, যাতে আমি জানতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে যায়।’^১

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা

ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর রাঃ বলেন, ‘মহানবী রাঃ মদীনায আসর পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত তার কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস নবী রাঃ-এর দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও প্রবল কামনার ফলে দ্বিতীয় হিজরী রজব/শাবান মাসের ১৫ তারিখে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। তখন রাসূল রাঃ বনু সালামার মসজিদে যুহরের নামায আদায়রত অবস্থায় ছিলেন। দু’রাকাত পড়ার পর কিবলা পরিবর্তনের আদেশ হয়। তখন রাসূল রাঃ উত্তর থেকে দক্ষিণে ফিরে গেলেন সাহাবায়ে কেরামও দক্ষিণে ফিরে গেলেন। অতঃপর বাকী দু’রাকাত নামায কাবার দিকে ফিরে পড়া হলো। তাই বনু সালামার মসজিদকে মসজিদে যুল কিবলাতাইন বলা হয়। অতঃপর নবী করীম রাঃ মদীনায ফিরে এসে মসজিদে নববীতে প্রথম নামায পড়লেন, আসরের নামায। যা সম্পূর্ণই কাবার দিকে ফিরেই পড়া হয়ে ছিল। তারপর আব্বাদ ইবনে নাহীক নামক এক ব্যক্তি বের হয়ে মসজিদে বনু হারেসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে কসম করে বললেন, তারাও আসরের নামায দুই কিবলার দিকে পড়ে। আর কাবাবাসীর কাছে খবর পৌঁছল ফজরের নামাযের সময়। অতঃপর কাবা শরীফ মুসলমানদের কিবলা হয়ে গেল।’^২

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৩

^২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৭, হাদীস: ৪০ ও খ. ৬, পৃ. ২১, হাদীস: ৪৪৮৬, (খ) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ১৩২৮, (গ) ইবনে

মসজিদুল হারামের ব্যাখ্যা

المَسْجِدُ الْحَرَامُ-এর উল্লেখ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সম্মানিত মসজিদ, নিষিদ্ধ মসজিদ। মসজিদে হারাম বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো।

১. حَرَامٌ শব্দটি নিষিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করলে অর্থ হবে, এ মসজিদে যুদ্ধ বিগ্রহ, আচার-বিচার, হত্যা, খুন, গালমন্দ, পশুপাখি শিকার এমনকি গাছের পাতা ছেঁড়াও নিষিদ্ধ। তাই একে الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ বলা হয়।

২. আর حَرَامٌ শব্দটি সম্মানিত অর্থে ব্যবহার হলে অর্থ দাঁড়ায়, যারা এখানে অবস্থান করবে তারা সম্মানিত হবে। এজন্য এটাকে বলে- الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ।

উল্লেখ্য, কাবার দিকে মুখ ফিরানোর পরিবর্তে মসজিদে হারামের দিকে আদেশ প্রদান করার ব্যাখ্যায় বলা হয়, মহানবী ﷺ তখন মদীনায অবস্থান করেছিলেন, যা কাবা হতে দূরে ছিল। এজন্য নামায আদায়ের প্রকালে কাবাকে সামনে রাখা আবশ্যিক নয়; বরং মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরানোই ছিল যথেষ্ট। কেননা কাবাঘরের চতুর্পার্শ্বে মসজিদে হারাম অবস্থিত। সুতরাং দূর থেকে মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরানোই কাবার দিকে মুখ ফেরার শামিল। তবে যারা মসজিদে হারামে অবস্থানরত কিংবা হেরেমের ভেতরে কাবার চত্বরে অবস্থিত, তাদের জন্য কিবলা হচ্ছে কাবাঘর।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস শরীফে আছে। এর দ্বারা কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন-

১. الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ: কাবা। যেমন- মহান আলাহ বলেন,

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

‘মসজিদে হারামের দিকে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন।’

২. الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ: সম্পূর্ণ মসজিদ। যেমন- নবী করীম ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

‘হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ‘মসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এই মসজিদে নামায

কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযমী, খ. ১, পৃ. ৩২৫, (ঘ) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১৪৮-১৪৯

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৪ ও ১৫০

আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার নামায আদায়ের চেয়ে উত্তম।^১

৩. মক্কা শরীফ। যেমন- আলাহ তাআলা বলেন,

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِبْرَةِ ۚ

‘পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত; যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই।’^২

৪. সম্পূর্ণ হারাম। যেমন- আলাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَلَمِهِمْ هَذَا ۖ

‘হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।’^৩

এখানে অমুসলিমদের হারামে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

وَمَا أَنتَ بِتِلْكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ عَمَّا يُفْتَرُونَ ۚ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, কাবাঘর কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের কিবলা থাকবে। ইহুদিরা বলে, মুসলমানদের কিবলার কোন স্থিতি নেই। ইতঃপূর্বে তাদের কিবলা ছিল কাবাঘর, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস হলো, তাও পরিবর্তন হয়ে পুনরায় কাবাঘরই হলো। আবার হয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসকেই কিবলা বানিয়ে নেবে। ইহুদিদের এসব বক্তব্যকে এ আয়াত দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে।

كَمَا يَفْرُقُونَ إِبْنَاءَهُمْ ۚ এ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততি চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। পিতামাতার নিকট সন্তানদের পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ পিতামাতা জন্মলগ্ন থেকেই সন্তানদেরকে স্বহস্তে লালন-পালন করে থাকেন। হাজার মানুষের ভীড়ের মধ্যে হলেও পিতা মাতা তার সন্তানকে চিনতে মোটেই ভুল করেন না।

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬০, হাদীস: ১১৯০

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:১

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:২৮

মুসলমানদের কিবলা

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রহমতুল্লাহি সহ অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, মুসলমানদের কিবলা একটি। তা হলো: سُجْدُ الْحَرَامِ যা দ্বারা কাবা শরীফকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে,

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ».

‘(মক্কা বিজয়ের দিন) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তখন তার চারপাশে দুআ করলেন। ভেতরে নামায পড়লেন না। অতঃপর বের হয়ে কাবাকে সামনে রেখে দু’রাকাআত নামায পড়ে বললেন, এটাই কিবলা।’^১

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি-এর মতে, সর্বাবস্থায় হুবহু কাবাই কিবলা। অন্যদিকে ফিরে নামায হবে না।

কিবলার প্রকারভেদ

ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহি-এর মতে, কিবলা দুই প্রকার। যথা—

১. عَيْنُ الْكَعْبَةِ বা হুবহু কাবা শরীফ। এটা তাদের জন্য যারা কাবাকে সামনে দেখছে।
২. جَهَةُ الْكَعْبَةِ বা কাবার দিক। এটা তাদের জন্য যারা কাবাকে সরাসরি দেখছে না; বরং কাবা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। কেননা আলাহ তাআলা বলেছেন,

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

‘তুমি মসজিদে হরামের দিকে মুখ ফিরাও।’^২

বায়হাকী শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ،

^১ (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৮৮, হাদীস: ৩৯৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহি থেকে বর্ণিত, (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৬৮, হাদীস: ৩৯৫ (১৩৩০), (গ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ১১৫, হযরত উসামা ইবনে যায়দ রহমতুল্লাহি থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৪৪ ও ১৫০

وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي».

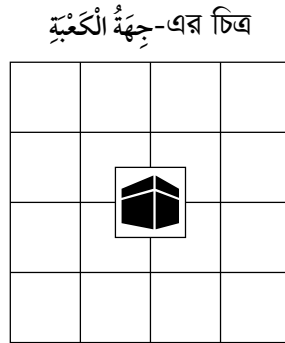
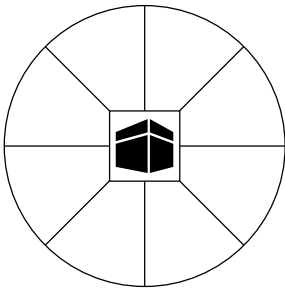
‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ^{রাযিআল্লাহু আনহুমা} থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ করেছেন, ‘বায়তুল্লাহ বা কাবা হলো তাদের কিবলা, যারা মসজিদে হারামে অবস্থান করছে। আর মসজিদে হারাম কিবলা তাদের জন্য, যারা হেরেমের সীমায় অবস্থান করছে। আর আমার প্রাচ্যে ও প্রশ্চাত্যে বসবাসকারী উম্মতের কিবলা হলো হারাম শরীফ।’^১

এটা জানা কথা যে, عَيْنُ الْكُعْبَةِ কখনই حَرَامٌ নয়, বরং جَهَةُ الْكُعْبَةِ বা কাবার দিকে অবস্থিত।

তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম মদীনা থেকে মক্কার দিকে মুখ করেই নামায আদায় করতেন। হুবহু কাবার দিকে ফিরে নামায পড়া তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। কারণ হুবহু কাবার দিকে ফিরতে হলে জ্যামিতিক রেখা প্রয়োজন, যা সেসময় অনুপস্থিত।

আর যুক্তিই তাই বলে। কারণ যদি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য عَيْنُ الْكُعْبَةِ-ই কিবলা হতো, তাহলে কারও নামাযই শুদ্ধ হতো না। কারণ ২৪ বর্গগজ বিশিষ্ট একটি ঘর হুবহু সামনে রাখা, বিশ্বের সকলের জন্য প্রায় অসম্ভব; বিশেষ করে যারা তা দেখছে না তাদের জন্য। এমতাবস্থায় কারো না কারো দিক হুবহু কাবার দিক হতো না। আর সন্দেহের কারণে সকলের নামায অশুদ্ধ হতো। অথচ সকল উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সকলের নামাযই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

جَهَةُ الْكُعْبَةِ ও عَيْنُ الْكُعْبَةِ-এর চিত্র



^১ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ১৬, হাদীস: ২২৩৪

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাবাকে দেখছে, তার জন্য ফরয হলো হুবহু কাবার দিকে ফিরা। আর যে ব্যক্তি কাবাকে দেখছে না, কাবা তার অবস্থানস্থল থেকে যেদিকে অবস্থান করছে সে দিকে ফেরা। যেমন- বাংলাদেশ থেকে কাবা পশ্চিমদিকে, তাই বাংলাদেশের সকলের জন্য পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়া ফরয।

নামাযে কিবলামুখী হওয়ার হুকুম

নামাযে হুবহু কাবা বা কাবার দিকে মুখ ফেরানো ফরয। এ প্রসঙ্গে ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহু আলাইহ বলেন, যারা কাবাকে সরাসরি দেখছে তাদের কিবলা হলো কাবা শরীফ, আর যারা দেখছে না তাদের কিবলা হলো কাবার দিক।

অবশ্য ফিকহবিদগণ বলেন, এ হুকুম সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা বা ভয়ের কারণে কাবার দিকে ফিরতে অক্ষম হয়, তবে সে সুবিধামতো যেকোন দিকে ফিরে নামায পড়লেই চলবে। অনুরূপ নফল নামায যদি বাহনের ওপর পড়ে, তবে যেকোন দিকে পড়লেই চলবে। অর্থাৎ প্রথমে কিবলা ঠিক করে নিবে এবং পরে যদি বাহন ঘুরে যায়, তাহলে তার ঘোরার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইরশাদ হয়েছে,

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ ۝

‘তোমরা যেদিকেই ফেরাও সেদিকেই আলাহ তাআলা আছেন।’

কিবলা নির্ণয়ের জন্য تَحْرِي করার হুকুম

ফরয নামাযের জন্য প্রথমে কিবলার দিক নিশ্চিত করে তারপর নামায শুরু করা ফরয। জানা না থাকলে تَحْرِي বা চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করা ফরয। যদি গবেষণায় ভুল হয় তবুও নামায শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি নামাযের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার দিক পরিবর্তন হয় এবং অন্যদিকের প্রতি মন ঝুঁকে যায় বা কেউ সঠিক কিবলার দিকের কথা বলে দেয়, তবে নামায অবস্থায় সেদিকেই ঘুরে যেতে হবে। অনুরূপ নিশ্চিত কাবার দিকে ফিরে নামায অবস্থায় যদি বাহন দিক পরিবর্তন করে এবং মুসল্লির জন্য ঘুরে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে ঘুরে যাওয়াই জরুরি।

মধ্যপন্থী জাতির মর্মার্থ

এ-اُمَّةٌ وَسَطٌ -এ-اُمَّةٌ وَسَطٌ ৷ যেমন- বলা হয়: قُرَيْشٌ اَوْسَطُ الْعَرَبِ অর্থাৎ কুরাইশ মর্যাদার দিক থেকে উত্তম। নবী করীম আল্লাহু আলাইহ সাল্লাতু ওয়াসালম

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১১৫

তাঁর জাতির মধ্যে اَوْسَطُ ছিলেন। আলাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে মধ্যমপন্থায় চলার মর্যাদা দান করেছেন। অতএব যারা মধ্যমপন্থী হয়, তাদের মধ্যে না বাড়াবাড়ি থাকে না সীমালঙ্ঘন থাকে। তারা হয় উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ জাতি। তারা বিশ্বের মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য।

এর মর্মার্থ - شُهِدَ عَلَى النَّاسِ ۝

আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সাক্ষ্যদাতা সম্প্রদায়। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি পৃথক মর্যাদা লাভ করবে। সকল নবীর উম্মতগণ তাদের হিদায়ত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন কিতাব পৌঁছেনি। কোন নবীও আমাদের হিদায়ত করেননি। তখন মুসলমানরা নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এ সময় বিবাদী উম্মতগণ মুসলিম জাতির সাক্ষ্যের ব্যাপারে অভিযোগ করে বলবে, আমাদের যুগে এদের অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের বিষয়সমূহ তাদের জানার কথা নয়; কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হবে?

উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হবে, অবশ্যই তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু একজন সত্যবাদী রাসূল ও আলাহর কিতাব কুরআন তাদের অবস্থা ও তাদের যাবতীয় ঘটনাবলি সম্পর্কিত তথ্যাবলি আমাদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। আমরা সে গ্রন্থের ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর সরবরাহকৃত তথ্যাবলিকে চাক্ষুষ দেখার চেয়ে অধিক সত্য মনে করি। তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রাসূল ﷺ উপস্থিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, তারা যা কিছু বলেছে সবই সত্য। আলাহর গ্রন্থে আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيَقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغْتُمْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُدْعَى مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقَالُ لَ هُمْ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا قَوْمُهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقَالُ: وَمَا عِلْمُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جَاءَنَا نَبِيٌّ، فَأَخْبَرَنَا: أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا».

‘হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেন, ‘কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী উপস্থিত হবেন, তার সাথে শুধু দুয়ের অধিক উম্মত থাকবে, তার উম্মতদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে নবী কি আমার দাওয়াত পৌঁছিয়ে ছিলেন? তখন তারা অস্বীকার করবে। অতঃপর নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি কি আমার দাওয়াত পৌঁছিয়ে ছিলেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনার সাক্ষী কে? তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এ নবীগণ কি দাওয়ার প্রচার করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিভাবে তা জানলে? উত্তরে উম্মতে মুহাম্মদী বলবে, আমাদের নিকট নবী এসেছেন এবং তিনি এসব আমাদেরকে বলেছেন।’^১

কিবলা উল্লেখের পর أُمَّةٌ وَسَطًا উল্লেখ করার কারণ

যে বস্তুটি মাঝে থাকে সবদিক দিয়েই তার দূরত্ব সমান হয়ে থাকে। কাবাগৃহটি দুনিয়ার ঠিক মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর দুনিয়া সৃষ্টির আগে আলাহ তাআলা এ স্থানটিকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ কিবলার অনুসারী যারা হবে তারাও হবে এ কিবলার গুণে গুণান্বিত। তাদের মাঝে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থাকবে না। আর তারা সবকাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনই হবে তাদের চরিত্র: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا দ্বারা এ তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের প্রতি তাকালে দেখা যায়, এ সর্বস্তরে ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমমানের বিধান বিদ্যমান। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا».

‘হযরত মুতার্রিফ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মধ্যপন্থাই উত্তম।’^২

আর এ মধ্যমপন্থা গ্রহণ করাই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য বলে উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

أُولَئِكَ বলতে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে কে অনুসারী কে বিরোধী তা পরীক্ষা করাই মহান আলাহর উদ্দেশ্য ছিল। এ মতটি كُنْتُ عَلَيْهِ দ্বারা বোঝা যায়।

^১ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৮, পৃ. ১১২, হাদীস: ১১৫৫৮

^২ আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৮, পৃ. ৫১৮, হাদীস: ৬১৭৬

কারো মতে, اٰیٰةُ দ্বারা اٰیٰةُ উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে, বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হওয়ার পর বর্তমানে আপনি যে কিবলার দিকে আছেন, এটা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কে অনুসারী ও কে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী তা জেনে নেওয়া।

কারো মতে, এ কিবলার দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণের পূর্বের কিবলাকে বোঝানো হয়েছে। আর তা ছিল কাবা শরীফ।

আয়াতে ঈমানের অর্থ এবং اٰیٰةُ শব্দটি নেওয়ার কারণ

সকল তাফসীরকার এ কথায় একমত যে, আয়াতটি সেই সকল ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর পর থেকে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা তাদের সকল নামায বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তাকিয়েই আদায় করেছিলেন। সে নামাযকেই এখানে ঈমান বলা হয়েছে। কেননা নামায ঈমান দ্বারা পরিবেষ্টিত। অর্থাৎ নামাযে ঈমান তথা নিয়ত, কথা ও কাজের সমষ্টি রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এখানে ঈমান উল্লেখ করে ঈমানের প্রতি দৃঢ় থাকার তাগিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে কিবলা পরিবর্তনের কারণে বিশ্বাসের ব্যাপারে যেন কোন শিথিলতা না আসে আর যেন কোনো সন্দেহের উদ্বেক না হয়। যেমন— অন্যরা সন্দেহের মাঝে পতিত হয়েছিল।

اٰیٰةُ-এ اٰیٰةُ দ্বারা উদ্দেশ্য

اٰیٰةُ কখনো কারো সম্বোধিত, এ সম্বন্ধে দুটি সম্ভাবনা দেখা যায়। যথা—

১. মুমিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের ঈমান আল্লাহ তাআলা নষ্ট করবেন না।
২. আবু মুসলিম রাঃ বলেন, এখানে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তখন ঈমান দ্বারা তাদের সকল নামায ও ইবাদত উদ্দেশ্য।^১

اٰیٰةُ ও اٰیٰةُ-এর পার্থক্য

اٰیٰةُ ও اٰیٰةُ উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। তা হলো দয়া ও করুণা। তবে اٰیٰةُ থেকে اٰیٰةُ-এর অর্থে অধিক তাগিদ রয়েছে।

^১ ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৯৩

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা

মহানবী ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর কিবলা ছিল বায়তুল্লাহ। অতঃপর মহানবী ﷺ মদীনায হিজরত করেন। সে সময় মদীনায অনেক ইহুদি বসবাস করত। তাদের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। তাদের মনস্তষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা মহানবী ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। সাহাবীগণও মহানবী ﷺ-এর সাথে এভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফকে কিবলা নির্ধারণ করে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং আল্লাহর এ সম্পর্কিত নির্দেশ নিয়ে জিবরাঈলে আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মনের অভিলাস পূর্ণ করত বায়তুল্লাহ শরীফকে পুনরায় কিবলা নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচ্য আয়াতে করীমা অবতীর্ণ করেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ এ নির্দেশ পাওয়ার দিন বনু সালিমার বিশর ইবনুল বারাহ রাঃ-এর বাড়িতে আমন্ত্রিত ছিলেন। দুপুরে খাবার পর বনু সালামার মসজিদে যুহরের নামাযের তৃতীয় রাকাআতে থাকাবস্থায় কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আসার সাথে সাথে নামাযের মধ্যেই তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এজন্য সে মসজিদটিকে মসজিদে যুল কিবলাতাইন তথা দু'কিবলার মসজিদ বলা হয়ে থাকে।^১

কিবলা পরিবর্তনের পর মদীনার ইহুদি সম্প্রদায় মহানবী ﷺ সম্পর্কে নানা প্রকার উদ্ভট কথা বলতে আরম্ভ করে। এমনকি তারা বলে মুহাম্মদ শিরকের প্রতি আসক্তের কারণে মক্কার মুসলিমদের কিবলা অনুসরণ করছে (নাউযু বিলাহ)। তার এ ব্যাপারে মিথ্য ও ভিত্তিহীন কথা রটাতে থাকে। যদিও আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাবে এ কিবলা পরিবর্তনের ভবিষ্যত বাণী নিশ্চিত জানত। তারপরও তারা শুধু বিরোধিতার জন্যই এ বিরোধিতা করেছে।

কাবার প্রতি রাসূল ﷺ-এর আকর্ষণের কারণ

পবিত্র কাবাঘরকে মুসলমানদের কিবলা করা হোক, এটা মহানবী ﷺ সর্বদা মনে মনে কামনা করতেন। এমনকি এজন্য তিনি মহান আল্লাহ তাআলার

^১ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৫৩৬:

ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَاسْتَدَارَ إِلَيْهِ، وَدَارَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيُقَالُ: بَلَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَ بَشَرَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوفٍ فِي نَبِيِّ سَلَمَةَ، فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا وَحَاتَتْ الظُّهْرَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ وَكُعْبَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكُعْبَةِ، فَاسْتَدَارَ إِلَى الْكُعْبَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ فَسَمَّى الْمَسْجِدَ: مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ.

নিকট প্রার্থনাও করতেন। কাবার প্রতি মহানবী ﷺ-এর ভালোবাসার কিছু কারণ রয়েছে। তা হলো:

১. মহানবী ﷺ কাবার পাশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। জন্মের পর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে কাবার ভেতরে নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। এ জন্য কাবার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল।
২. পরিণত বয়সে তাঁর নুবুওয়তপ্রাপ্তির পর তাঁর প্রথম কিবলাই হল কাবা। এসব আনুষঙ্গিকতার ফলে কাবার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক।
৩. মহানবী ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব, চাচা আব্বাস রাঃ আনহু, আবু তালিব প্রমুখ ছিলেন কাবার সংস্কারক ও সেবক। তা ছাড়া রাসূল রাঃ স্বয়ং কাবা সংস্কারে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজ হাতে মূল্যবান পাথর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করেছিলেন।
৪. মহানবী ﷺ প্রথম থেকেই মিলাতে ইবরাহীমের অনুগামী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে পবিত্র কুরআনে মিলাতে ইবরাহীমের ওপর অটল থাকার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হযরত ইবরাহীম আঃ-এর কিবলা ছিল কাবা। তাই স্বভাবতই ইবরাহীম আঃ-এর কিবলা তাঁর উম্মতের কিবলা হোক এটা তিনি চেয়েছিলেন।
৫. মক্কার মুশরিকরা নিজেদেরকে মৌখিকভাবে হযরত ইবরাহীম আঃ-এর অনুসারী দাবি করত এবং কাবাকে তারা কিবলা হিসেবে গ্রহণ করত। মহানবী ﷺ ভাবলেন কাবাকে কিবলা বানাতে হয়ত মুশরিকরা খুশি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে।
৬. ভৌগোলিক দিক থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের তুলনায় কাবাঘর সবার জন্য অনুকূল্য।
৭. এ কাবাই ছিল পৃথিবীর প্রথম ইবাদতঘর।

সর্বোপরি বলা যায়, কাবাকে কিবলা বানানোর মূলত আলাহরও ইচ্ছা ছিল, তাই রাসূল রাঃ-এর মনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল।

রাসূল রাঃ বার বার আকাশের দিকে তাকানোর কারণ

কাবা মুসলমানদের কিবলা হোক এটাই ছিল রাসূল রাঃ-এর মনের প্রস্তরিক কামনা। তবে নবীগণ কোন দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি না জানা পর্যন্ত কোনো দরখাস্ত পেশ করতেন না। এতে বোঝা নবী করীম রাঃ দুআ করার অনুমতি পূর্বাঙ্কেই পেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি কিবলা পরিবর্তনের দুআ করেছিলেন এবং তা কবুল হবে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন ফেরেশতা জিবরাঈল এ বিষয়ে কোন প্রকার

অহী নিয়ে আসেন কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দু'আ কবুল করার ওয়াদা করা হয়: **فَلَنُؤَيِّدَنَّكَ قَبْلَ تَرْطُهَا ۝** (আমি আপনার চেহারা মুবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন)। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাযিল হয় এই বলে, **فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ** **الْحَرَامِ ۝** এ বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।^১

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۚ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝

‘হে নবী আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েয়েছেন। তোমারা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ তাঁরই দিকে সন্নিবেশিত করবে আর আনুগত্য শুধু তাঁরই প্রতি নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে।’^২

بِالْقِسْطِ দ্বারা উদ্দেশ্য

بِالْقِسْطِ শব্দের অর্থ ন্যায় বিচার, ইনসাফ, বিন্দুমাত্র কমবেশ এবং বাড়াবাড়িমুক্ত মাঝামাঝি অবস্থা। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমতগুলো উল্লেখযোগ্য:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, আয়াতে **بِالْقِسْطِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **كَالْمِيزَانِ ۝**।^৩
২. ইমাম যাহহাক রাঃ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **تَوْحِيدٌ** (একত্ববাদ)।^৪
৩. কারো মতে, প্রকৃতপক্ষে **بِالْقِسْطِ** হলো: **الْوَسْطُ مِنْ كُلِّ أَمْرِ الْمُتَجَانِّ عَنْ طَرَفِي** (প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কমবেশ এবং বাড়াবাড়ি না করে ঠিক মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাকেই **قِسْطٌ** বলা হয়)।^৫

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ১৫৮

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-আরাফ*, ৭:২৯

^৩ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৭, পৃ. ১৮৮

^৪ আস-সালবী, *আল-কাশফু ওয়াল বয়ান*, খ. ৪, পৃ. ২২৭

^৫ আল-বয়যাওয়ায়ী, *আনওয়ায়ীত তানযীল ওয়া আসরারুত তাওয়ায়ীল*, খ. ৩, পৃ. ১০

এর মর্মার্থ

আলোচ্য আয়াতে করীমাটুকুর মর্মার্থ সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমতগুলো প্রণিধানযোগ্য:

১. কারো কারো মতে, আলোচ্য আয়াতে, **وَقْتُ الصَّلَاةِ** শব্দটি **مَسْجِدٍ** (নামাযের সময়) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর **রাঃ** ও ইমাম ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী **রাঃ** বলেন,

وَجَّهُوا وُجُوهَكُمْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

‘তোমরা নামাযের মধ্যে তোমাদের চেহারা কাবার দিকে ফেরাও, যে অবস্থানে তোমরা অবস্থান কর না কেন।’

২. ইমাম যাহ্‌হাক **রাঃ** বলেন,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ عِنْدَ مَسْجِدٍ فَصَلُّوا فِيهِ.

‘যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয় এবং তোমরা মসজিদের নিকট অবস্থান কর, তখন তাতে নামায আদায় কর।’

বস্তুত সদাসর্বদা মহান আলাহর কাছে সাজদা করার নির্দেশ প্রদানই এ আয়াতের লক্ষ্য। ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী **রাঃ** এ মতটিকে প্রধান্য দিয়েছেন।

এর মর্মার্থ

আয়াতে **وَادْعُوهُ** শব্দটির অর্থ: **أَعْبُدُوا** (তোমরা আলাহ তাআলার

ইবাদত কর)। পুরো বাক্যের অর্থ হলো: তোমরা একনিষ্ঠভাবে আলাহর প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত কর। এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর **রাঃ** বলেন, ‘তোমাদেরকে সুদৃঢ়ভাবে আলাহ তাআলার ইবাদত করতে বলা হয়েছে। নবীগণ আলাহর পক্ষ থেকে যেসব মুজিয়া লাভ করেছেন, সেগুলো থেকে শক্তি লাভ করত আলাহর জন্য একান্তভাবে ইবাদত করাই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য।’^২

^১ আল-বগওয়ী, *মা’আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২২৩

^২ ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ৩৬২

সালাত আদায়ের পদ্ধতি

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفَافًا
 أَنْ يُفَتِّنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
 فَأَقْبْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِيفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا
 سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۚ وَلْتَأْتِ طَافِيفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
 وَلِيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
 وَأَمْنِعَتَكُمْ فَيَكُونُونَ عَلَيْكُمْ مَكِيدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
 مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ فَإِذَا أَقَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَى
 جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْقُوتًا ۝


‘১০১. যখন তোমরা জমিনে সফর করবে, তখন নামায সংক্ষেপে করলে কোন গোনাহ নেই। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদের কোন বিপদ ঘটাবে, বিপদে ফেলবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১০২. (হে রাসূল!) আপনি যখন তাদের (মুসলমানদের) মাঝে অবস্থান করেন তাদেরকে (ইমামতির জন্য) নামাযে দাঁড় করান, তখন তাদের একদল যেন আপনার সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং স্ব-স্ব অস্ত্র সঙ্গে রাখে। অতঃপর যখন তারা সাজদা সম্পন্ন করবে, তখন তারা আপনাদের পেছনে চলে যাবে এবং অপরদল যারা নামায আদায় করেননি তারা এসে আপনার সাথে নামায আদায় করবে। তারাও সতর্ককতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে। কেননা কাফিররা আশা করছে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম থেকে অসতর্ক হও, সে সুযোগে তারা তোমাদের ওপর একযোগে আক্রমণ চালাবে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমরা কষ্ট অনুভব কর কিংবা তোমরা অসুস্থ হও, তাহলে অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখলে কোন অসুবিধা হবে না, কিন্তু তোমরা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩. অতঃপর তোমরা যখন নামায সমাপ্ত কর তখন (নামাযের নিয়মানুযায়ী) আলাহকে স্মরণ কর দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে। পরে যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে তখন নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করা হয়েছে।^১

قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَّامًا تَدْعُوْا فَاِنَّهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٠٣﴾

‘হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা আলাহ নামে আহ্বান কর কিংবা রহমান নামে আহ্বান কর, যে নামে আহ্বান কর না কেন তাঁর আছে সুন্দরতম নামসমূহ। আপনি নিজের নামায আদায়কালে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না বরং এ উভয়ের মাঝে একটি পথ অবলম্বন করবে।’^২

শানে নুযূল

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী  বর্ণনা করেন,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ مِنَ التَّجَارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ২১২]، ثُمَّ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَوْلٍ، غَزَا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَمَكْنَكُمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ مِنْ ظُهُورِهِمْ هَلَا شَدَدْتُمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: إِنَّ لَهُمْ أُخْرَىٰ مِثْلَهَا فِي أَثَرِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ২১৩].

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১০১-১০৩

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:১১০

‘হযরত আলী রাঃ থেকে বর্ণিত, বনী নাজ্জাজের কিছু লোক এসে নবী করীম সাঃ এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, হে আলাহর রাসূল! আমরা জমিনের সফর করে থাকি, সেসময় আমরা কিভাবে নামায আদায় করবো? তখন আলাহ তাআলা জঃ **وَإِذَا سَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۝** আয়াতটি নাযিল করেন। উপর্যুক্ত ঘটনার পর দীর্ঘদিন অহী আসা বন্ধ থাকে। এক বছর পর রাসূল সাঃ একটি যুদ্ধে গিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন। তখন মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ এবং তার সাথীদের পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাঃ (তখনো তিনি মুসলমান হননি) বললেন, হে সঙ্গীরা! তোমরা কি তাদের ওপর আক্রমণ করবে না? তখন আরেক ব্যক্তি বলল, এর পরে তো আরেকটি নামায আছে (আসরের নামায), সে সময় তাদেরকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেব। ইত্যবসরে আলাহ তাআলা এ দুই নামাযের মাঝখানে ভয়কালীন নামায আদায়ের বিধান সম্পর্কিত আয়াত: **وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْبْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ۝** নাযিল করেন।^১

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ۝
 قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا وَالرَّحْمَنُ ۝ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত বর্ণনা পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

১. একদিন মুশরিকগণ রাসূল সাঃ কে দেখল যে, তিনি «يَا رَحْمَنُ» বলে দুআ করলেন। তখন মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, মুহাম্মদ আমাদেরকে এক প্রভুর ইবাদত করতে বলে, অথচ সে নিজেই এখন দুই খোদাকে ডাকছে। তখন আলাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, الرَّحْمَنُ এবং اللَّهُ একই সত্তার দুই নাম।^২
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ তখন মক্কায় গোপনে ইসলামের প্রচার চালাচ্ছিলেন। অতঃপর যখনই তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়তেন। আর সে তিলাওয়াত শুনে কাফিররা কুরআন, আলাহ এবং রাসূল সাঃ কে গালমন্দ

^১ (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন*, খ. ৭, পৃ. ৪০৬-৪০৭, হাদীস: ১০৩১৪, (খ) ইবনে আতিয়া, *আল-মুহাব্বারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাব আল-আযীয*, খ. ২, পৃ. ১০৩-১০৪, (গ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৩৬২, (ঘ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ২, পৃ. ৩৫৪, (ঙ) আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৩, পৃ. ১২৯

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১০, পৃ. ৩৪২

করত। তাই আলাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে আলাহ তাআলা মুহাম্মদ আল্লাহ রাসূল-কে মধ্যম স্বরে কুরআন পাঠ করার আদশ প্রদান করেন।^১

৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আল্লাহ তাআলা বলেন, হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদের নামাযের সময় খুব আস্তে স্বরে কুরআন পাঠ করতেন। তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার রবের সাথে কানে কানে কথা বলি আর তিনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত আছেন। পক্ষান্তরে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি শয়তানকে বিভাড়িত করি এবং অন্দারতকে জাগিয়ে দিই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর রাসূল আল্লাহ রাসূল হযরত আবু বকর আস-সিদ্দীক আল্লাহ তাআলা-কে একটু জোরে এবং হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব আল্লাহ তাআলা-কে একটু আস্তে নামায পড়ার জন্য বলে।^২

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলাহ তাআলা বলেন, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (যদি তোমরা জমিনে সফর কর বা ভ্রমণ কর)। আয়াতে ضَرَبَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ: সফর করা। যেমন- আলাহ তাআলা বলেন,

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

‘তোমাদের কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করবে।’^৩

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী আল্লাহ তাআলা বলেন, الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ-এর অর্থ হলো: السَّفَرُ (ভ্রমণ করা)।^৪

সূতরাং যরা ভ্রমণে বের হবে আলাহ তাআলা তাদের ইবাদতের ব্যবস্থা অনেক সহজ করেছেন। যেমন- কসর করা, পানি না পেলে তায়াম্মুম করা ইত্যাদি।

কাসারের বিবরণ

আভিধানিক অর্থ

الْقَصْرُ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এটা قَصَرَ শব্দমূল হতে সংকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ১. সংক্ষিপ্ত করা, ২. কম করা, ৩. খাটো করা, ৪. একটিকে অপরটির মধ্যে মিলানো, ৫. ضِدُّ الطَّوِيلِ (লম্বার বিপরীত)।

^১ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ৩৪৩

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ৩৪৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাযামিল, ৭৩:২০

^৪ ইবনুল জওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, খ. ১, পৃ. ৫৯৬

পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. শরীয়তের পরিভাষায়, সফরকালীন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে দু'রাকাত আদায় করাকে কসর বলা হয় ।
২. ইমাম রাগিব আল-আসফাহানী রাহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন,

وَقَصَّرَ الصَّلَاةَ: جَعَلَهَا قَصِيرَةً بِتَرْكِ بَعْضِ أَزْكَائِهَا تَرْخِيصًا.

‘নামাযকে কসর করা অর্থ নামাযের কিছু রাকন থেকে অব্যাহতি দিয়ে নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা ।’^১

৩. কেউ কেউ বলেন,

قَصَّرَ الصَّلَاةَ: هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي مَكَانٍ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي السَّفَرِ.

‘নামাযকে কসর করা হচ্ছে সফরে চার রাকাত নামাযের জায়গায় দুই রাকাত নামায পড়া ।’

মোটকথা সফরে শরীয়ত নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রমের নিয়ত করলে শর্ত সাপেক্ষে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকাত পড়াকে কসর নামায বলে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার সময় কসর করেছিলেন বলে সহীহ আল-বুখারী শরীফের হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় ।

যদি কোন ব্যক্তি বছরের ছোট তিনদিনের মধ্যম গতিতে (পায়ে হেটে বা উটে চড়ে) চলে অতিক্রম করা যায় এতটা পথ ভ্রমণ করার নিয়ত করে, তবে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির ।

কসর নামাযের বিধান

১. কোন ব্যক্তি সফর অবস্থায় থাকলে তাকে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযগুলো যেমন- যুহর, আসর ও ইশা দু'রাকাত করে পড়তে হয় ।
২. তিন ও দু'রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে কোনো কসর নেই । যেমন- ফজর ও মাগরিব । এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নামাযই আদায় করতে হবে ।
৩. এ ছাড়া কোন সুন্নত, ওয়াজিব ও নফল নামায কসর পড়া যাবে না । এসব নামায না পড়লে চলে, পড়লে পূর্ণই পড়তে হবে ।

সফর অবস্থায় কসর নামায পড়ার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । যা নিম্নরূপ:

ক. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহু আলায়হ ও সাহেবাইনের মতে, সফরে কসর পড়া ওয়াজিব; যদিও সে সফর গুনাহের উদ্দেশ্যে হোক অথবা এতে ভয় থাকুক বা না থাকুক । যেমন- হাদীসে এসেছে,

^১ আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, পৃ. ৬৭৩

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ
الْحَضَرِ».

‘উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,
বাড়িতে কিংবা সফরে যেকোনো অবস্থায় প্রথমে নামায দুই দুই
রাকাআত করে ফরয করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সফরের নামায
দুই রাকাআত ঠিক রাখা হলেও বাড়িতে অবস্থানকালীন নামাযের
রাকাআত সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।’^১

- খ. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-
শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাঃ-এর মতে, সফরে কসর
নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়, বরং ইচ্ছাধীন ব্যাপার। দু’রাকাআত
অথবা পূর্ণ চার রাকাআত উভয়ই বৈধ। তাঁদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো:
পূর্ণ নামায পড়া عَزِمَتْ আর কসর করা رَخِصَتْ। সুতরাং رَخِصَتْ-এর
ওপর প্রধাণ্য দিয়ে عَزِمَتْ-এর ওপর আমল করাই উত্তম।

৪. আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআয় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ৪৮
মাইল বা ৭৭.২৩ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়ত করে, তবে তার
এলাকা ত্যাগ করলেই মুসাফির বলে গণ্য হবে। তার জন্য চার রাকাআত
বিশিষ্ট ফরয নামাযে কসর করা ওয়াজিব। এ নামায ইচ্ছাপূর্বক সম্পূর্ণ পড়লে
গোনাহগার হবে। তবে দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহুদ পরিমাণ বসে থাকলে
মাকরুহ তাহরীমীর সাথে নামায শুদ্ধ হবে। আর না বসলে নামায বাতিল
বলে গণ্য হবে।^২

৫. আল-ফিকহুল মায়সিরে বলা হয়েছে,

- ক. নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রমকারী মুসাফির বলে গণ্য হওয়ার জন্য বালিগ
হওয়া এবং অন্য কারো অনুগামী না হওয়ার শর্ত।
খ. মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম ইমামের পেছনে ইকতিদা করে তবে তাকে
পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। তবে মুসাফির নিজে ইমাম হলে, সে
কসর করবে আর তার মুকীম মুক্তাদীগণ বাকি দু’রাকাআত নামায
কিরাআত ব্যতীত লাহিকের ন্যায় আদায় করবে।

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭৮, হাদীস: ১ (৬৮৫)

^২ আবদুর রহমান আল-জযীরী, আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, খ. ১, পৃ. ৪২৯

গ. মানুষ যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে যেখানে অল্প সময় থাকলেও পূর্ণ নামায পড়তে হয়।^১

কসরের জন্য দূরত্বের পরিমাণ

কতটুকু পথ অতিক্রম করলে নামাযকে কসর করতে হবে, এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন—

১. আহলে জাওয়াহেরের মতে, তিন মাইল পথ অতিক্রম করলে নামাযকে কসর করতে হয়। তাঁদের দলীল হচ্ছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا،
وَصَلَّى الْعَصَرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মদীনায় যুহরের নামায চার রাকাত আদায় করেন এবং যুল ছলায়ফা পৌঁছে আসরের নামায দু’রাকাত আদায় করেন।^২

উল্লেখ্য মদীনা হতে যুলছলাইফা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস رحمهما الله ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمهما الله-এর মতে, এর পরিমাণ ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩ কিলোমিটার। তাঁদের মতে, একদিন একরাতের কম সময়ের সফরে কসর করা যাবে না।
৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী ও ইমাম হাসান আল-বাসারী رحمهما الله-এর মতে, দু’দিন দু’রাত সফরের কমে কসর করা যাবে না।
৪. ইমাম আবু ইউসুফ رحمهما الله-এর মতে দু’দিন দু’রাকাত এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সফর করলে কসর করতে হবে।
৫. ইমামে আযম আবু হানিফা رحمهما الله-এর মতে, যে সফরে পায়ে হেঁটে কিংবা উষ্ট্রযোগে তিনদিন তিনরাত সময় অতিবাহিত হয়, প্রয়োজনে সেখানে কসর করা জরুরি।
৬. আহনাফপন্থি ইমামদের পরবর্তী সংজ্ঞা হলো: তাঁরা তিনদিন তিনরাতের সফরের দূরত্বকে আনুমানিক ৪৮ মাইল নির্ধারণ করেছেন। বর্তমানে এ দূরত্বের ওপরই কসর করা হচ্ছে।

যে সফরে কসর করা যায়

কোনো কোনো ইমামের মতে, নামাযে কসর করার জন্য সফরটি জিহাদ কিংবা দীনী কাজের জন্য হতে হবে। হারাম কিংবা অবৈধ কাজের সফরে কসর

^১ শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আযম আবী হানিফা আন-নুমান*, পৃ. ১৪০

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৫৪৭

করা যাবে না। এটা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর অভিমত। আর ইমামে আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে যেকোনো সফরেই নামাযে কসর করতে হবে।

সফরে কসর করার মেয়াদকাল

এ মাসআলায় ইমামদের মাঝে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসাফির যদি কোথাও একসাথে চারদিন অবস্থাস করার সংকল্প করে, তাহলে তাকে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। তখন আর কসর করতে হবে না।
২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে চার দিনের অধিক অবস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করলে সেখানে কসর করা জাযিয় হবে না।
৩. ইমাম আবদুর রহমান আল-আওয়ায়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, এ অবস্থানের সময়সীমা তের দিন।
৪. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, পনের দিন কিংবা তদোধর্ষ দিন অবস্থান করার নিয়ত করলে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।
৫. আল-ফিকহুল মায়সির প্রণেতা বলেন, মুসাফির বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত কসর করতে হবে। তবে যদি গন্তব্যে ১৫ দিন বা তার বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করে, তাহলে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। আর যদি পনের দিনের চেয়ে কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করে বা অবস্থানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ত না করে তাতে যদি কয়েক বছরও হয়, তবুও তার কসর করতে হবে।^১

কসর বাধ্যতামূলক না ঐচ্ছিক

এই মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, সফরের মধ্যে নামায কসর করা বা না করা নামাযী ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। এটা অনুমোদিত ব্যাপার আবশ্যিক নয়। তাঁর দলীল হচ্ছে,
ক. আলহ তাআলার বাণী:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ

‘যখন তোমরা জমিনে সফর করবে, তখন নামায সংক্ষেপে করলে কোন গোনাহ নেই।’^২

^১ শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আযম আবী হানিফা আন-নুমান*, পৃ. ১৪২

^২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১০১

এখানে বলা হয়েছে, নামাযকে কসর পড়া হলে কোন গোনাহ হবে না। তাই ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ দ্বারা বোঝা যায়, কসর পড়া ওয়াজিব নয়। উভয়টি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। তবে সম্পূর্ণ পড়াই উত্তম।

খ. হযরত আয়িশা রোযাগা থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتَمَّمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبِئِنَّ أَنْتَ وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصَرْتَ وَأَتَمَّمْتُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ!».

‘হযরত আয়িশা রোযাগা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল আল্লাহ-এর সাথে এক রামাযানে ওমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। সে সময়টায় আল্লাহর রাসূল আল্লাহ রোযা ছেড়ে দেন আর আমি রোযা রাখি, তিনি কসর পড়েন আর আমি পূর্ণ নামাযই আদায় করি। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি রোযা ছেড়ে দিয়েছেন আর আমি রোযা রেখেছি, আপনি নামায কসর করেছেন আর আমি পূর্ণ করেছি! নবী করীম আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তুমিই ঠিকই করেছে হে আয়িশা!’”

এই হাদীসে হযরত আয়িশা রোযাগা সফরে পূর্ণ নামায আদায় করেছেন। আর রাসূল আল্লাহ তাকে উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল্লাহ-এর মতে, কসর করা যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু তা না করা মাকরুহ।

৩. ইমামে আযম আবু হানিফা আল্লাহ বলেন, সফরে কসর করা ওয়াজিব। অন্যথায় ব্যক্তি গোনাহগার হবে। তাঁর দলীল হলো:

ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোযাগা থেকে বর্ণিত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোযাগা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নবীর ভাষায় আল্লাহ তাআলা বাড়িতে অবস্থানকালীন

❶ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২০৩-২০৪, হাদীস: ৫৪২৭ ও ৫৪২৯

নামায চার রাকআত, সফরের নামায দু'রাকআত এবং ভীতিকর অবস্থানকালীন নামায এক রাকআত ফরয করেছেন।^১

খ. হযরত ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-এর অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ২১] .

‘আমাকে যদি সুন্নত পড়তে হতো তাহলে আমি ফরয নামাও পূর্ণ পড়তাম। আমি সফরে আল্লাহর রাসূল সঃ-এর সাথে থেকে দেখেছি আমৃত্যু তিনি দুই রাকআতের অধিক পড়েননি। আমি সফরে আবু বকরের সাথে থেকে দেখেছি আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান না করা পর্যন্ত তিনি দুই রাকআত নামাযই পড়েছেন। আমি সফরে হযরত ওমরের সাথে থেকে দেখেছি তিনি দু'রাকআত নামায পড়েছেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন। আমি সফরে ওসমানের সাথে থেকেও দেখেছি আল্লাহ তাআলা তাকেও মৃত্যুদান না করা পর্যন্ত দুই রাকআত নামায পড়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহর রাসূলের জীবনে তোমাদের অনুসরণের উত্তম নমুনা রয়েছে।’^২

আলোচ্য হাদীসগুলোতে সফরে কসর করা আবশ্যিক প্রমাণিত হয়।

ইমামত্রয়ের দলিলের প্রত্যুত্তর

ইমামত্রয়ের দলিলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়:

১. আলাহর বাণী: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ -এর অর্থ এই নয় যে, কসর করলে নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না; বরং এর দ্বারা কসর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
২. আলেমদের কেউ কেউ হযরত আয়িশা রাঃ-এর বর্ণিত হাদীসটিকে ضَعِيفٌ বলে মতপ্রকাশ করেছেন, যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭৯, হাদীস: ৫ (৬৮৬)

^২ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭৯, হাদীস: ৮ (৬৮৯)

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ

আলাহ তাআলা বলেন, ‘যদি তোমরা এরূপ আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদের বিপদে ফেলবে এবং এ অবস্থায় যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তবে নামায অবশ্য আদায় করতে হবে তা থেকে বিরত থাকা যাবে না।’ এ আয়াতে ভয়কালীন নামাযের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এ নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলাহ পাক আরও ঘোষণা করেন,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْبْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِيَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا
 أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۚ وَلْتَأْتِ طَافِيَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يَصَلُّوا
 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
 أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
 كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

‘(হে রাসূল!) আপনি যখন তাদের (মুসলমানদের) মাঝে অবস্থান করেন তাদেরকে (ইমামতির জন্য) নামাযে দাঁড় করান, তখন তাদের একদল যেন আপনার সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং স্ব-স্ব অস্ত্র সঙ্গে রাখে। অতঃপর যখন তারা সাজদা সম্পন্ন করবে, তখন তারা আপনাদের পেছনে চলে যাবে এবং অপরদল যারা নামায আদায় করেননি তারা এসে আপনার সাথে নামায আদায় করবে। তারাও সতর্ককতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে। কেননা কাফিররা আশা করছে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম থেকে অসতর্ক হও, সে সুযোগে তারা তোমাদের ওপর একযোগে আক্রমণ চালাবে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমরা কষ্ট অনুভব কর কিংবা তোমরা অসুস্থ হও, তাহলে অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখলে কোন অসুবিধা হবে না, কিন্তু তোমরা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় আলাহ তাআলা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।’

ভয়কালীন নামাযের সংজ্ঞা

صَلَاةُ শব্দের অর্থ নামায, আর الْخَوْفُ শব্দের অর্থ ভয়, ভীতি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শরয়ী বিধান অনুযায়ী যে সালাত আদায় করে তাকে الْخَوْفُ صَلَاةُ বলে।

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১০২

ভয়কালীন নামাযের আহকাম

صَلَاةُ الْخَوْفِ (ভয়-ভীতি অবস্থায় নামায) আদায়ের বিধান সম্পর্কে

ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন—

১. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, ভয়কালীন নামাযের বিধান সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। যুদ্ধ শুরু হলে ও যুদ্ধকালীন সময়ে এ নামায আদায় করা যাবে।
২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, ভয়-ভীতি অবস্থায় রুকু-সাজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় হলেও নামায আদায় করতে হবে।
৩. কতিপয় আলেমের মতে, আয়াতে ভয়কালীন নামায আদায় করার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তদানুযায়ী আদায় করতে হবে। অর্থাৎ মুসল্লিগণ দুটি দলে বিভক্ত হবেন। একদল এসে ইমামের সাথে এক রাকাআত পড়ে যুদ্ধে চলে যাবেন। অবশেষে দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করবেন এবং এক রাকাআত পড়বেন। পরিশেষে বাকি এক রাকাআত দু'দল একাকী আদায় করবেন।

মুসাফিরের কসরের জন্য ভয়-ভীতি শর্ত কিনা

আলাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (যদি তোমরা কাফিরদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা কর)। এ আয়াতাত্মক তাওয়াফুদ ব্যবহার করা হয়েছে; যাকে আরবীতে حَرْفُ الشَّرْطِ বলা হয়। যার ফলে কোন আলেম মনে করেন, মুসাফিরের জন্য কসর করার শর্ত হলো, ভয়-ভীতি থাকা। অন্যথায় কসর করা তার জন্য বৈধ হবে না। তবে এ ব্যাপারে ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এখানে ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ শর্তটি সফরের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, সে সময় সাধারণ সফরেই মুসলমানদের ভয়ের সম্ভাবনা ছিল। অন্যথায় সকল অবস্থাতেই কসর করতে হবে। যেমন—

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ».

‘হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাহিমাহুল্লাহ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখানে তো আমরা নিরাপদ, তাহলে কসর করব

কেন? জবাবে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযীয়াহু আনহু বলেন, তুমি যে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছ সে ব্যাপারে আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘এটা আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে সদকা বা দান। সুতরাং তোমরা তাঁর দান সানন্দে গ্রহণ কর।’^১

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَنَحْنُ آمِنُونَ لَا نَخَافُ شَيْئًا رَكْعَتَيْنِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নিরপদ অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে দু’রাকাআত নামায পড়েছি।’^২

নামায আদায়ের পদ্ধতি

ফরয নামায আদায়ের পদ্ধতি

আলমা শফিকুর রহমান নদবী *আল-ফিকহুল মায়সিরে* বলেন, তুমি যদি ফরয নামায আদায় করতে চাও, তাহলে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ কর। যথা—

১. দাঁড়িয়ে প্রথমে উদিষ্ট নামাযের নিয়ত কর। অতঃপর দুই হাত কান বরাবর উঠিয়ে তাকবীর বল এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরে নাভীর নিচে রাখ।
২. অতঃপর চুপে চুপে সানা পাঠ কর এবং চুপে চুপে প্রথমে **بِسْمِ اللَّهِ** ও **أَعُوذُ بِاللَّهِ** পাঠ কর। তারপর সূরা পাঠ করে চুপিসারে আমীন বল এবং ছোট তিনটি আয়াত অথবা বড় একটি আয়াত বা অন্য একটি সূরা পাঠ কর।
৩. অতঃপর **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে রুকুতে যাও। সেখানে দু’হাত দিয়ে দু’হাটু মযবুত করে ধরে পিট টানটান রাখ এবং কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পাঠ কর।
৪. অতঃপর **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ** বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাও এবং কমপক্ষে তিন তাসবীহ পর্যন্ত অবস্থান কর। অতঃপর তাকবীর দিয়ে সাজদায় যাও। প্রথমে দু’হাটু তারপর হাত, অতঃপর নাক, পরে কপাল মাটিতে রাখ।
৫. সাজদায় মুখমণ্ডল দু’হাতের মাঝ বরাবর রাখ এবং শান্ত অবস্থায় কমপক্ষে তিনবার সাজদার তাসবীহ পাঠ কর। সাজদা অবস্থায় যেন পেটের সাথে রান

^১ (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৭৮, হাদীস: ৪ (৬৮৬), (খ) আল-জাসাস, *আহকামুল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৩১৭, (গ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৩৬১

^২ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নিফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ২, পৃ. ২০৪, হাদীস: ৮১৬৪

না মিলে এবং হাতের বাহু যেন মাটিতে না মিলে এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুল যেন কেবলামুখী থাকে ।

৬. অতঃপর তাকবীর বলে সাজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে শান্তভাবে বস এবং দু'হাত দু'রানের উপরে রাখ । তারপর তাকবীর দিয়ে প্রথম সাজদার ন্যায় সাজদা কর ।
৭. অতঃপর তাকবীর সহকারে কোন কিছুর সাথে ভর না করে সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাও এবং প্রথম রাকাআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাআত সম্পন্ন কর । তবে দ্বিতীয় রাকাআতে হাত উঠানো, সানা পড়া এবং **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ** পড়া যাবে না ।
৮. এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত সমাপ্ত করে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাঁড়া রেখে বস । অতঃপর দু'হাত রানের ওপর রেখে তাশাহ্‌হুদ পড় ।
৯. নামায যদি দুই রাকাআত বিশিষ্ট হয় তবে তাশাহ্‌হুদের পর দরুদ শরীফ এবং দুআ মাসুরা পাঠ করে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত কর ।
১০. তিন চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাত হলে দু'রাকাআত আদায়ের পর শুধু তাশাহ্‌হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দু'রাকাআত/এক রাকাআত আগের মতো আদায় করে বসে তাশাহ্‌হুদ, দরুদ ও দুআয়ে মাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরাতে হবে । তবে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে না ।^১

এটা হলো ইমাম বা একাকী নামাযীর নামায আদায় পদ্ধতি । তবে নামাযী মুক্তাদী হলে ইকতিদার নিয়ত করে ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমার পর শুধু সানা পড়বে । **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ**, **بِسْمِ اللّٰهِ**, কিরাআত ও **سَلَامٌ عَلَى** পড়তে হবে না ।

সুনুত ও নফল নামায আদায়ের পদ্ধতি

এ দুটি আদায়ের পদ্ধতি ফরয নামাযের ন্যায় । তবে সকল রাকাআতেই সূরা মিলাতে হবে ।

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায আদায় পদ্ধতিও দু'রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের ন্যায় । তবে প্রথম রাকাআতে সানার পর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে রুকু'র আগে তিনটি করে মোট ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে । আর সাথে সাথে কান বরাবর হাত উঠাতে হবে ।

^১ শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির আলা মায়হাবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা আন-নু'মান*, পৃ. ১০২-১০৫

বিতর নামায আদায় পদ্ধতি

তিন রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের মতো এ নামায আদায় করতে হয়। তবে তৃতীয় রাকাআতেও সূরা মিলাতে হয় এবং রুকু যাওয়ার আগে তাকবীরসহ হাত উঠিয়ে তারপর পুনরায় হাত বেঁধে দুআ কুনুত পাঠ করতে হয়।

জুমার নামায আদায়ের পদ্ধতি

দু'রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের ন্যায় এ নামায আদায় করতে হয়।

রুগ্ণ মানুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি

صَلَاةُ الْمَرِيضِ (রুগ্ণ ব্যক্তির নামায)-এর পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. রুগ্ণ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হলে, বসে রুকু-সাজদা করে নামায পড়বে।
২. রুকু ও সাজদা করে নামায পড়তে অক্ষম হলে, ইশারায় নামায পড়বে। রুকুর ইশারা অপেক্ষা সাজদার ইশারায় মাথা একটু বেশি নত করতে হবে। তার দলীল হলো:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا».

‘হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অসুস্থ ব্যক্তির নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, ‘দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হও, তাহলে বসে নামায আদায় কর।’”

৩. বসে নামায আদায় করতে অক্ষম হলে কিবলার দিকে পা রেখে ঘাড়ের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় রুকু-সাজদা করে নামায আদায় করবে। তবে বাহুর ওপর কাৎ হয়ে কিবলার দিকে শুয়ে ইশারায় নামায আদায় করলেও জাযিয় হবে।
৪. যদি অসুস্থ ব্যক্তি এমন মুমূর্ষ হয় যে, নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত সে মাথার ইশারায় নামায পড়তে সক্ষম নয়, তবে নামায পরে আদায় করবে।
৫. চোখ, শ্রু বা মনের ইশারায় নামায আদায় করবে না। কারণ এসব দ্বারা ইশারা করে নামায আদায় শুদ্ধ হবে না।
৬. ইশারায় নামায আরম্ভ করার পর যদি রুকু-সাজদা করার ক্ষমতা ফিরে পায়, তবে তাকে পুনরায় প্রথম থেকে নামায আদায় করতে হবে।

^১ আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৩৭২

ভয়কালীন নামায আদায়ের পদ্ধতি

ভয়কালীন নামায আদায়ের পদ্ধতি অনেকটা যুদ্ধাবস্থার ওপর নির্ভর করে। মহানবী ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নামায আদায় করেছেন। এক্ষেত্রে চারটি নিয়ম বহুল প্রচলিত যেমন—

- **প্রথম নিয়ম:** প্রথম নিয়ম এভাবে হতে পারে যে, সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ ইমামের সাথে মিলে নামায আদায় করবে আর অপর অংশ শত্রুদের সম্মুখে প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে। প্রথম অংশের নামায এক রাকাআত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশের লোক এসে ইমামের সাথে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় রাকাআত পূর্ণ করবে। এতে ইমামের দু'রাকাআত পূর্ণ আদায় হবে আর সৈন্যবাহিনীর হবে একরাকাআত করে।
- **দ্বিতীয় নিয়ম:** একদল সৈন্য ইমামের সাথে এক রাকাআত আদায় করে চলে যাবে আর অপর দল এসে একরাকাআত ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অতঃপর উভয়দলের সৈন্যরা এসেই এক একবার করে নিজের অবশিষ্ট এক রাকাআত নামায এককভাবে আদায় করবে।
- **তৃতীয় নিয়ম:** ইমামের সাথে একদল সৈন্য দু'রাকাআত নামায আদায় করবে এবং তাশাহুদের পর সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। এরপর দ্বিতীয় অংশ তৃতীয় রাকাআতে এসে মিলিত হবে এবং ইমামের সাথে নামায শেষ করে সালাম ফিরাবে। এ নিয়মে ইমামের হবে চার রাকাআত আর সৈন্যদের হবে দু'রাকাআত করে।
- **চতুর্থ নিয়ম:** সৈন্যদের একটি দল ইমামের সাথে এক রাকাআত নামায আদায় করবে। ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য উঠে দাঁড়াবেন, তখন মুক্তাদী নিজেরাই এক রাকাআত তাশাহুদ সহকারে আদায় করে সালাম ফেরাবে। অতঃপর দ্বিতীয়দল ইমামের দ্বিতীয় রাকাআত থাকতে অংশ গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট নামায ইমামের সাথে আদায় করার পর উঠে নিজেরা এক রাকাআত আদায় করবে। এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই দু'রাকাআত করে আদায় হবে।

উহুদের যুদ্ধের পরপরই কুরাইশ দল পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মহানবী ﷺ খবর পেয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করলে সাহাবীগণ হতে জখমের কারণে আপত্তি উঠে। তখন মহানবী ﷺ কারো তোয়াক্কা না করে একাই যোদ্ধা বেশে বের হন। রাসূল ﷺ-এর ধীরচিন্তাই সাহাবীগণও বের হলেন। মহানবী ﷺ আহত অবস্থায় সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত গমন করলে কুরাইশদল সে স্থান ত্যাগ করে পালায়ন করে। আলোচ্য আয়াতে সে ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথম নিয়মটি হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিঃ ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাযিঃ হতে বর্ণিত। দ্বিতীয় নিয়মটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবের লোকেরা এ নিয়মটিকেই গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় নিয়ম ইমাম হাসান আল-বাসারী রাযিঃ ও হযরত আবু বকর আস-সিন্দীক রাযিঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। আর চতুর্থ নিয়মটিকেই ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাযিঃ ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাযিঃ কিছুটা পার্থক্য সহকারে গ্রহণ করেছেন।

তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামায আদায়ের পদ্ধতি

তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামায, যেমন— মাগরিবের নামাযে ইমাম প্রথম দলকে দু'রাকাক আর দ্বিতীয় দলকে এক রাকাআত পড়াবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রথম দল ফিরে বাকি এক রাকাআত এবং দ্বিতীয় দল ফিরে এসে বাকি দু'রাকাসত নামায আদায় করবে।

চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায আদায়ের পদ্ধতি

সেনাবাহিনী যদি মুকিম হয় তাহলে প্রত্যেকদল ইমামের পেছনে দু'রাকাআত করে সালাত আদায় করবে এবং নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক দল পুনরায় ফিরে এসে বাকী দু'রাকাআত সালাত সমাপ্ত করবে।

জামায়াতে সম্ভব না হলে সালাত আদায়ের পদ্ধতি

তবে শত্রুর প্রবল আক্রমণের আশংকা থাকলে বাহনের ওপর বসে ইশারায় সালাত আদায় করতে হবে। যেমন— আলহ তাআলার বাণী:

وَأَنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلَ أَوْ رُكْبَآئَا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا لِلَّهِ كَبَا عَلَيْكُمْ ۖ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

‘অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতঃপূর্বে জানতে না।’^১

সালাতুল ইসতিসকা আদায়ের পদ্ধতি

صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ-এর অর্থ হলো, বৃষ্টির প্রার্থনার নামায। এ নামায আদায় সম্পর্কে বিভিন্ন ইমামের বিভিন্ন মতবাদ আছে। সেগুলো হলো:

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৩৯

১. ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, ইমাম মুসল্লীদের সাথে নিয়ে উনুজ মাটে দু'রাকাআত নামায আদায় করবে। ইমাম নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করবে এবং নামায শেষে দাঁড়িয়ে খুতবা দেবে কিবলামুখী হয়ে। ইমাম চাঁদর উল্টিয়ে গায়ে দেবে, তবে মুক্তাদীগণ চাঁদর উল্টাবে না। অতঃপর সকলে মিলে কান্নাকাটি করে আলাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করে বৃষ্টির প্রার্থনা করবে। তাদের দলীল হলো:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজের চাদরখানি উল্টিয়ে নিলেন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন।’^১

২. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, ইসতিসকার নামায জামায়াতে পড়া সুন্নত নয়। একা পড়লেও জাযিয় হবে। কারণ ইসতিসকা মানে রহমত বর্ষণের দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

সালাতুল কুসূফ আদায়ের পদ্ধতি

সূর্যগ্রহণ শুরু হলে ইমাম লোকজনকে নিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতীত দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করবে। তবে এ সালাত আদায় সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে এ সালাতের দু'রাকাআতের প্রত্যেক রাকাআতে তিন তিনটি রুকুসহ মোট ছয়টি রুকুতে সালাত শেষ করতে হবে। যেমন— হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ».

‘হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে লোকজনকে সাথে নিয়ে চার সাজদায় ছয় রাকাআত নামায আদায় করেন।’^২

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস: ১০১২

^২ (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬২৩, হাদীস: ১০ (৯০৪), (খ) বদরুদ্দীন আল-আইনী, *আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া*, খ. ৩, পৃ. ১৩৭

২. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক রাকাআতে চারটি করে মোট আটটি রকুতে নামায শেষ করতে হবে।
৩. হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রাযীয়াতু'ল্লাহু আলাইহ ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাযীয়াতু'ল্লাহু আলাইহ-এর মতে, এ সালাত প্রত্যেক রাকাআতে দুইটি রকু করে মোট চারটি রকু দ্বারা সালাত শেষ করতে হবে। যেমন- হাদীসে এসেছে, হযরত আয়িশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».

‘মহানবী সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম চার রকু ও চার সাজদাসহ দু’রাকাআত নামায আদায় করেন।’^১

সালাতুল খুসুফ আদায়ের পদ্ধতি

সালাতুল খুসুফ সম্পর্কে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ:

১. অধিকাংশ ইমামের মতে সূর্যগ্রহণের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণের সালাতও জামাআতের সাথে আদায় করতে হবে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: «خَسَفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ রাযীয়াতু'ল্লাহু আলাইহ بِالْبَصْرَةِ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ وَخَطَبَنَا».

‘হযরত হাসান আল-বাসারী রাযীয়াতু'ল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একসময় চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতু'ল্লাহু আলাইহ বাসরায় ছিলেন, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু’রাকাআত নামায পড়েন; প্রতি রাকাআতে দুটো করে রকুবিশিষ্ট। তিনি নামায সমাপ্ত করে সওয়ার হয়ে খুতবা দান করেন।’^২

২. ইমামে আযম আবু হানিফা রাযীয়াতু'ল্লাহু আলাইহ-এর মতে, চন্দ্রগ্রহণের সালাতের জন্য জামাআতের প্রয়োজন নেই একাকী পড়লেই চলবে। যেমন- রাসূল সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর বাণী:

«إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ».

‘ফরয নামায ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে নামায আদায় করে তা-ই উত্তম।’^৩

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬২০, হাদীস: ৫ (৯০১)

^২ আর-রাফিয়ী, *আশ-শরহুল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৭৪

^৩ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৭৩১, হযরত যায়দ ইবনু সাবিত রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

সালাতুল ঈদাইন আদায়ের পদ্ধতি

ইসলামী শরীয়তে দু'ঈদের নামায আদায়ের নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

১. ইমাম মুসলীদেরকে নিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা বলে তাহ বাঁধবে। অতঃপর সানা পাঠ করে তিনবার তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করবে। কিরাআত শেষে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।
২. অতঃপর দ্বিতীয় রাকাআতে প্রথমে কিরাআত পড়বে এবং কিরাআত শেষে তিনবার তাকবীর বলবে ও চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।
৩. তাকবীরে হাত উঠাতে হবে শেষ তাকবীর ছাড়া প্রত্যেক তাকবীরে হাত পাশে ঝুলিয়ে রাখবে।
৪. নামায শেষে ইমাম দুটি খুতবা পাঠ করবেন।
৫. ঈদুল ফিতরের খুতবাতে ইমাম লোকদের সদকায়ে ফিতর এবং তার আহকাম ও মাসআলাসমূহ আর ঈদুল আযহার খুতবাতে কুরাবানীর মাসআলাসমূহ ও তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দেবেন।

সালাতুল জানাযা আদায়ের পদ্ধতি

এ সালাত আদায়ের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. ইমাম মৃতের বুক বরাবর দাঁড়বেন এবং সাধারণ সালাতের ন্যায় নিয়ত বাঁধবে। মুসল্লীগণও অনুসরণ করবে এবং সানা পড়বে তবে সানার মধ্যে وَجَلَ ثَنَاءُكَ-এর পর وَجَلَ ثَنَاءُكَ-এর পর অতিরিক্ত বলতে হবে।
২. এরপর দ্বিতীয় তাকবীর বলে ইমাম দরুদ শরীফ পাঠ করবে।
৩. এরপর তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং মৃত ব্যক্তি ও সকল মুসল্লিদের জন্য দুআ করবে। মৃতব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হলে পড়তে হবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا،
وَذَكَرْنَا وَأُنْشَأْنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ
مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ».

উচ্চারণ: আল-হুম্মাগ্‌ফিরলি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, আল-হুম্মা মান্ আহয়াইতাহ্ মিন্না ফাআহ্যিহী 'আলাল্ ইসরামি, ওয়া মান্ তাওয়াফ্‌ফায়তাহ্ মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহ্ 'আলাল ঈমানি।^১

^১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৮০, হাদীস: ১৪৯৮

আর অপ্রাপ্ত বালক হলে পড়বে:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا».

উচ্চারণ: আলা-হুম্মাজ্‘আল্হু লানা ফারতাওঁ, ওয়াজ্‘আল্হু লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ, ওয়াজ্‘আল্হু শাফিয়াওঁ মুশাফ্ফিয়া ।

এবং বালিকা হলে:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا».

উচ্চারণ: আলা-হুম্মাজ্‘আল্হা লানা ফারতাওঁ, ওয়াজ্‘আল্হা লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ, ওয়াজ্‘আল্হা শাফিয়াওঁ মুশাফ্ফিয়া ।

৪. অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে ।

উল্লেখ্য তাকবীরে তাহরীমা তথা প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য তাকবীরে হাত উঠাতে হবে না ।

এ-এর ব্যাখ্যা

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা সা’দ আত-তাফতযানী রাহমাতুল্লাহি বলেন,

فَإِذَا أَدَيْتُمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبِينِ وَفَرَعْتُمْ مِنْهَا.

‘যখন তোমরা সালাতুল খওফ সম্পন্ন করবে তখন তোমরা সর্বাবস্থায় আলাহ তাআলাকে স্মরণ করবে ।’

কেননা নামায সীমাবদ্ধ সময়ের সাথে । সুতরাং ফরয হওয়ার কারণে আদায় করা অপরিহার্য । প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের প্রায় সকলেই প্রত্যেক অবস্থার জন্য নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ফরয বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহমাতুল্লাহি থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে,

لَمْ يُعَذَّرْ أَحَدٌ فِي تَرْكِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ غَلِبَ عَلَى عَقْلِهِ.

‘আলাহ তাআলা জ্ঞান থাকা অবস্থায় প্রতিটি মুহূর্তের জন্যও যিকর পরিহার করার ব্যপারে কারো পক্ষ থেকে কোন ওয়র আপত্তি গ্রহণ করবেন না ।’^১

^১ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৪, পৃ. ১৯৭

আয়াতে اٰطَاعْتُمْ-এর অর্থ

سَكَنتُ قُلُوبُكُمْ بِرِوَالِ الْ-خَوْفِ (ভয়ভীতি

দূরীভূত হওয়ার পর যখন অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে তখন পূর্ণ নামায আদায় করবে)। যেহেতু পূর্বে সফর ও ভয়ে নামায আদায়ের বিধান আলোচিত হয়েছে, সেহেতু এ আয়াতে اٰطَاعْتُمْ-এর অর্থ হবে মুসাফির অবস্থায় না থাকা, বরং মুকিম হয়ে যাওয়া। আর মুকিম ব্যক্তি পূর্ণ নামায আদায় করবে।

অথবা اٰطَاعْتُمْ-এর অর্থ হবে, দোদুল্যমান অন্তরে অবস্থান না করা, বরং প্রশান্ত অন্তর নিয়ে থাকা। কারণ এখন ভয় দূরীভূত হয়েছে। অতএব ভয় দূরীভূত হলে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। ভয়ের অবস্থায় যা বৈধ ছিল এ অবস্থায় তা বৈধ হবে না।

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا-এর ব্যাখ্যা

আলহ তাআলা বলেন, وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (হে নবী! আপনি আপনার নামাযকে উচ্চৈঃস্বরে করবেন না এবং নিম্নস্বরেও করবেন না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন)।

এ আয়াত কোন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ তা নিয়ে মুসাফিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা-এর মতে, এ আয়াতটি ফরয নামাযের কেবল প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।
২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রাযিআল্লাহু আনহু-এর মতে, এ আয়াতটি তাহাজ্জুদের নামাযের কিরাআত প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

মূলত এখানে কোন নামাযে কেমন করে নামায পড়বে, তার ইঙ্গিত বিদ্যমান। প্রথমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ফরয নামাযে জোরে জোরে কিরাআত পাঠ করতেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে জানা যায় এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের নামাযে যোহর ও আসর আস্তে কিরাআত পাঠ করতেন এবং রাতের নামাযে (মাগরিব, ইশা, ফযর) জোরে জোরে কিরাআত পাঠ করতেন।

ফুকাহায়ে কেরামের মতানুযায়ী এভাবে অর্থাৎ যোহর ও আসরে আস্তে এবং মাগরিব, ইশা ও ফযরে জোরে জোরে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। আর সুন্নত বা নফল নামাযেও আস্তে কিরাআত পড়া উচিত। তবে তাহাজ্জুদের কিরাআতের ব্যাপারে মুসল্লি সম্পূর্ণই স্বাধীন। তবে যে সকল নফল নামায জামাআতে পড়া হয় যেমন— তারাবীহ ও খসুফের নামায তাতে জোরে জোরে কিরাআত পড়া কর্তব্য। অনুরূপ ঈদের নামায ও রামাযানের তারাবীহর নামাযেও কিরাআত জোরে জোরে পড়া কর্তব্য।

সালাতে কুরআন পাঠের আবশ্যিকতা এবং তাহাজ্জুদের সালাত

সালাতের ৬টি রুকনের মধ্যে অন্যতম হলো কিরাআত পাঠ করা। সালাতে কুরআন থেকে কিছু অংশ পাঠ করা ফরয। এরূপ পাঠের অনেক ফযীলত রয়েছে। বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন পাঠ সম্পর্কে আল-কুরআনেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ قُمِ الْبَيْتَ الْاِقْلِيلًا ۚ ۝ نَصْفَهُ ۚ اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۚ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ

‘হে বস্তাবৃত! রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে আপনি জাগরণ করুন। অথবা জাগরণ করুন, অর্ধরাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে বেশি এবং তারতীলসহ কুরআন তিলাওয়াত করুন।’^১

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

‘আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্য জেগে থাকেন কখনো রাতের প্রায় দু’তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও একতৃতীয়াংশ সময় অবশ্যই আর আপনার সঙ্গীদের একটি দলও জেগে থাকেন। আলাহ দিন ও রাতের সময় হিসাব রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ন হয়েছেন। অতএব কুরআন থেকে যতটুকু তোমাদের সহজ লাগে, ততটুকু তোমরা তিলাওয়াত কর। কেননা তিনি জানেন তোমাদের

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাযামিল, ৭৩:১-৪

মধ্যে কতটুকু অসুস্থ হবে, কতেক আলাহর অনুগ্রহ সন্ধান পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে এবং কতেক আলাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকবে। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য ভালো থেকে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আলাহ তাআলার কাছে পাবে। এটা হলো উত্তম এবং মহাপ্রতিদান। তোমরা আলাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আলাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।^১

মূল আলোচনা

সূরা আল-মুয্যাম্মিলের আলোচ্য আয়াতসমূহে মহানবী ﷺ-কে সম্মোদন করে তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রথমত রাতের অর্ধেক বা তার কিছু কম বা বেশি সময়ের জন্য এ নামাযের নির্দেশ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সূরার শেষে এ নির্দেশ কিছুটা শিথিল করে ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাতে যে পরিমাণ সহ্য হয়, সে পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযূল

এ আয়াতসমূহের শানে নুযূল প্রসঙ্গে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন—

১. পবিত্র রামাযান মাসে সর্বপ্রথম হেরা গুহায় রাসূল ﷺ-এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল عليه السلام আগমন করে সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এ অবতরণ ও অহীর ঘটনাছিল প্রথম পর্যায়ে। ফলে এর পতিক্রিয়া দেখা যায়। রাসূল ﷺ হযরত খদীজা عليها السلام-এর নিকট গমন করেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বলেন, «رَمَلُونِي رَمَلُونِي» (আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও)।^২ এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অহী আগমণ বন্ধ থাকে। বিরতির এ সময়কালকে বলে, فَرْقٌ الْوَحْيِ। এরপর একদিন রাসূল ﷺ পথচলা অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, হেরা গুহার ফেরেশতা আকাশ ও জমিনের মাঝখানে একটি বুলন্ত চেয়ারে বসা আছেন। তাকে এ আকৃতি দেখে নবী করীম عليه السلام প্রথম

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল, ৭৩:২০

^২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭, হাদীস: ৩, (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৪০, হাদীস: ২৫২ (১৬০)

সাক্ষাতের ন্যায় ভয় পেয়ে গেলেন এবং গৃহে ফিরে এসে লোকজনকে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। তখন এ সূরা নাযিল হয়।^১

২. হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فِي دَارِ النَّدْوَةِ، فَذَكَرُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَاحِرٌ، قَالُوا: لَيْسَ بِسَاحِرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَاهِنٌ، قَالُوا: لَيْسَ بِكَاهِنٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَجْنُونٌ، قَالُوا: لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، قَالُوا: يُعْرِقُ بَيْنَ الْحَبِيبِ وَحَبِيبِهِ، فَصَدَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى ذَلِكَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَرَمَلَ فِي ثِيَابِهِ، وَذَثَرَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ، يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾».

‘হযরত জাবির রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার কাফির মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি মন্দ উপাধি স্থির করার উদ্দেশ্যে দারুন নদওয়াতে বৈঠকে মিলিত হয়। তাদের কেউ প্রস্তাব দিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যাদুকর বলা হোক। আবার কেউ প্রস্তাব দিল পাগল বলা হোক। এ সংবাদ শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদর মুড়ি দিয়ে চিস্তিত হয়ে শুয়ে রইলেন। তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এই আয়াতসমূহ নাযিল করেন।^২

৩. হযরত আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয করা হলে আদেশ পালনার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পদদ্বয় ঝুলে যেত এবং আদেশ আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মাণ হতো। অতঃপর এক বছর পর এ সূরার শেষ আয়াত **إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ** নাযিল হয়।^৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন, **فَاقْرَءْ مَا يَنْشُرُ مِنْهُ** আয়াত অবতীর্ণ হলে, দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বিধান রহিত হয়ে যায় এবং বিষয়টি ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট।^৪

^১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪১৩

^২ আত-তাবারানী, *আল-মুজাম্মুল আওয়াত*, খ. ২, পৃ. ৩১৯, হাদীস: ২০৯৬

^৩ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন*, খ. ২৩, পৃ. ৩৬০

^৪ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২, হাদীস: ১৩০৪

৪. হযরত আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত জিবরাঈল আলয়হিস সালাম সর্বপ্রথম হেরা গুহায় অহি নিয়ে আগমন করেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্র শীত অনুভব করেন। বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত খাদীজা রাঃ বলেন, আমাকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও এবং চাঁদের জড়িয়ে দাও। এ অবস্থায় এ আয়াতে করীমাটুকু অবতীর্ণ হয়: **يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْاَيْلُ ۖ قُمْ اَيْلُ ۙ** ১

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. **قُمْ اَيْلُ ۙ** আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্ধ রাত অথবা তার চেয়ে কিছু কম কিংবা তার চেয়ে বেশি জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগি করুন।’ এ আয়াতের দ্বারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাহাজ্জুদের নামাযকে ফরয করা হয়েছিল। সূরাটি মাক্কী এবং প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে এক বছর পর সূরাটির শেষ আয়াত অবতীর্ণ হলে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাহাজ্জুদ নামায পড়ার বিধানকে রহিত করে দেওয়া হয়। অতঃপর মিরাজ রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের বিধান নাযিলের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের আবশ্যিকতা রহিত করে তাহাজ্জুদ নামায সুন্নত করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়িশা রাঃ বলেন, সূরার প্রথমোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মত সকলের জন্য ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর এক বছর পরে সূরার শেষ আয়াত দ্বারা সকলের জন্য এর আবশ্যিকতা রহিত করা হয়।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল

সূরা আল-মুয্যাম্মিলের প্রথম রুকুটির অবতীর্ণের সময়কাল সম্পর্কে সম্মানিত মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, সূরার প্রথম রুকুটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়তের সূচনালগ্নে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সূরাটির দ্বিতীয় রুকু অবতীর্ণের সময়কাল নির্ণয়ে দু’টি অভিমত ব্যক্ত হয়। যথা—

১. অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের অভিমত হলো: সূরাটির দ্বিতীয় রুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে।
২. কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, দ্বিতীয় রুকুসহ সমগ্র সূরাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুয্যাম্মিল বলে সম্বোধনের কারণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে **مُرْتَلٍّ** বলে সম্বোধন করার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা—

১ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ১০, পৃ. ১০২

১. মহানবী ﷺ-এর প্রতি মহান আল্লাহর কৃপা ও সহানুভূতি প্রকাশার্থে তাঁকে
 يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আরবরা কোন লোকের প্রতি স্নেহ-
 ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাৎক্ষণিক অবস্থার ভিত্তিতে এরূপ সম্বোধন করে
 থাকে।
২. অথবা মহানবী ﷺ হেরাণ্ডহায় প্রাথমিক অহিপ্রাপ্ত হয়ে কুরআনের প্রভাবে
 প্রভাবান্বিত হয়ে বাড়িতে এসে স্বীয় স্ত্রী খদিজা রাঃ-কে বললেন, «رَمَلُونِي»
 «رَمَلُونِي» (আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও)।^১
 অতঃপর তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা
 তাঁকে অভয় দানের নিমিত্তে এভাবে সম্বোধন করেন, يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ।

৩. মহানবী ﷺ-কে يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ বলে সম্বোধন করার কারণ সম্পর্কে হযরত
 ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর রাঃ বলেন,

يَأْمُرُ تَعَالَى رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَتْرُكَ التَّرْمُلَ وَهُوَ التَّغَطِّي فِي اللَّيْلِ وَيَنْهَضُ
 إِلَى الْقِيَامِ لِرَبِّهِ ﷻ.

‘মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলকে কাপড় মুড়িয়ে থাকা তথা রাতে
 বস্ত্রাবৃত হয়ে অবস্থান ত্যাগ এবং মহান প্রতিপালকের জন্য জেগে
 ওঠার নির্দেশ দেন।’^২

৪. অথবা গভীর রাতের নিদ্রা পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর ইবাদতের মশগুল
 হওয়ার জন্য সমস্ত চাদরাবৃত শয্যাগ্রহণকারী লোকদের সতর্ক করে এরূপ
 সম্বোধন করা হয়েছে।
৫. অথবা মহানবী ﷺ নুবুওয়তের মহান দায়িত্ব সত্ত্বেও আরামে নিদ্রায় গেলে
 মহান আল্লাহ তাঁর দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করার নিমিত্ত সম্বোধনপূর্বক বলেন,
 يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ।

فَتْرَةُ الْوَحْيِ-এর পরিচয়

فَتْرَةُ الْوَحْيِ একটি যৌগিক শব্দ। এতে শব্দটি একবচন, বহুবচন فَتْرَةُ-এর
 অর্থ হলো: বিরতি, বিরাম ইত্যাদি। আর الْوَحْيُ শব্দটি বাবে-ضَرَبَ-এর মাসদার;

^১ (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৭, হাদীস: ৩, (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৪০,
 হাদীস: ২৫২ (১৬০)

^২ ইবনে কসীর, *তাকসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৮, পৃ. ২৬০

যার অর্থ প্রত্যাদেশ, ঐশী বাণী। সুতরাং فَتْرَةُ الْوَحْيِ-এর অর্থ হলো: অহির বিরতি বা বিরাম।

পরিভাষায় সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসূল ﷺ-এর নিকট যে কয়দিন অহী আগমণ বন্ধ ছিল, সে সময়কে বলে فَتْرَةُ الْوَحْيِ।

কাফির কর্তৃক প্রদত্ত মহানবী ﷺ-এর উপাধি

নুবুওয়তের পূর্বে কাফিররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিশ্বাসী বলেই জানত। কিন্তু অহীর আগমন শুরু হলে তারা নবী করীম ﷺ-কে যে উপাধিতে অভিহিত করে তা হলো:

১. كَاهِنٌ (গণক),
২. مَجْنُونٌ (পাগল) ও
৩. سَاحِرٌ (যাদুকর)।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

আভিধানিক অর্থ

إِزَالَةُ النَّوْمِ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ-এর মাসদার। এ আভিধানিক অর্থ: إِزَالَةُ النَّوْمِ (কষ্টের মাধ্যমে নিদ্রা দূর করা, রাত জাগরণ করা, রাতের বেলায় ইবাদত করা, তাহাজ্জুদ নামায পড়া, নিদ্রা থেকে উঠা ইত্যাদি)। তবে শব্দটি নিদ্রা যাওয়া এবং জাগ্রত হওয়া এ পরস্পর বিরোধী দুটি অর্থে ব্যবহার হয়।

পারিভাষিক অর্থ

১. কেউ কেউ বলেন, রাতের বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে নামায পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলে।
২. কেউ কেউ বলেন, هُوَ التَّطَوُّعُ بَعْدَ النَّوْمِ (নিদ্রা যাওয়ার পর উঠে যে নফল নামায আদায় করা হয় তাকে)।
৩. ইমাম হাসান আল-বাসারী رحمته الله বলেন,

هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ.

‘ইশার পর আদায় করা হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পাদ্রতিতে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়া হয়, এমন নামাযই।’^১

^১ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৫, পৃ. ৯৪

তাহাজ্জুদ নামাযের সময়কাল

তাহাজ্জুদের মাসনুন সময় হলো, ইশার নামাযের পর ঘুমাবে। অতঃপর অর্ধেক রাতের পর উঠে নামায পড়বে। ইশার নামাযের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাযের সময়। তবে রাতের অর্ধাংশ চলে যওয়ার পর থেকে ফজরের সময়ের পূর্বে ছয় ভাগের এক ভাগ বাকি থাকতে পড়া হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়। কারণ এ সময় রহমত নাযিল হয় এবং দুআ কবুল হয়।

নিদ্রা থেকে জাগ্রত না হয়ে একাধারে সজাগ থেকে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলে তা আদায় হবে না এমনটা নয়। তবে সাধারণত সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল ﷺ শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদের নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

ফরজ নামাযের পর তাহাজ্জুদের গুরুত্ব অনেক বেশি। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

কুরআনের আলোকে

১. **আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে উৎসাহ:** তাহাজ্জুদের নামায পড়ার ব্যাপারে আলাহ তাআলাই উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেহেতু উম্মতকে নবীর আনুগত্য করার হুকুম করা হয়েছে, সেহেতু তাহাজ্জুদের তাগিদ পরোক্ষভাবে গোটা উম্মতের জন্য করা হয়েছে। যেমন— আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ قُمِ الْاَيْلَ الْاَقْبِلَا ۝

‘হে বস্ত্রাবৃত! রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে আপনি জাগরণ করুন।’

২. **তাহাজ্জুদের নামায পড়া উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম:** কুরআন মজীদে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যারা এ নামায আদায় করে তাদেরকে আলাহ পাক উচ্চমর্যাদা লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আলাহ তাআলা বলেন,

وَمِنَ الْاَيْلِ فَتَهَجِّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

‘আর রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ে থাকুন। এটা আপনার জন্য আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ফযল ও করম। অচিরেই আপনার পতিপালত আপনাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) প্রতিষ্ঠিত করবেন।’^২

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাযামিল, ৭৩:১-৪

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৯

৩. তাহাজ্জুদের নামায আদায় কামেল মুমিনের পরিচয়: তাহাজ্জুদের নামায উম্মতের জন্য অতিরিক্ত ইবাদত; যা আলাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মুমিনের পরিচয় পাওয়া যায়। আলাহ তাআলা বলেন,

تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٩﴾

‘বিছানা থেকে তাদের পার্শ্বদেশ পৃথক থাকে। তারা (জাগ্রত হয়ে) ভয় ও আশার সাথে স্বীয় রবকে ডাকে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।’^১

৪. তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ মুত্তাকী: যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদের আমল করেন, কুরআনে তাদেরকে মুহসিন এবং মুত্তাকী নামে অভিহিত করে তাদেরকে আলাহর রহমত ও পরকালের চিরন্তন সুখ-সম্পদের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন- আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّبِيلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٢١﴾

‘তারা রাতে অল্প ঘুমাত এবং শেষ রাতে ইস্তিগফার করত।’^২

৫. মন ও চরিত্রকে নির্মল ও পবিত্র করার মাধ্যম: তাহাজ্জুদ নামায মন ও চরিত্রকে নির্মল ও পবিত্র করার এবং সৎপথে অবিচল থাকার জন্য অপরিহার্য এবং কার্যকর পন্থা। যেমন- ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٢٢﴾

‘রাতে ঘুম থেকে উঠা মনকে দমিত করার জন্য খুব বেশি কার্যকর এবং সে সময়ের কুরআন পাঠ বা যিকর একেবারে যথার্থ।’^৩

৬. তাহাজ্জুদ আদায়কারী আলাহর প্রিয় বন্দা: যারা তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করেন, তারা নিসন্দেহে আলাহর প্রিয় বন্দা। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَشْهَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوًّا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٢٤﴾

^১ আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদা, ৩২:১৬

^২ আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:১৭-১৮

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাশ্শিল, ৭৩:৬

‘আল্লাহর প্রকৃত বন্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে আস্তে আস্তে চলে ।
আর অজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে, তখন তারা
তাদেরকে সালাম দিয়ে বিদায় করে । আর যারা তাদের
প্রতিপালকের সাজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটায় ।’^১

হাদীসের আলোকে

১. তাহাজ্জুদে নেক্কার মানুষের অভ্যাস: মুমিন মাত্রই নেক্কার বা
ভালোকাজের প্রতি আগ্রহশীল ও যত্নশীল । তাই সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু
করে সকল আলেমই এ নামায যথাযথভাবে আদায় করেছেন, যা তাদের
অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল । যেমন—

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ،
فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ
لِّلْسَيِّئَاتِ، وَمَنْهَاجٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطْرَدَةٌ لِّلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ».

‘হযরত আবু উমামা আল-বাহিলী রাযিয়ার্হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের ওপর তাহাজ্জুদের নামায পড়া
কর্তব্য । কেননা এটা পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের অভ্যাস, প্রভুর নৈকট্য
অর্জনে সহায়ক, পাপ মোচনকারী, অপরাধ প্রবণতা থেকে বাঁধা
দানকারী এবং শরীর থেকে রোগ দূরকারী ।’^২

২. তাহাজ্জুদে গোনাহ মাফ হয়: তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে আদায়কারীর
গোনাহ মাফ হয়ে যায় । যেমন— আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ
الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَ فِي
الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ».

‘হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়ার্হু আনহু ও হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়ার্হু আনহু
থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যদি
কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায় এবং সে ঘুমে বেশি
আক্রান্ত হলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় । অতঃপর তারা যদি দু’জনে

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬৩-৬৪

^২ (ক) আত-তাবারানী, আল-মুজামিল কবীর, খ. ৮, পৃ. ৯২, হাদীস: ৭৪৬৬, (খ) আল-মুনযিরী, আত-
তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ১, পৃ. ২৪২, হাদীস: ৯১৯

উঠে রাতের কিছু সময় নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”^১

৩. ফরযের পর সর্বোত্তম নামায: একজন মুমিন বন্দার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো, ফরয নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। এরপরই যে নামায গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো তাহাজ্জুদের নামায। যেমন- হযরত আবু হুরায়রা রাযি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সালাতু ওয়াসালম বলেন,

«وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

‘ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো তাহাজ্জুদের নামায।’^২

৪. তাহাজ্জুদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ হয়: যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ... فَأَنْشِئْ بَعْمَلٍ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطِبِ الْكَلَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَتَمَّ بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছুর সন্ধান দিন, যা আমাল করলে আমি বেহেশতে যেতে পারি। তিনি বললেন, ‘তুমি অপরকে খাবার খাওয়াবে, সালামের প্রসার ঘটাবে, আত্মীয়তা রক্ষা করবে এবং মানুষ যখন ঘুমে থাকে তখন জেগে নামায পড়বে। তাহলে নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে। এ আয়াতে চারটি আমলকে জান্নাত লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে।’^৩

৫. বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ: যারা তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করবে, তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَرِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُخْشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ، فَيَقُولُ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى

^১ (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১৩০৯, (খ) আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ২৪২, হাদীস: ৯২২

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮২১, হাদীস: ২০২ (১১৬৩)

^৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৬, পৃ. ২৫২, হাদীস: ১০৩৯৯

جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَغِيرَ حِسَابٍ».

‘হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ রাযীয়াতুহা আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘কিয়ামতের দিন একই ময়দানে সকলকে সমবেত করা হবে। অতঃপর বলা হবে যাদের পিট বিছানা থেকে আলাদা থাকত তারা কোথায়? তখন অল্প সংখ্যক লোক দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে।’^১

৬. তাহাজ্জুদ নামায মুমিনের সম্মান: তাহাজ্জুদ নামায হলো মুমিনের সম্মান কেননা এর দ্বারা আলাহ তা’ আলা মুমিন ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। যেমন- হাদীসে আছে, হযরত সাহল সা’দ রাযীয়াতুহি আনহু থেকে বর্ণিত,

«وَأَعْلَمَ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ»

‘জেনে রাখ, মুমিনের সম্মান তাহাজ্জুদের নামাযে, আর তার ইজ্জত হচ্ছে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যে।’^২

৭. অল্প হলেও এ নামায আদায় আবশ্যিক: তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যথাসম্ভব এ নামায অল্প হলেও আদায় করা জরুরি। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুহি আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَةً».

‘তোমাদের তাহাজ্জুদ নামায এক রাকাত হলেও আদায় করা উচিত।’^৩

৮. তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করা অনুচিত: তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করা কোন মুমিন ব্যক্তির উচিত নয়। কেননা ফরয নামায বাদে অন্যান্য নামায থেকে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এ নামায থেকে বিরত থাকেন নি। যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে,

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «لَا تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدْعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرَضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا».

^১ আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৪, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯, হাদীস: ২৯৭৪

^২ আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৪২৭৮

^৩ আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল কবীর*, খ. ১১, পৃ. ২১২, হাদীস: ১১৫৩৩

‘হযরত আয়িশা রাযীয়াতুহা আনহা বলেন, তুমি তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করবে না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনও ছাড়তেন না। তিনি কখনও অসুস্থ হলে বা খারাপ লাগলে, বসে বসে এ নামায আদায় করতেন।’^১

৯. শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যম: তাহাজ্জুদ নামায না পড়লে তার ওপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার করে। তাই শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা আবশ্যিক। যেমন— হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنِهِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউস রাযীয়াতুহা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বলা হলো, অমুক ব্যক্তি সুবহে সাদেক পর্যন্ত ঘুমায়, রাতে কোন নামায পড়েন না। তিনি বললেন, ‘সেই ব্যক্তির কানে শয়তান পস্রাব করেছে।’^২

১০. মন প্রফুল্ল রাখার উপায়: তাহাজ্জুদ নামায পড়লে মন প্রফুল্ল থাকে। যেমন— হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় শয়তান তার মাথার ওপর তিনটি গিট দেয় এবং প্রত্যেক গিটের ওপর ‘এখনও রাত আছে, ঘুমাও’ এ মর্মে সীল মেরে দেয়। যদি সে জাগ্রত হয়ে আলাহকে স্মরণ করে, তবে একটি গিট খুলে যায়। আর অযু করলে দ্বিতীয়

^১ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১৩০৯

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১২২, হাদীস: ৩২৭০

গিটিটি খুলে যায়। অতঃপর (তাহাজ্জুদের) নামায পড়লে তৃতীয় গিটিটিও খুলে যায় এবং সে সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত মন দিয়ে সকাল করে, অন্যথায় অলস ও খারাপ মন নিয়ে সকাল করে।”^১

তারতীলের বিবরণ

رُنْلُ শব্দটি رُنْلُ মাদ্দাহ থেকে নিসৃত বাবে تَفْعِيلُ-এর মাসদার। এর

আভিধানিক অর্থ হলো:

১. যত্ন সহকারে জমা করা।
২. ধীর গতিতে আবৃত্তি করা।
৩. সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা।
৪. ধারাবাহিকভাবে উচ্চারণ করা।
৫. আল-মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে تَرْتِيلُ অর্থ جَوْدٌ لَا وَتَهُ (সমৃদ্ধ উচ্চারণ ও তিলাওয়াত)।^২
৬. সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। আরও সহজ ভাবে বলা যায়,

هُوَ تَحْسِينُ الصَّوْتِ وَخَفْضُهُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ.

‘কিরআতের ক্ষেত্রে স্বরে থেমে থেমে ও সুন্দর করাকে তারতীল বলে।’

পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনুল করীমকে তার মাখরাজ, গুল্লাহ, মাদ এবং অন্যান্য নিয়ম অনুযায়ী ধীরস্থিরভাবে পরিস্কার উচ্চারণে তিলাওয়াত করাকেই তারতীল বলা হয়।

وَرْتِلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا-এর উদ্দেশ্য

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘হে নবী ﷺ! আপনি দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত না করে বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে উচ্চারণ করুন।’ আলাহ তাআলার বানী وَرْتِلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. তাহাজ্জুদের নামায, কিরাআত, তাসবীহ, রুকু-সাজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কুরআন তিলাওয়াত। এ কারণে সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত অধিক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীদেরও এরূপ অভ্যাস ছিল।

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৫২, হাদীস: ১১৪২ ও খ. ৪, পৃ. ১২২, হাদীস: ৩২৬৯

^২ সম্পাদকমণ্ডলী, আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ. ১, পৃ. ৩২৭

২. কেবল কুরআন পাঠই কাম্য নয়, বরং তারতীল তথা সরল ও সহজভাবে আদায় করাই কাম্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই পাঠ করতেন। হাদীসে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাতে প্রত্যেকটি হরফ সুস্পষ্ট ছিল।
৩. তাজবীদসহ সুললিত কণ্ঠেও কুরআন তিলাওয়াত করা তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».

‘হযরত আল-বারা ইবনে আযিব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেন, ‘তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুললিত কণ্ঠ দ্বারা সজ্জিত কর।’^১

وَسَمِعَ عَلْقَمَةَ رَجُلًا يَقْرَأُ قِرَاءَةً حَسَنَةً، فَقَالَ: لَقَدْ رَتَّلَ الْقُرْآنَ، فُذَاهُ أَبِي وَأُمِّي.

‘হযরত আলকামা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখে বললেন, আমার পিতা-মাতা তার জন্য উৎসর্গিত হোক। কেননা সে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করছে।’^২

رَوَى الْحَسَنُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ آيَةً وَيَبْكِي، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ ﷻ: وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا هَذَا التَّرْتِيلُ».

‘ইমাম হাসান আল-বাসারী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কেঁদে কেঁদে বুঝে, আস্তে ও তারতীলসহ একটি আয়াত পাঠ করেছিল। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবী করীম সঃ বললেন, ‘এটাই তারতীল।’^৩

মোটকথা তাজবীদ ঠিক রেখে সুন্দর কণ্ঠে অর্থ বুঝে আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করাকে তারতীল বলে। তারতীল অনুযায়ী কুরআন পড়া ফরয।

فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ-এর ব্যাখ্যা

আলাহ তাআলা বলেন, (কুরআন থেকে যা সহজ হয়

^১ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৭৪, হাদীস: ১৪৬৮

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৬, পৃ. ৩৮

^৩ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১৬, পৃ. ৩৭-৩৮

তা তোমরা তিলাওয়াত কর)। এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল করীম থেকে যা অতি সহজ তা তিলাওয়াতই বিধান ও উত্তম।

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمہ اللہ বলেন, এ আয়াত দ্বারা নামাযে কিরাআত পড়া ফরয বলে প্রমাণিত হয়।^১

তাফসীরে *রুহুল মাআনী*তে বলা হয়েছে, ইমামে আযম আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর মতে, এ আয়াত দ্বারা নামাযে যেকোনো কিরাআত পড়ার আবশ্যিকতা প্রমাণিত হয়, যা মুসলির নিকট সহজতর।^২

নামাযের মধ্যে কিরাআতের সর্বনিম্ন পরিমাণ

এ প্রসঙ্গে ইমামদের মধ্য থেকে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা—

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رحمہ اللہ-এর মতে, ফরয ও নফল নামাযে ফরয কিরাআতের পরিমাণ হলো: সূরা আল-ফাতিহা ব্যতীত লম্বা এক আয়াত। যেমন— আলহ তাআলা বলেন,

فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ

‘অতএব কুরআন থেকে যতটুকু তোমাদের সহজ লাগে, ততটুকু তোমরা তিলাওয়াত কর।’^৩

এ আয়াতে সাধারণত কিরাআত পাঠের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা رضی اللہ عنہ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

«تَمَّ أَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

‘অতঃপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে।’^৪

২. সাহেবাইনের মতে, ছোট তিন আয়াত কিংবা বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয।
৩. ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী رحمہ اللہ-এর মতে, এক আয়াত পরিমাণ পাঠ করা ফরয। ইমাম কাযী মুহাম্মদ ইবনুল আরবী رحمہ اللہ-এর মতে, ৩ আয়াত পরিমাণ পড়াই সহজতরের সর্বনিম্ন।

নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার বিধান

এ প্রসঙ্গেও ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য আছে,

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৯, পৃ. ৫৭

^২ আল-আনুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ১৫, পৃ. ১২৪

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুযাম্মিল*, ৭৩:২০

^৪ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস: ৭৫৭

১. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিযী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। আর আয়াতে সহজতর বলে যা বোঝানো হয়েছে, তা দ্বারা সূরা ফাতিহাই উদ্দেশ্য। যেমন-হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

‘হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, ‘সূরা আল-ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না।’^১

২. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। আর সাধারণ কিরাআত পড়া ফরয। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ».

‘হযরত আবু হুরাইরা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যেসব নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়া হয় না তা অসম্পূর্ণ।’^২

প্রত্যুত্তর

ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ থেকে ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিযী রাহিমাহুল্লাহ-এর দলীলে বলা হয়, তাদের বর্ণিত হাদীস: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»-এর প্রকৃত অর্থ হলো: ‘সূরা আল-ফাতিহা ছাড়া নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না’।^৩

সুতরাং নামাযে কিরাআত পড়া ফরয হলেও তা নির্ধারিত নয়, বরং মুসল্লির জন্য যা সহজ তাই সে পড়বে। আর সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার বিধান

সকল ইমাম ও আলেমের ঐকমত্যে, ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিরাআত পঠন সংক্রান্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

^১ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ২, পৃ. ৩৭১, হাদীস: ২২৬২

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৬, পৃ. ১৫৪, হাদীস: ১০১৯৮

^৩ আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ২, পৃ. ৩৭১, হাদীস: ২২৬২

১. হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী رحمہ اللہ -এর মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জন্য সব নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। তার দলীল হচ্ছে,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

‘হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়ল না তার নামায হল না।’^১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

‘হযরত আবু হুরাইরা رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়েনি তার সেই নামায অসম্পূর্ণ’ একথা তিনি তিনবার বলেন, পূর্ণাঙ্গ নয়।’^২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

‘হযরত আবু হুরাইরা رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কোনো নামায পড়ে সে যেন সূরা আল-ফাতিহা পড়ে নেয়।’^৩

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস رحمہ اللہ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمہ اللہ -এর মতে, যে নামাযে কিরাআত জোরে পড়া হয়, তাতে মুক্তাদীকে কিরাআত পড়তে হবে না। কিন্তু যে নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পড়তে হয়, তাতে মুক্তাদীকে কিরাআত পড়তে হবে। আল-কুরআনে আছে,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٠﴾

‘যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনদিয়ে শুন এবং চুপ থাক। তাহলে রহমত প্রাপ্ত হবে।’^৪

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫১, হাদীস: ৭৫৬

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৮ (৩৫৯)

^৩ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৯৫, হাদীস: ১২০৯

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-আরাফ*, ৭:২০৪

ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসায়ী রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, আয়াতটি নামাযের কিরাআত প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا».

‘হযরত আবু হুরায়রা রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘ইমাম বানানো হয় অনুসরণের জন্য, তাই সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে আর সে যখন কিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।’^১

৩. ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলাইহ সহ সাহিবাইন রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জন্য সর্বাবস্থায় সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা নিষিদ্ধ। তার দলীল হলো:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿১০০﴾

‘যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনদিয়ে শুন এবং চুপ থাক। তাহলে রহমত প্রাপ্ত হবে।’^২

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا».

‘হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যখন ইমাম কিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।’^৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةٌ».

‘হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত বলে গণ্য হবে।’^৪

^১ (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৬, হাদীস: ৮৪৬, (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৬০৩, (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৪১, হাদীস: ৯২১

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-আরাফ*, ৭:২০৪

^৩ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৬, হাদীস: ৮৪৭

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ
 الْإِمَامِ؟ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ،
 وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ
 الْإِمَامِ.

‘হযরত নাফি ^{রাহিতুল্লাহ} থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রাহিতুল্লাহ} থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইমামের পেছনে কারো কিরাআত পড়তে হবে কিনা? তিনি বলেন, যখন তোমরা ইমামের পেছনে নামায পড়ে। তখন ইমামের কিরাআত তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর একাকী নামায পড়লে সে যেন কিরাআত পড়ে। হযরত নাফি ^{রাহিতুল্লাহ} আরও বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রাহিতুল্লাহ} ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তেন না।^{১২}

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، ... أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ،
 فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ.

‘ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ ^{রাহিতুল্লাহ} থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত ^{রাহিতুল্লাহ}-কে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমামের পেছনে কোনো কিরাআত নেই।^{১৩}

অতএব প্রমাণিত হলে যে, মুক্তাদী ইমামের পেছনে সূরা আল-ফাতিহাসহ কোনো প্রকার কিরাআত পাঠ করবেন না। আরও বর্ণিত আছে,

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ». هَذَا مُرْسَلٌ.

‘ইমাম আশ-শা’বী ^{রাহিতুল্লাহ} থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ

^১ (ক) মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, *আল-মুওয়াত্তা লি-মালিক ইবনে আনাস*, পৃ. ৬৩, হাদীস: ১২৪, (খ) আত-তাহাওয়া, *শরহ মা’আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২১৭, হাদীস: ১২৯৪, (গ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১০৭, হাদীস: ১২৩৩, পৃ. ১২২, হাদীস: ১২৫৩ ও ১২৫৪

^২ মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৯৬, হাদীস: ২৫১

^৩ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ১০৬ (৫৭৭)

করেন, ‘ইমামে পেছনে মুক্তাদীর কোনো কিরাআত নেই।’ অবশ্য এই হাদীসটি মুরসাল।^১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتْ أَوْ قَرَأَ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সঃ ইরশাদ করেন, ‘ইমামের কিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনি কিরাআত নিরবে পড়ুন বা উচ্চৈঃস্বরে পড়ুন।’^২

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাঃ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাঃ-এর দলীলের উত্তরে হানাফী আলেমগণ বলেন,

১. «لَا صَلَاةَ» দ্বারা ইমাম ও একাকী আদায়কারীর নামাযের নাফী (না) করা হয়েছে, মুক্তাদীর নামাযের নাফী (না) করা হয়নি।

২. «لَا صَلَاةَ» দ্বারা কমালী (পরিপূর্ণতা)-এর নাফী (না) করা হয়েছে।

৩. দ্বিতীয় হাদীসের সনদে اضطراب (বিতর্ক) রয়েছে।

৪. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাঃ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাঃ-এর হাদীসের জবাবে ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী রাঃ বলেন,

تَفَرَّدَ بِهِ زَكْرِيَّا الْوَقَّارُ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَثْرُوكٌ.

‘যাকারিয়া আল-ওয়াক্কারই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি প্রত্যাখ্যাত।’^৩

ইমাম আবু জা’ফর আত-তাহাওয়ী রাঃ-এর দৃষ্টিভঙ্গি

বিশিষ্ট যুক্তিবাদী, হানাফী মাযহাবের ফিকহবিশারদ ইমাম আবু জা’ফর আবু জা’ফর আত-তাহাওয়ী রাঃ যুক্তিভিত্তিক অভিমত পেশ করতে গিয়ে বলেন, আমরা এ কথা ভালোভাবে অবগত আছি যে, নামাযের মধ্যে যেসব ফরয বিধি-বিধান রয়েছে, তা কোন অবস্থাতে রহিত হওয়ার কোন অবকাশ রাখে না, এমনকি

^১ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২০, হাদীস: ১২৪৭

^২ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৬, হাদীস: ১২৬৬

^৩ আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৬, হাদীস: ১২৬৫

জরুরি অবস্থাতেও নয়। তবে যা ফরয নয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা রহিত হতে পারে। যেমন— নামাযের মধ্যে ইমাম মুক্তাদী নির্বিশেষে সকলের জন্য তাকবীরে তাহরীমা ফরয। সময়ের সল্পতায় কেউ যদি তা পরিত্যাগ করে নামায আদায় করে এবং ইমামের সাথে রুকুতে शामिल হয়ে যায়, তবে তার নামায হবে না। কারণ তা ফরয। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় এবং কিরাআত পাঠ না করেই ইমামের সাথে রুকুতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে এ ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে।

এতে প্রতিয়মান হয় যে, মুক্তদির জন্য ফাতিহা বা অন্যকোন কিরাআত পাঠ ওয়াজিব নয়। যদি তাই হতো ইমামের সাথে শুধু রুকু शामिल হওয়ায় মুক্তাদীর নামায কখনও শুদ্ধ হতো না। কারণ সেতো ফরয কিরাআত আদায় করতে পারেনি।

প্রত্যেক রাকাআতে কিরাআত ফরয কিনা

নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে কিরাআত ফরয কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

১. ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতে, যেকোনো রাকাআতে কিরাআত পাঠ করা ফরয। তবে প্রথম দু'রাকাআতে নির্ধারিত করে নেওয়া ওয়াজিব।
ক. আলহ তাআলার বাণী:

فَأَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۖ

‘কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।’^১

- খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

‘হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়ল না তার নামায হল না।’^২

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিযী রাহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মতে, সকল রাকাআতে কিরাআত পাঠ করা ফরয আর সূরা মিলানো সুন্নত।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাযামিল, ৭৩:২০

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫১, হাদীস: ৭৫৬

ক. মহান আলাহ তাআলার বাণী:

فَأَقْرءْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

‘কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর ।’^১

এছাড়া রাসূল ﷺ-এর আমল দ্বারা এরূপ হুকুম প্রমাণিত হয় ।

১. ও ইমাম মালেকের অভিমত: যে কোন তিন রাকাআতে কিরাআত পাঠ করা ফরয ।
৩. ইমাম হাসান আল-বাসারী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও যুফারের অভিমত: শুধু এক রাকাআতে কিরাআত পাঠ করা ফরয ।
৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর অভিমত: সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয ।

গ্রহণীয় অভিমত: মূলত ইমামে আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর অভিমতই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য অভিমত । কেননা তাঁর দলীল শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত ।

শেষ দু’রাকাআতের কিরাআতের হুকুম

চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে শেষ দু’রাকাআতে কিরাআত পাঠ করা ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব । যেমন— শরহুল বিকায়া’র হাশিয়ায় রয়েছে,

أَنَّ الْمُصَلِّيَّ مُحْتَزِّ فِي الْأَخْرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَبِّحَ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْكُتَ.

‘শেষ দু’রাকাআতে নামাযীদের জন্য কিরাআত, তাসবীহ বা নীরব থাকার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে ।’^২

জমহুর ফিকহবিশারদদের মতে, শেষ দু’রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নত । যেমন— আল-হিদায়া গ্রন্থকার বলেন,

وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا.

‘শুধু শেষ দু’রাকাআতে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে ।’^৩

সর্বোপরি শেষ দু’রাকাআত কিরাআত পাঠ করা মুস্তাহাব আর সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নত ।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযাম্মিল, ৭৩:২০

^২ আবদুল হাই লাখনবী, উমদাতুর রিয়াআ বিতাহাশিয়াতি শরহিল বিকায়া, খ. ২, পৃ. ১৭২

^৩ আল-মারগীনালা, আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, খ. ১, পৃ. ৫৩

কোন নামাযে কোন সূরা পড়া মুস্তাহাব

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের যে কোন স্থান থেকে যেকোন কিতাবাত পাঠ করলেই নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। তবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সূরা থেকে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু কোন নামাযের মধ্যে এভাবে নির্দিষ্ট করা যে, এ সূরা পাঠ না করলে নামায হবে না, এমন ধারণা করা ওলামায়ে কেরামের মতে মাকরুহ। তবে রাসূল ﷺ যে নামাযে যেসমস্ত সূরা বেশি পাঠ করতেন তা যদি কেউ অনুসরণ করে তবে মুস্তাহাব হবে। যেমন—

১. ফজর ও যুহর নামাযে তিওয়ালে মুফাস্সাল পাঠ করা মুস্তাহাব, তিওয়ালে মুফাস্সাল হলো সূরা আল-হুজুরাত থেকে সূরা আল-বুরূজ পর্যন্ত।
২. আসর ইশার নামাযে আওসাতে মুফাস্সাল পাঠ করা মুস্তাহাব, আওসাতে মুফাস্সাল হলো সূরা আল-বুরূজ থেকে সূরা আল-বাইয়িনা পর্যন্ত।
৩. মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্সাল পাঠ করা মুস্তাহাব, আর কিসারে মুফাস্সাল হলে সূরা আল-বাইয়িনা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত।

তবে স্মর্তব্য যে, ফরয নামাযে একই সূরা উভয় রাকাতাতে পাঠ করা মাকরুহ হলেও নফল নামাযে একই সূরা উভয় রাকাতাতের বা একই রাকাতাতের একাধিক সূরা বা একই রাকাতাতে একটি সূরা বারবার পড়া জাযিয় আছে। এমনকি এক রাকাতাতে গোটা কুরআন পাঠ করাও জাযিয় আছে।

সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ অর্জন করা

সালাত মুমিনের মিরাজ স্বরূপ। মিরাজরজনীতে মহানবী ﷺ যেমনিভাবে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, তেমনিভাবে সালাতের মাধ্যমেও তার দীদার লাভ সম্ভব। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে যারা সঠিক ও সুন্দরভাবে যথাযথ নিয়মানুযায়ী সালাত আদায় করেন, তারা এর মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানসিক উৎকর্ষ অর্জন করেন। সুতরাং যারা এরূপ কার্য পালনে সদা সচেষ্ট তারা অবশ্যই সফলকাম। যেমন- ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

‘সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্র। আর যারা অনর্থক কথা-বার্তা হতে বিমুখ। আর যারা যাকাত প্রদান করে। আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হিফায়ত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী এবং মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলেও তারা তিরস্কৃত হবে না। সুতরাং কেউ তাদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমা লঙ্গজনকারী হবে। আর যার নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। আর যারা নিজেদের নামাযসমূহকে সংরক্ষণ করে। তারাই উত্তরাধিকারী। যারা জান্নাতুল ফেরদাউস বা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।’^১

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

‘আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাदिষ্ট কিতাব তিলাওয়াত করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১-১১

আলাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর আলাহ তাআলা জানেন তোমরা যা কর।^১

মূল আলোচনা

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে মুমিনের সাতটি অপরিহার্য গুণ আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর ওপর তাদের সফলতা এবং জান্নাত লাভ নির্ভর করে। এসব গুণের মধ্যে প্রথম ও সপ্তম গণ হলো নিয়মিত ও যথাযথভাবে নামায আদায় করা। পরবর্তী সূরা আনকাবূতের ৪৫ আয়াতেও সঠিকভাবে নামায আদায় করার মাধ্যমেই মানসিক উৎকর্ষ অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা একমাত্র আল্লাহর স্মরণই মানুষকে ধ্বংসাত্মক পরিণতি হতে বাঁচাতে পারে। আর নামায হলো আল্লাহকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

শানে নুযূল

ইমাম আবুল হাসান আলী আল-ওয়াহিদী رحمته الله তাঁর আসবাবু নুযূলিল কুরআন গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَزَلَّتْ: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

‘হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন তার চক্ষু আসমানের দিকে উত্তোলন করতেন। তখন আলোচ্য আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়।^২

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলাহ তাআলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে)। মুমিন মাত্রই নবী করীম ﷺ যা কিছু আনয়ন করেছেন, তার ওপর বিশ্বাস করে। আর যারা নবী প্রদত্ত সকল বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করে তারা অবশ্যই সফল। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

‘হযরত আবু যর আল-গিফারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, ‘হে আবু যর! লোকজনকে সুসংবাদ দাও যে,

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৪৫

^২ (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরক আলাস-সাহীহাইন, খ. ২, পৃ. ৪২৬, হাদীস: ৩৪৮৩, (খ) আল-ওয়াহিদী, আসবাবু নুযূলিল কুরআন, পৃ. ৩২২, হাদীস: ৬২৬

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই এই কথা স্বীকার করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^১

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের সফলতার কিছু গুণ আলোচনা করেছেন। সুতরাং যারা উক্ত গুণসমূহ বাস্তবায়ন করবে তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা লাভ করবে।

প্রখ্যাত নাহ্বিদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যিয়াদ আল-ফররাহ মোহতাজ আলিয়াহ বলেন, এ আয়াতে মুমিনদের সফলতার জন্য তাগিদস্বরূপ ٱلْهُدَى ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা অতি শিগ্গিরই সফলতা লাভ করবে, তা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ইমাম ইবরাহীম ইবনুস সাররী আয-যাজাজ মোহতাজ আলিয়াহ বলেন,

قَدْ نَالُوا الْبَقَاءَ الدَّائِمَ فِي الْخَيْرِ.

‘মুমিনগণ চিরস্থায়ী কল্যাণ অর্জন করেছেন।’^২

সূরা আল-মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াতের ফযীলত

সূরা আল-মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াতে মুমিন জীবনে কামিয়াবী ও সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য গুণগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ গুণ গুলোই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূত চরিত্র। এভাবে সূরা মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াতের বহু ফযীলত রয়েছে। নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. নাসায়ী শরীফে এসেছে,

عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابُوْنَسَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ الْقُرْآنُ»، فَقَرَأْتُ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾، قَالَتْ: «هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

ইয়াযীদ ইবনে বাবানুস মোহতাজ আলিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযীল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র আল কুরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর হযরত আয়িশা রাযীল্লাহু আনহা সূরা আল-মুমিনুনের প্রথম

^১ আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৪৪৫

^২ আয-যাজাজ, *মাআনিউল কুরআন ওয়া ইরবাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫

দশ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, এগুলোই ছিল রাসূল ﷺ-এর চরিত্র ও অভ্যাস।^১

২. এ আয়াতগুলোর ফযীলত প্রসঙ্গে মুসনদে আহমদে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ
كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَمَكْنَتُنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:
«اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَآكِرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا
وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا»، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أَنْزِلْتَ عَلَيَّ عَشْرَ
آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ آيَاتٍ.

‘হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী রাহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাহমতুল্লাহু আলাইহ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর যখন অহী নাযিল হতো, তখন নিকটবর্তী লোকজনের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হতো। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত অহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। অহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রাসূল রাহমতুল্লাহু আলাইহ কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا

تَنْقُصْنَا، وَآكِرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا» দুআটি পাঠ করতে লাগলেন, অতঃপর রাসূল রাহমতুল্লাহু আলাইহ বললেন, ‘এতক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলোর পুরোপরি পালন করে, তবে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে।’ অতঃপর তিনি সূরা মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে শোনালেন।^২

^১ (ক) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ১০, পৃ. ১৯৩, হাদীস: ১১২৮৭, (খ) ইবনে কসীর, *তাকসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৫, পৃ. ৪০১

^২ (ক) আবদুর রাযযাক আস-সান’আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩, হাদীস: ৬০৩৮, (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩৫০-৩৫১, হাদীস: ২২৩, (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ৩১৭৩, (ঘ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ১৭০, হাদীস: ১৪৪৩, (খ) ইবনে কসীর, *তাকসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৫, পৃ. ৪০১

৩. হাদীস শরীফে আরও এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةً عَذْنٍ بِيَدِهِ، وَدَلَّى فِيهَا ثَمَارَهَا، وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَارَهَا، ثُمَّ نَظَرَ فِيهَا، فَقَالَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন যে, ‘আলাহ যখন নিজ হাতে জান্নাত তৈরি করলেন এবং তাকে অভাবনীয় নিয়ামত দ্বারা সুশোভিত করলেন এবং বললেন, হে জান্নাত! কথা বল, আতঃপর জান্নাত বলল, মুমিনগণ সফলকাম হবে।’^১

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী রাযিআল্লাহু আলাইহি বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে আলহ তাআলা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, তারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এ ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।^২

৫. ইমাম মুহাম্মদ ঈসা আত-তিরমিযী রাযিআল্লাহু আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত ইবনুল খত্তাব রাযিআল্লাহু আলাইহি থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«لَقَدْ أَنْزِلْتُ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ آيَاتٍ.

‘আমার ওপর দশটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলোকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর ঐ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ থেকে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন।’^৩

মুমিনের পরিচয় আভিধানিক অর্থ

وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ -এর إِسْمٌ فَاعِلٌ থেকে إِفْعَالٌ বাবে (মুমিন) مُؤْمِنٌ

^১ (ক) আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল আওসাত*, খ. ১২, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ১২৭২৩, (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৫, পৃ. ৪০২

^২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাজারিফুল কুরআন*, পৃ. ৯১১

^৩ (ক) আবদুর রাযযাক আস-সান‘আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩, হাদীস: ৬০৩৮, (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩৫০-৩৫১, হাদীস: ২২৩, (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ৩১৭৩, (ঘ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ১৭০, হাদীস: ১৪৪৩, (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৫, পৃ. ৪০১

সীগাহ। মাসাদার الْإِيمَانُ, এটি الْأَمْنُ মূলধাতু থেকে উৎকলিত।

الْإِيمَانُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে,

১. الصَّبْرُ وَرُءُذَا أَمْنٍ (নিরাপত্তা প্রাপ্ত হওয়া)।
২. الْإِذْعَانُ (দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা)।
৩. التَّصَدِيقُ (বিশ্বাস করা, সমর্থন দেওয়া)।
৪. الْوُثُوقُ (নির্ভর করা)।
৫. جَعَلَ الْمَرَادَ أَمْنٍ (কাউকে নিরাপদ করা)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

مُؤْمِنٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বলা হয়:

الْمُؤْمِنُ: هُوَ الَّذِي صَدَّقَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا جَاءَ بِاعْتِمَادٍ عَلَيْهِ.

‘মুহাম্মদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তার ওপর নির্ভর করে তিনি তাকে সত্যায়ন করেছেন তাকে মুমিন বলে।’

আলাহ তাআলা মুমিনের সংজ্ঞায় বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ

‘ঈমানদার তারা তাও মান্য করে যা আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে।’^১

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

‘যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।’^২

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৬২

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮:২

‘মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।’^১

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ①

‘তরাই মুমিন, যারা আলাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তরাই সত্যনিষ্ঠ।’^২

মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য

মুমিন শব্দটি اَلْمُؤْمِنُ থেকে আর মুসলিম শব্দটি اَلْإِسْلَام নির্গত। সুতরাং اَلْمُؤْمِنُ ও اَلْإِسْلَام-এর মধ্যকার পার্থক্য মূলত মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য। নিম্নে ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার বিভিন্নরূপ পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো:


১. ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক পার্থক্য: ঈমান ও ইসলামের মধ্যে আভিধানিক পার্থক্য নিম্নরূপ:

ক. ঈমানের অর্থ হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, আর ইসলামের অর্থ হচ্ছে বিনয়াবত হওয়া।

খ. اَلْإِيمَانُ هُوَ اَلْإِنْقِيَادُ الْبَاطِنِيُّ، وَاَلْإِسْلَامُ هُوَ اَلْإِنْقِيَادُ الظَّاهِرِيُّ (ঈমান হচ্ছে আন্তরিক আনুগত্য, আর ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক আনুগত্য)।

গ. تَعَلَّقَ اَلْإِيمَانُ مَعَ اَلْقَلْبِ، وَتَعَلَّقَ اَلْإِسْلَامُ مَعَ اَلْجَوَارِحِ (ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, আর ইসলামের সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে)।

২. ঈমান ও ইসলামের শরয়ী পার্থক্য:

ক. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী  বলেন, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন। অতএব প্রত্যেক মুমিনকে মুসলিম বলা যায়। অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিমকে মুমিন বলা যায়। তাঁর দলীল হচ্ছে,

فَاُخْرِجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ② ③ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ
اَلْمُسْلِمِينَ ④

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১-৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-হজারাত, ৪৯:১৫

‘অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। আর সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি।’^১

আলোচ্য আয়াতে মুমিনকে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُسْلِمِينَ ﴿١٧﴾

‘আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই ওপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।’^২

এ আয়াতটিতে একই শ্রোতাদেরকে সম্বোধন করে পূর্বাপর দুটি শর্তের প্রথমটিতে মুমিন আর দ্বিতীয়টিতে মুসলিম বলা হয়েছে। অতএব ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় সাব্যস্ত হলো। আর হাদীসে জিবরীল জিবরীল-এর মধ্যে -এর মধ্যে যে বিষয়গুলোকে ইসলাম বলা হয়েছে, হুবহু সে বিষয়গুলোকে হাদীসে ওয়াফদে আবদুল কায়সের মধ্যে ঈমান বলা হয়েছে।

খ. কতিপয় মুহাদ্দিস ও দার্শনিকের মতে, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে نِسْبَةُ تَبَاطُلٍ (বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক) বিদ্যমান। কেননা বলা হয়: الْإِيمَانُ فِعْلُ الْقَلْبِ, (ঈমান হচ্ছে অন্তরের কাজ আর ইসলাম হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ)। তার দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبَّيْدُ خُلِ

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴿٢٠﴾

‘মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি, বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি।’^৩

ঈমান ও ইসলাম এক বস্তু হলে হযরত জিবরীল জিবরীল-এর মধ্যে ভিন্ন

^১ আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৩৫-৩৬

^২ আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০:৮৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-হজারাত, ৪৯:১৪

ভিন্ন প্রশ্ন করতেন না। যেমন— তিনি রাসূল ﷺ-কে একবার বলেছেন, مَا الْإِسْلَامُ (ইসলাম কী)? আরেকবার বলেছেন, مَا الْإِيمَانُ? (ঈমান কী?)

গ. আল্লামা আনোয়ার শাহ আল-কাশ্মীরী رحمۃ اللہ علیہ ও আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাস্তালানী رحمۃ اللہ علیہ-এর মতে, ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয়ের মাঝে عُمُومٌ وَخُصُوصٌ-এর সম্পর্কে রয়েছে। এতে ঈমান হচ্ছে আম, আর ইসলাম খাস। অতএব বলা হয়: كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ أَمٌّ (প্রত্যেক মুমিন মুসলিম, তবে প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়)।

ঘ. ইমাম শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার আল-আসকালানী رحمۃ اللہ علیہ বলেন, إِيْمَانُهُمَا كَالْفَقِيرِ وَالْمُسْكِينِ إِذَا اجْتَمَعَا افْتِرَقَا، وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا.

‘এ দুটি শব্দ ফকীর ও মিসকীনের ন্যায় যখন দুটি একই বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি ব্যবহার করা হবে তখন উভয় ভিন্নার্থক হবে। আর পৃথকভাবে ব্যবহার হলে উভয় একার্থক হয়।’

ঙ. আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতে,

هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَا يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، فَالْإِيمَانُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَالْإِسْلَامُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْإِيمَانِ.

‘ঈমান ও ইসলাম মানুষের পেট ও পিঠের মতো পরস্পর সংলগ্ন, একটা আরেকটা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব ঈমান ইসলাম থেকে আলাদা নয় এবং ইসলামও ঈমান থেকে আলাদা নয়।’

সূরা আল-মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত সাতটি গুণাবলি

সূরা আল-মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াতে মুমিনের যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো:

১. নামাযে খুশু বা বিনম্রভাব হওয়া।
২. অনর্থক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা।
৩. যাকাত দেওয়া।
৪. নৈতিকতার গুণ অর্জন করা তথা যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা।
৫. আমানত প্রত্যাপণ করা।
৬. ওয়াদা রক্ষা করা।

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৫০, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

৭. নামাযে যত্নবান হওয়া ।

মুমিনের প্রথম গুণ যদিও ঈমানদার হওয়া, কিন্তু তা মৌলিক গুণ হওয়ায় এবং তার ওপর মুমিনের অস্তিত্ব নির্ভর করায় এটাকে আলাদা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মুমিন শব্দের মধ্যেই তা নিহিত আছে । তবে মুমিনের সফলতা অর্জনের জন্য উক্ত সাতটি গুণ অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সাতটি গুণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

প্রথম গুণ: নামাযে খুশ বা বিনম্রভাব হওয়া

প্রথম গুণ হলো নামাযে **خُشُوعٌ** (বিনম্রভাব) হওয়া ।

খুশ শব্দের পরিচয়

খুশ শব্দের আভিধানিক অর্থ: স্থিরতা । পরিভাষায় অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতাকে **خُشُوعٌ** বলে । অর্থাৎ নামাযে আলাহ ছাড়া অন্যকিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অনর্থক শরীর নড়াচড়া না করাকে **خُشُوعٌ** বলে । খুশ প্রসঙ্গে মুফাসসিরদের থেকে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় । যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন, খুশ হলো অন্তরের ভয় এবং শরীরের স্থিরতা ।^১
২. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, **عَظُّ الْبَصَرِ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ** (চক্ষু অবনত রাখা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখাই খুশ) ।
৩. ইমাম মুসলিম ইবনে ইয়াসার রাযিআল্লাহু আনহু ও ইমাম কাতাদা ইবনে দিআমা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, **هُوَ تَنَكُّيْسُ الرَّأْسِ** (খুশ হচ্ছে মাথা নত রাখা) ।
৪. হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, **هُوَ تَزْكُ الْأَلْيَفَاتِ** (নামাযে এদিক সেসদিক না ফেরাই হলো খুশ) ।^২ যেমন— হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিআল্লাহু আনহু-কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَا أَنَسُ! اجْعَلْ بَصْرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ».

‘সাজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে দ্রক্ষেপ করো না ।’^৩

^১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওযীলিল কুরআন*, খ. ১৭, পৃ. ১০

^২ আবু হাইয়ান আল-উনদুলুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফী তাফসীর*, খ. ৭, পৃ. ৫৪৬

^৩ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৪০৩, হাদীস: ৩৫৪৫

৫. ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, **هُوَ أَلَا يَعْثَبُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فِي الصَّلَاةِ** (শরীরের কোন অঙ্গ নিয়ে খেলা না করা হইলো খুশু)।^১

৬. ইমাম হাসান আল-বাসারী রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, **الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ** (খুশু মূলত অন্তরের স্থিরতাকে বোঝায়)। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে খুশু ছিল বিধায় তাঁদের চক্ষু নত থাকত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ত না। যেমন— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় দাঁড়ি নিয়ে খেলতে দেখে বলেন,
«لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»।

‘যদি এ ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকত, তবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো স্থির থাকত।’^২

৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, খুশু হলো নামাযে চক্ষু অবনত রাখা।

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ؛ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، فَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ بُرْءُؤُسِهِمْ هَكَذَا।

‘মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম রাহমতুল্লাহু আলাইহ প্রথমত আকাশের দিকে তাকিয়ে নমায পড়তেন। এ আয়াত নাযিল হলে তাঁরা চক্ষুকে সাজদার দিকে নত রাখা শুরু করেন।’^৩

মোটকথা অন্তরকে আলহর ভয়ে ভীত রাখার ফলেই অঙ্গগুলো স্থির থাকবে। আর এটা হলো খুশু।

নামাযে খুশুর হুকুম ও গুরুত্ব

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, নামাযে খুশু ফরয। তাঁর মতে, এটা সুন্নত।

আলামা শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, নামাযে খুশু পরিত্যাগ করলে নামায মাকরুহ হবে। তবে নামায শুদ্ধ হবে বলে বিবেচিত হলেও নামায কবুল হওয়ার জন্য খুশু শর্ত ফরয।^৪

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১২, পৃ. ১০৩

^২ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৪০৪, হাদীস: ৩৫৫০, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত

^৩ ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন*, খ. ১৭, পৃ. ৭

^৪ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৯, পৃ. ২০৮

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
 «يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ، فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا».

‘অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন মসজিদে ঢুকে একজন বিনম্র লোক পাওয়া যাবে না।’^১

এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ রাঃ، قَالَ: «أَوَّلُ مَا تَفْقَدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَفْقَدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةُ عُزْوَةٍ».

‘হযরত হুযায়ফা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তোমাদের দীন তোমরা প্রথমে যা হারাবে তা হলো খুশু, আর শেষ যা হারাবে তা হলো নামাজ। আর ইসলামের বাঁধনগুলো একটি একটি করে নষ্ট হবে।’^২

নামাযে খুশুর গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম আল-হাকীম আত-তিরমিযী রাঃ বর্ণনা করেন, হযরত উম্মু রুমান রাঃ হতে বর্ণিত, আব্বাহর রাসূল সাঃ বলেন,
 «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلْيَسْكُنْ أَطْرَافَهُ لَا يَتَمَيَّلُ تَمِيلُ الْيَهُودُ، فَإِنَّ سُكُونَ الْأَطْرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

‘তোমাদের কেউ নামাযে দাড়ালে যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো স্থির রাখে। ইহুদিদের ন্যায় নামাযে না হেলে। কেননা নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা নামায পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণ।’^৩

দ্বিতীয় গুণ: অনর্থক বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা

আলাহ তাআলার বাণী: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ^১ আয়াতে উল্লেখিত اللَّغْوِ শব্দের অর্থ: অনর্থক কথা বা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ: উচ্চ স্তরের গোনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকারতো নেইই, বরং ক্ষতি বিদ্যমান। তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকারও ক্ষতি কোনটিই না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ সাঃ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».

^১ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরক আলাস-সাহীহাইন*, খ. ১, পৃ. ১৭৯, হাদীস: ৩৩৮

^২ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরক আলাস-সাহীহাইন*, খ. ৪, পৃ. ৫১৬, হাদীস: ৮৪৪৮

^৩ আল-হাকীম আত-তিরমিযী, *নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল* সাঃ, দারুল জলীল, বয়রুত, লেবানন, খ. ২, পৃ. ১৭১

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সালাতুহু ওয়াসালমু বলেন, ‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদী ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।’^১

এ কারণে আয়াতে এটাকে কামেল মুমিনের গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।
যেমন- বলা হয়েছে,

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝

‘আর যখন তারা অনর্থক কথা বা কাজের নিকট দিয়ে যায়, ভদ্রতা সহকারে তা অতিক্রম করে চলে যায়।’^২

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী রাযীয়াতুহু আলায়াহি বলেন, আয়াতে اللَّغْوِ-এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে পাঁচ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা-

১. হযরত আবু সালেহ রাযীয়াতুহু আলায়াহি বলেন, اللَّغْوِ-এর অর্থ হলো الشَّرْكُ (শিরক)।
২. হযরত ইবনে আবু তালহা রাযীয়াতুহু আলায়াহি বলেন, اللَّغْوِ-এর অর্থ হলো البَّاطِلُ (ভ্রান্ত)।
৩. ইমাম হাসান আল-বাসারী রাযীয়াতুহু আলায়াহি বলেন, اللَّغْوِ-এর অর্থ হলো الْمَعَاصِي (পাপকার্য)।
৪. ইমাম ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী রাযীয়াতুহু আলায়াহি বলেন, اللَّغْوِ-এর অর্থ হলো الْكِبْذُ (মিথ্যা)।
৫. হযরত মুতাকিল রাযীয়াতুহু আলায়াহি বলেন, اللَّغْوِ-এর অর্থ হলো الشَّتْمُ وَالْأَذَى الَّذِي كَانُوا (গালিগালাজ ও কষ্ট দেওয়া যা তৎকালীন কাফিররা করত)।^৩

তৃতীয় গুণ: যাকাত আদায় করা

এখানে যাকাত দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

১. زَكَاةً (মালের যাকাত)। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদ একবৎসর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে তা হলে চল্লিশভাগের এক ভাগ ফকিরকে দান করাকে যাকাত বলে। সূরাটি মক্কায় নাযিল হলেও যাকাত আদায় মুমিনের

^১ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩১৫, হাদীস: ৩৯৭৬

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-ফুরকান*, ২৫:৭২

^৩ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ৩, পৃ. ২৫৬

গুণ হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। কারণ যাকাত মদীনায বিস্তারিতভাবে ফরয হলেও প্রথমে তা মক্কাতেই সংক্ষিপ্তভাবে ফরয হয়।

২. অথবা এখানে যাকাত বলে زَكَاةُ النَّفْسِ (আত্মশুদ্ধি) উদ্দেশ্য হবে। আর তাতেও ক্ষতি নেই। কেননা শিরক, রিয়া, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কাপণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলে। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ। আর নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করাও ফরয।

এ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নার আলোকে যাকাতের বিধান দেখুন:

আত্মশুদ্ধির পরিচয়

আত্মশুদ্ধিকে কুরআনের পরিভাষায় التَزَكِّيَّة (আত-তায়কিয়া) বলা হয়।

একে عِلْمُ التَّصَوُّفِ বা عِلْمُ الْبَاطِنِيِّ বা বলা হয়। আভিধানিকভাবে তায়কিয়া অর্থ পরিচ্ছন্নতা। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের অন্তরে দুটি চরিত্র রয়েছে।

১. ফেরেশতাসুলভ চরিত্র ও

২. পশুসুলভ চরিত্র।

পশুসুলভ চরিত্র থেকে মুক্ত করে ফেরেশতাসুলভ চরিত্র দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করার যে পদ্ধতি, তাই তায়কিয়া বা আত্মশুদ্ধি।

আত্মশুদ্ধি অর্জন করা ফরয। দূষিত আত্মা নিয়ে কেউ বেহেশতে প্রবেশের উপযোগী হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

‘যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না; কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।’^১

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

‘নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়।’^২

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

‘যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।’^৩

মহানবী ﷺ-কে আল্লাহ যে চারটি মহান দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বে প্রেরণ করেছেন, মানুষের আত্মশুদ্ধি তার অন্যতম। কুরআনে সে বিষয়টি

^১ আল-কুরআন, সূরা আশ-শুআরা, ২৬:৮৮-৮৯

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আশ-শামস, ৯১:৯

এভাবে এসেছে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ ۚ

‘হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন
পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ
তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং
তাদের পবিত্র করবেন।’^১

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنَّقَ.

‘যে ব্যক্তি ফকীহ হলো, কিন্তু আত্মশুদ্ধি করল না সে জিনদিক। তাই
আমাদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য আমৃত্যু সঠিক পথে চেষ্টা করতে হবে।’^২

চতুর্থ গুণ: যৌনাঙ্গকে সংযত করার মাধ্যমে নৈতিকতা অর্জন করা

বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۚ অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত
দাসী ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এ দু’শ্রেণীর সাথে
শরিয়তের বিধি মোতাবেক কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোন
অবৈধ পন্থায় কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত
আছে, প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে, জীবনের লক্ষ্য বানানো যাবে
না। এটা এ পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কৃতের যোগ্য হবে
না। এ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, وَأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ (যারা এর বাইরে
আরও কিছু কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী)। আলাহ তাআলা ইরশাদ
করেন,

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ

‘অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা
সীমালঙ্ঘনকারী হবে।’^৩

সুতরাং এ আয়াত দ্বারা যৌনাঙ্গ ব্যবহারের বৈধ ও অবৈধ স্থান প্রতিয়মান
হয়। তা হলো:

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১২৯

^২ মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৩৩৫

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৭, সূরা আল-মআরিজ, ৭০:৩১

যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অনুমোদিত স্থান

ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জওযী রহমাহু বলেন, দু'টি স্থান বৈধ করা হয়েছে। যথা—

১. الْأَزْوَاجُ (বিবাহিত স্থান)।

২. الْمَمْلُوكَاتُ (শরীয়তসম্মত দাসী)।^১ যেমন— আলাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا عَلَىٰ زَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ

‘তবে তাদের স্ত্রী এবং মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলেও তারা তিরস্কৃত হবে না।’^২

যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অননুমোদিত স্থান

১. যিনা, তেমনি হারাম নারীকে বিয়ে করার মধ্যেও যিনার ছুকুম বিদ্যমান,
 ২. স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হাযিয়-নিফাস অবস্থায়,
 ৩. অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা,
 ৪. কোনো পুরুষ অথবা বালক কিংবা জীবজন্তুর সাথে কাম-প্রবৃত্তি চারতার্থ করা,
 ৫. হাত দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি পূর্ণ করা।^৩
- এসব কার্য হারাম ও নিষিদ্ধ।

পঞ্চম গুণ: আমানত রক্ষা করা

আমানত রক্ষা করা ফরয। حَقُّ الْعِبَادِ ও حَقُّ اللَّهِ উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হলো শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়জিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

আর বন্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা একটা আমানত। তা রক্ষা করা এবং প্রত্যাপন করা ফরয। অনুরূপভাবে কারো গোপন করা শরীয়ত সম্মত ওজর ছাড়া ফাঁস করে দেওয়া হারাম। কেননা কথাও একটি আমানত। তদ্রূপ মজুর ও কর্মচারীর ওপর নির্ধারিত দায়িত্বও একটি আমানত। অতএব কাজ চুরি ও সময় চুরি এক প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা। হাদীস শরীফে আছে,

^১ ইবনুল জওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ২, পৃ. ২৫৬

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-মুমিনুন*, ২৩:৬

^৩ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৯১৩, (খ) আল-কুরআন, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১২, পৃ. ১০৬-১০৭, (গ) আবু হাইয়ান আল-উনদুলুসী, *আল-বাহরুল মুহীত ফীত তাফসীর*, খ. ৭, পৃ. ৫৪৯, (ঘ) থানবী, *তফসীরে বয়ানুল কুরআন*, পৃ. ৭১৭

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا إِثْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যার মধ্যে আমানদারিতা নেই তার ঈমান নেই।’^১

আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

‘নিশ্চয় আলাহ তাআলা তোমাদেরকে আমানত তার হকদারের কাছে আদায়ের আদেশ করেছেন।’^২

ষষ্ঠ গুণ: চুক্তি রক্ষা করা

عَهْدٌ বলতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বোঝায়। তবে অঙ্গীকার এক পাক্ষিক হলে তাকে وَعْدٌ বলে। অঙ্গীকার বা চুক্তি পালন করাও ফরয। এর খিলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, যা হারাম। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعِدَّةُ دَيْنٌ».

‘হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাযীয়াতুহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘ওয়াদা এক প্রকার ঋণ।’^৩

কেউ কেউ বলেন, লিখিত চুক্তিকে عَهْدٌ এবং মৌখিক চুক্তিকে وَعْدٌ বলে। তবে আসল কথা হলো, চুক্তি এক পক্ষীয় হোক বা দ্বি পক্ষীয় হোক, তা পালন করা ফরয এবং ভঙ্গ করা হারাম ও মুনাফিকের নিদর্শন। যেমন— হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أَوْثَقَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে,

^১ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নিফ ফিল আহাদীস ওয়াহা আসার*, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৩০৩৬০

^২ আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৫৮

^৩ আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ২৩, হাদীস: ৩৫১৩ ও ৩৫১৪

আমানত রাখলে খিয়ানত করে এবং অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে।”^১

উভয় প্রকার অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই গুনাহের কাজ। তবুও পার্থক্য হলো, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে বিচরকের সাহায্য নিয়ে আদায় করতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু এক পক্ষীয় চুক্তি নিয়ে কলহ হলে তা নিয়ে আদালতে যাওয়া যায় না।

সপ্তম গুণ: নামাযে যত্নবান হওয়া

مُحَافَظَةُ الصَّلَاةِ বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে মুফাসসিরীনে

কেরামের মতামত নিম্নরূপ:

১. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله বলেন, এর অর্থ হলো: প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা।^২
২. হযরত ইকরামা رحمته الله বলেন, এর অর্থ হলো যথাসময়ে যথানিয়মে নামায আদায় করা।

মোটকথা ফরয নামাযগুলো সঠিক সময়ে, নিয়মিত, পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তথা নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব সহকারে সম্পন্ন করাই হলো: বা নামাযে যত্নবান হওয়া।

নামাযের মধ্যেই মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়

একজন মানুষের ভেতরে যখন মানসিক উৎকর্ষ অর্জিত হয়, তখন সে একজন পূর্ণ চরিত্রবান মানুষে পরিণত হয়। যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে সে বিরত থাকে। তার চরিত্রে শুধু ভালো দিকগুলোই দেখতে পাওয়া যায়। আর নামায যেহেতু মানুষকে অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাই বলা হয়, একমাত্র নামাযই মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে। যেমন- আলাহ তাআলা আল-কুরআনে বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ

‘আর তুমি নামায কায়েম কর। কেননা নিশ্চয় নামায যাবতীয় অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।’^৩

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী رحمته الله বলেন, আলোচনার শুরুতে ও শেষে নামাযের কথা উল্লেখ করে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তি সময়মতো, নিয়মিত, একাগ্রতার সাথে নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, তার মধ্যে উক্ত নৈতিক গুণগুলো আপনাতেই সৃষ্টি হবে। আর মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। অচিরেই সে একজন

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৮০, হাদীস: ২৬৮২

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১২, পৃ. ১০৭-১০৮

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-আনকাবুত*, ২৯:৪৫

পূর্ণ মুমিন এবং সঠিক মানুষে পরিণত হবে।^১

এর ব্যাখ্যা

আলাহ তাআলা বলেন, ⑤ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ⑥ (অবশ্যই

সালাত সকল প্রকার অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে)। আয়াতে ⑤ الصَّلَاةُ ⑥ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, এ নিয়ে মুফাসসিরদের থেকে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা—

১. অধিকাংশের মতে, ⑤ الصَّلَاةُ ⑥ দ্বারা নামাযই উদ্দেশ্য। যেমন— হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ^{রূয়াহুল আনহুমা} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ^{আল্লাহ} ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তিকে তার নামায অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার নামায তাকে আল্লাহ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।’^২

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রূয়াহুল আনহুমা} বলেন, সালাত দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। যেমন— আলাহ বলেন,

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ⑦

‘আপনি নিজের নামায আদায়কালে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না বরং এ উভয়ের মাঝে একটি পথ অবলম্বন করবে।’^৩

তবে প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে আয়াতের অর্থ কি হবে? এ নিয়ে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা—

১. বন্দা যদি নির্দেশিত পন্থায় যথাযথভাবে নামায আদায় করে, তবে তা বান্দাকে ⑤ الْفَحْشَاءُ ⑥ (ফাহশা) ও ⑥ الْمُنْكَرُ ⑥ (মুনকার) থেকে বিরত রাখবে।

^১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩০-১০৩১

^২ (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১১, পৃ. ৫৪, হাদীস: ১১০২৫, (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৬, পৃ. ২৫৪, (গ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩১

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:১১০

২. বান্দা যতক্ষণ নামাযের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তা অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করবে।

৩. নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করে।

الفَحْشَاءُ-এর মর্মার্থ

فَاحِشَةٌ শব্দটির অর্থ হলো: অশ্লীলতা। তবে এর মর্মার্থ সম্পর্কে নিম্নোক্ত

অভিমতগুলো প্রণিধানযোগ্য:

১. ফাহিশা অর্থ হলো أَمْرٌ غَايَةُ النَّبِيحِ (চরম মন্দ কাজ)। আর তা হলো শিরক করা।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা ও ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাযিআল্লাহু আনহুমা বলেন, هِيَ طَوَائِفُهُمْ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا (উলঙ্গ অবস্থায় কাবাঘর তওয়াফ করাকে ফাহিশা বলে)।

৩. তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে, ফাহিশা মন্দ কাজকে বলে, যা সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে পূর্ণমাত্রায় সবুস্পষ্ট। বস্তুত ফাহিশা দ্বারা সকল প্রকার বড় গোনাহকে বোঝানো হয়েছে।

মোটকথা প্রতিটি খারাপ ও কুৎসিত কাজকেই ফাহিশা বলে। সুতরাং এতে ছোট বড় সকল প্রকার গোনাহ শামিল রয়েছে। যদিও বড় বড় গোনাহের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রয়োগ হয়। তবে আয়াতে উলঙ্গ অবস্থায় কাবাঘর তওয়াফ করাকেই বিশেষভাবে ফাহিশা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাজটিকে জাহিলী যুগে অতীব পুণ্যের কাজ মনে করা হতো।^১

৪. الفَحْشَاءُ (অশ্লীল) কাজ বলে এমন কাজকে বোঝানো হয়েছে, যার মন্দ হওয়া সুস্পষ্ট। যেটাকে মুমিন কাফেক নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ বলে মনে করে। যেমন- ব্যভিচার, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, চুরি এবং ডাকাতি ইত্যাদি।^২

الْمُنْكَرُ-এর মর্মার্থ

১. الْمُنْكَرُ-এর অর্থ হচ্ছে, অসৎ কাজ। আর ইসলামে যেসব কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, দ্বারা সেসব কাজই উদ্দেশ্য।

২. কেউ কেউ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেন, সেগুলোই الْمُنْكَرُ-এর অন্তর্ভুক্ত।

^১ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, জাত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯

^২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ১০৩০

৩. কতিপয় আলেমের মতে, ইসলামী শরীয়তে যা সমর্থিত নয় এবং যা বিবেকসম্মত নয়, তা ٱلْمُنْكَرُ-এর অন্তর্ভুক্ত।
৪. আবার অনেকের মতে, শরীয়ত গর্হিত যাবতীয় অবৈধ কথা ও কাজ, যার প্রতি আলহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ অসম্বস্ত তাই ٱلْمُنْكَرُ।
৫. যেসব কাজ সর্বসাধারণের মন্দ বলে বিবেচিত, তাই ٱلْمُنْكَর।
৬. কারো কারো মতে, সকল পাপকর্ম ٱلْمُنْكَর-এর অন্তর্ভুক্ত।
৭. ٱلْمُنْكَর বলা হয় সেব কাজকে, যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদগণ একমত।

ইকামাতুস সালাতের পরিচয়

إِقَامَةُ الصَّلَاةِ (ইকামাতুস সালাত)-এর অর্থ: নামায প্রতিষ্ঠা করা। কেননা নামায পড়লে চলবে না। বরং কুরআনের বক্তব্যের মতে, إِقَامَةُ الصَّلَاةِ (নামায কয়েম) করতে হবে। আর إِقَامَةُ الصَّلَاةِ-এর গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো: রাসূল ﷺ যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারাজীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছিলেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। অর্থাৎ শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, নামাযের স্থান ইত্যাদি পবিত্র হওয়া। নিয়মিত জামায়াতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতি। আর অপ্রকাশ্য রীতি হলো আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো, যেন তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কয়েম করে, সে আলহ তাআলার পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সংকর্মের তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে বাঁচারও তাওফীকপ্রাপ্ত হয়।

নামায পাপ থেকে ফিরায়

সকল প্রকার পাপ ও মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো নামায। যেমন- আলহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ

‘নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ তথা সকল প্রকার পাপ থেকে ফিরায়।’^১

সুতরাং যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ থেকে বিরত থাকে না, বুঝতে হবে, তার নামাযের মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযালাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

«مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

‘যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই না।’^১

বলাবাহুল্য অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ রাযালাহু আনহু، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযালাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যার নামায তাকে সৎকাজ করতে এবং অসৎকাজ হতে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে না। তার নামায তাকে আলাহ তাআলা হতে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।’^২

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযালাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كَانَ فَتًى مِّنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَلَا يَدْعُ شَيْئًا مِّنَ الْفَوَاحِشِ وَالسَّرِيقَةِ إِلَّا رَكِبَهُ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فَقَالَ: «إِنَّ الصَّلَاةَ سَتَتْهَا».

‘জৈনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকালে চুরি করে। তিনি বলেন, ‘অচিরেই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।’^৩

কোন কোন রেওয়াজাতে পাওয়া যায়, কিছুদিন পরে সে ব্যক্তি চুরির অভ্যাস ত্যাগ করে এবং তওবা করে।^৪

একটি সন্দেহের জবাব

এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাক্ষীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৯, পৃ. ৩০৬৫, হাদীস: ১৭৩৩৯, (খ) ইবনে কসীর, *তাক্ষীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৬, পৃ. ২৫৩-২৫৪, (গ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩১

^২ (ক) আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল কবীর*, খ. ১১, পৃ. ৫৪, হাদীস: ১১০২৫, (খ) ইবনে কসীর, *তাক্ষীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৬, পৃ. ২৫৪, (গ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩১

^৩ (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৭, (খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩১

^৪ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩১

পরিপন্থী নয় কি? এর জবাবে ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো:

১. মুহাম্মদ ইবনুস সাযিব আল-কালবী رحمته الله ও হযরত আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ رحمته الله বলেন, আয়াতের অর্থ হলো: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ مَا دُمْتَ فِيهَا (তুমি যতক্ষণ নামাযে থাকবে ততক্ষণ নামায তোমাকে বিরত রাখবে)।^১
২. নামাযের উদ্দেশ্য হলো যিকুর বা আলাহর স্মরণ। যে ব্যক্তি আলাহকে স্মরণ করে, সে কম বেশি গোনাহ থেকে অবশ্যই বিরত থাকে। নামায না পড়লে সে আরও বেশি পাপে লিপ্ত হতো।
৩. কেউ কেউ বলেন নামায বিরত রাখে না, বরং তা বিরত থাকার কারণ বা সবার সৃষ্টি করে।
৪. কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হলো: নামায বান্দাকে গোনাহ থেকে বাঁধা প্রদান করে, কিন্তু কাউকে বাধা প্রদান করা হলেই সে উক্ত কাজ হতে বিরত হবে এমনটা জরুরি নয়। কেননা কুরআন হাদীসও মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে, কিন্তু মানুষ তার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করেই গোনাহ করে যায়।
৫. অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, নামাযে বাধা দেওয়ার অর্থ শুধু নিষেধ করা নয়, বরং নামাযের মধ্যে এমন বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক পায়। সুতরাং নামায দ্বারা মকবুল নামায উদ্দেশ্য। অতএব যার এরূপ তৌফিক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে, তার নামাযে কোন ত্রুটি আছে এবং সে নামায কায়েমের যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।^২

অতএব প্রমাণিত হলো যথানিয়মে নিয়মিত নামায আদায় করলে তাতে মানসিক উৎকর্ষ হাসিল হয়।

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৭

^২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১০৩১

সালাত নিয়ে উপহাসকারীদের পরিণাম

সালাত যেহেতু ইসলামের প্রধান ইবাদত, তাই একে যথাযথভাবে পালন করা যেমন- ফরয, তদ্রূপ একে নষ্ট করা বা এ নিয়ে হাস্যকৌতুক করাও জগণ্য অপরাধ। সালাত নিয়ে বিদ্রূপ করা একমাত্র কাফিরদের স্বভাব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আলাহ তাআলার বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَكِبَابًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمُ
إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا وَكِبَابًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِمَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ ۚ وَأَنَّ
أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مُتَوَبِّعًا عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ
اللَّهُ وَعَصَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ
مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

‘৫৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেল তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। আর তোমরা আলাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। ৫৮. আর যখন তোমরা নামাযের দিকে আহ্বান কর, তখন তারা এটাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেল তামাশা হিসেবে গ্রহণ করে। এটা এজন্য যে এটা এমন এক সম্প্রদায় যারা অনুধাবন করতে পারে না। ৫৯. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের সাথে এজন্যই শত্রুতা পোষণ করছ যে, আমরা আলাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আর আমাদের নিকট ও আমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আসলে তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী)। ৬০. (হে রাসূল) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে আলাহর নিকট এটা অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিদানের সংবাদ দিব? যাদের প্রতি আলাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর যাদের কতিপয়কে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন। আর যারা শয়তানের পূজা করছে তারা ই

অবস্থানগত দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল সোজা পথ থেকে অধিক বিদ্রান্ত ।’


মূল আলোচনা

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা যারা দীন ও শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে মুমিনদেরকে বারণ করেছেন এবং যারা আল্লাহ ব্যতীত তাগুত বা শয়তানের ইবাদত করে, তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন ।


শানে নুযূল


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مِّنْهُمْ﴾^১—এর শানে নুযূল

এ আয়াতে একাধিক শানে নুযূল রয়েছে । যথা—

১. তাফসীরে রুহুল মাআনীতে উল্লেখ আছে, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী  বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ بَنِ التَّائِبِ وَسُوَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، وَنَافَقًا، وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَادُّونَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস  থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রিফায়া ইবনে যয়েদ ইবনুত তাবুত এবং সুওয়াইদ ইবনুল হারিস প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করেছিল স্বার্থ হাসিলের জন্য, পরে মুনাফিক হয়ে যায় । এদিকে কতিপয় মুসলমানও তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে । এ বন্ধুত্ব পরিহার করার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল করেন ।’^১

২. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী  বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ قَوْمًا مِّنَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ ضَحَكُوا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَتَ سُجُودِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ.

^১ (ক) আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আখীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮. (খ) ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িলিল কুরআন, খ. ৮, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪, হাদীস: ১২২১৬

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, মুসলমান যখন নামায পড়তে গিয়ে সাজদা করত, তখন একদল মুশরিক ও ইহুদি এ নিয়ে হাসাহাসি করত। অতঃপর তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।’^১

১. মুহাম্মদ ইবনুস সাযিব আল-কালবী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

كَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَادَى إِلَى الصَّلَاةِ وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا، قَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ قَامُوا لَا قَامُوا، قَامُوا وَصَلُّوا لَا صَلُّوا عَلَى طَرِيقِ الْإِسْتِهْزَاءِ، وَضَحِكُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ هَذِهِ الْآيَةَ.

‘আল্লাহর রাসূল সালাতুহু ওয়াসাল্লাম -এর মুয়াযযিন যখন নামাযের ঘোষণা দিতেন, তখন মুসলমানগণ এসে নামাযে দণ্ডায়মান হতো। এ অবস্থা পর্যাক্ষেপ করে এক ইহুদি বলল, বাহ বাহ কেমন দাঁড়িয়েছে, আর কিভাবে নামায পড়ছে? এ নিয়মে তারা চরম ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করত। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।’^২

২. ইমাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِّنَ النَّصَارَىٰ بِالْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْ مُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: حُرِّقَ الْكَاذِبُ، فَدَخَلَ خَادِمُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِنَارٍ وَهُوَ وَأَهْلُهُ نِيَامٌ، فَتَطَايَرَتْ مِنْهَا شَرَارَةٌ، فَاخْتَرَقَ الْبَيْتَ، وَاخْتَرَقَ هُوَ وَأَهْلُهُ.

‘মদীনায় এক খ্রিস্টান ছিল। সে মুয়াযযিনের আযান ধ্বনিতে أَشْهَدُ (আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সালাতুহু ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল) শুনত, তখন বলত, حُرِّقَ الْكَاذِبُ (মিথ্যাবাদী জ্বলে

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৬, পৃ. ২২৩

^২ (ক) আল-ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযলিল কুরআন*, পৃ. ২০২-২০৩, হাদীস: ৩৯৯, (খ) আল-বগওয়ী, *মা‘আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৬৫

যাক)। ইত্যবসরে তার এক খাদেম আগুন নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে, ঘরে খ্রিস্টানটি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। আর তার পরিবার পরিজনও ঘুমের ঘোরে বিভোর ছিল। হঠাৎ করে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার ঘরে লেগে যায়। এতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে নিদ্রিত ব্যক্তিরাসহ তার ঘরবাড়ি জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এভাবেই তার বদদোয়ার সর্বগ্রাসী দাবানল তাকে এত অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করে ফেলল। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আলাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটুকু নাযিল করেন।^১

৩. কতিপয় মুফাসসির বলেন,


إِنَّ الْكُفَّارَ لَمَّا سَمِعُوا الْأَذَانَ حَسَدُوا الْمُسْلِمِينَ فَدَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! لَقَدْ أَبَدَعْتَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْ بِهِ فِيمَا مَضَى مِنَ الْأُمَمِ فَإِنْ كُنْتَ تَدْعِي النَّبُوَّةَ فَقَدْ خَالَفْتَ فِيمَا أَحَدَّثَتِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكَ وَلَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَّكَانَ أَوَّلَى النَّاسِ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، فَمِنْ أَيْنَ لَكَ صِيَاحٌ كَصِيَاحِ الْعَيْرِ؟ فَمَا أَفْبَحَ مِنْ صَوْتٍ وَمَا أَسْمَجَ مِنْ أَمْرٍ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت: ٤٤] الْآيَةَ.

‘কাফির ও মুনাফিকরা যখন আযান শুনতে পেত, তখন তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে নানা রকম হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ-এর দরবারে প্রবেশ করে বলত, হে মুহাম্মদ! তুমি এমন এক অভিনব পদ্ধতি চালু করলে, যার অনুরূপ কোন কাজ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে ছিল বলে আমাদের কেউ কোন দিন শুনেনি। তুমি তাদের নুরুওয়তের কথা স্বীকার করছ অথবা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছ। এ কাজের মধ্যে যদি কোন কল্যাণ নিহিত থাকত, তাহলে পূর্ববর্তী নবীগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই এ আমল করত। তুমি কোথা থেকে এ রীতির প্রচলন করলে যে, লোকজন এমন এক চিৎকার দিচ্ছে যা উষ্ট্রের চিৎকারের ন্যায়





^১ (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়াইলিল কুরআন*, খ. ৮, পৃ. ৫৩৭, হাদীস: ১২২১৮, (খ) আল-ওয়াহিদী, *আসবাবু নুয়লিল কুরআন*, পৃ. ২০৩, হাদীস: ৪০০, (গ) আল-বগওয়ী, *মাআলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৬৫

বিরক্তিকর? এর চেয়ে খারাপ চিৎকার আর কিছুই হতে পারে না। আর এর চেয়ে মন্দ বিষয় আর দুনিয়াতে নেই। তখন আলাহ রাব্বুল আলামীন ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ۝﴾ আয়াতসহ আলোচ্য আয়াতটি অবর্তীণ করেন।^১

এর শানে নুযুল

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তাবারী  বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَرٌ مِّنَ الْيَهُودِ فِيهِمْ أَبُو يَاسِرَ بْنُ أَخْطَبَ وَرَافِعُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَعَازِرُ وَخَالِدٌ وَزَيْدٌ وَأَزَارُ بْنُ أَبِي أَرَارٍ وَأَشْيَعُ، فَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنَ الرُّسُلِ، فَقَالَ: «أُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نُنْفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسَىٰ جَحَدُوا نُبُوَّتَهُ، وَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَىٰ، وَلَا نُؤْمِنُ بِمَنْ آمَنَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْفُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ... وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস  থেকে বর্ণিত করেন, একদল ইহুদি যাদের মধ্যে আবু ইয়াসির ইবনে আখতাব, রাফি’ ইবনে আবু রাফি’, আযির, খালিদ, যায়দ, আযার ইবনে আবু আযার ও আশয়াউ ছিল। তারা মহনবী -এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ! তুমি কোন কোন রাসূলের প্রতি এবং কোন কোন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন কর? তখন নবী করীম  উত্তরে বললেন, ‘আমি ঈমান এনেছি আলাহ তাআলার প্রতি, আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি। আরও ঈমান এনেছি ঈসা, মূসা  ও সকল নবীকে যা প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি। আমি কোন নবী রাসূলের মাঝে পার্থক্য করি না। আর আমরা

^১ (ক) আল-ওয়াহিদী, আসবাবু নুযুলিল কুরআন, পৃ. ২০৩, হাদীস: ৪০১, (খ) আল-বগওয়ী, মা’আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৬৫

আলাহ তাআলার প্রতি আত্মসমর্পণকারী।^১ রাসূল ﷺ তাঁর বক্তব্যে যখন ঈসা ^{আল্লাহর রাসূল} ^{সালাম} -এর কথাও উল্লেখ করলেন, তখন তারা তাঁর নুবুওয়াত অস্বীকার করল এবং বলে উঠল, আমরা ঈসার নুবুওয়াতকে স্বীকার করি না, এমনকি যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, আমরা তাদেরকেও বিশ্বাস করি না। তখনই আলাহ তাআলা এ আয়াতখানা নাযিল করেন।^২

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস খেলা মনে করে। এরা দু'দলে বিভক্ত। যথা—

১. আহলে কিতাব সম্প্রদায়।
২. সাধারণ কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায়।

স্বতন্ত্রভাবে আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখের কারণ

তাফসীরে আল-বাহরুল মুহীতে বলা হয়েছে, যদিও ^{কিতাব} শব্দের মধ্যেই আহলে কিতাবরা শামিল, তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো:

১. তারা কাফিরদের তুলনায় মুসলমানদের নিয়ে বেশি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।
২. কাফিরদের তুলনায় তারা সত্যের বেশি কাছে হওয়া সত্ত্বেও অহংকারবশত তারা ঈমান আনেনি।^২

মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্কের বৈধ ও অবৈধ দিকসমূহ

মুসলিম ও অমুসলিম দু'টি বিপরীতমুখীদল। এদের মধ্যে সম্পর্ক তিন ধরনের। এর মধ্যে প্রথম দুটি বৈধ ও শেষটি অবৈধ।

সম্পর্কের বৈধ দিকসমূহ

১. ^{المُعَامَلَةُ} (লেনদেন)। এটি কাফিরদের সাথে জায়িয়। সুতরাং মুসলমানদের জন্য কাফিরদের সাথে বোচা-কেনা বৈধ। তবে হরবী কাফিরের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা হারাম।
২. ^{الدِّيارَةُ} (বাহ্যিক সম্প্রীতি দেখানো)। এটি তিনটি শর্তে জায়িয়। তা হলো:
ক. কাফির যদি কোন মুসলমানের মেহমান হয়।

^১ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৫৯৬-৫৯৭, হাদীস: ২১০১ ও খ. ৮, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮, হাদীস: ১২২১৯

^২ আবু হাইয়ান আল-উনদুলুসী, আল-বাহরুল মুহীত ফী তাফসীর, খ. ৪, পৃ. ৩০২

খ. যদি কাফিরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা থাকে ।

গ. যদি কাফিরের পক্ষ থেকে ভীতির সম্ভাবনা থাকে ।

সম্পর্কের অবৈধ দিকসমূহ

৩. **الْمَوَالَةُ** (আন্তরিক বন্ধুত্ব) । তা কখনই কোন মুসলমানের জন্য জাযিয় নয় ।

কেননা কুরআনে বর্ণিত আছে,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

‘কোন মুমিন যেন অন্য মুমিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফিরকে বন্ধু না বানায় ।’^১

শরয়ী বিধি-বিধান নিয়ে উপহাসকারীদের হুকুম

ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকরা দীন ইসলাম ও শরয়ী বিধানবলীর সাথে ঠাট্টা মশকারা করে । তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে । এ জন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন,

اسْتَهْزَاءُ الشَّرِيعَةِ كُفْرٌ.

‘শরীয়ত নিয়ে বিদ্রূপ করা কুফরী কাজ ।’

আলামা জামালুদ্দীন আল-কাসিমী رحمته الله تعالى বলেন, ৫৭ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ‘দীন নিয়ে ঠাট্টা করা কুফরী ।’^২

ইমাম জামালুদ্দীন আস-সুয়ূতী رحمته الله تعالى বলেন, তাঁর *আল-ইকলীল ফী ইসতিমাতিত তানযীল* কিতাবে ৫৮ আয়াত সম্পর্কে বলেন,

أَصْلٌ فِي كَفْرِ الْمُسْتَهْزِئِ بِشَيْءٍ مِّنَ الشَّرِيعَةِ.

‘এ আয়াতটি শরীয়তের যেকোন বিষয় নিয়ে উপহাসকারীকে কাফির বলার দলীল ।’^৩

আলাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ﴾ (হে মুসলমানগণ! তোমরা যখন আযান প্রদান কর, তখন ইহুদি-খ্রিস্টানরা এটাকে হাসি-তামাশার বিষয় বলে মনে করে) । এ আয়াতে তাদের বিদ্রূপের ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়েছে ।

তাফসীরে কুরতুবী ও রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে যে, আয়াতস্থিত ﴿اتَّخَذُوا هُزُوًا﴾-এর ৬ যমীর দ্বারা নামায বা আযান উদ্দেশ্য । অর্থাৎ মুসলমানরা যখন

^১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:২৮

^২ আল-কাসিমী, *মাহাসিনুত তাওযীল*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭

^৩ আস-সুয়ূতী, *আল-ইকলীল ফী ইসতিমাতিত তানযীল*, পৃ. ১১৩

নামায আদায়ের জন্য আযান দিত, তখন তারা তাদের আযান এবং নামায আদায় নিয়ে ঠাট্টা করত ।^১

মুহাম্মদ ইবনুস সাযিব আল-কালবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانَ إِذَا أُذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ قَامُوا لَا قَامُوا، وَكَانُوا يَضْحَكُونَ إِذَا رَكَعَ الْمُسْلِمُونَ وَسَجَدُوا وَقَالُوا فِي حَقِّ الْأَذَانِ: لَقَدْ ابْتَدَعْتَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْ بِهِ فِيهَا مَضًى مِنَ الْأَمْرِ، فَمِنْ أَيْنَ لَكَ صِيَاحٌ مِثْلَ صِيَاحِ الْعَيْرِ؟ فَمَا أَقْبَحَهُ مِنْ صَوْتٍ، وَمَا أَسْمَجَهُ مِنْ أَمْرٍ.

‘মুয়াযযিন আযান দিলে যখন মুসলমানরা নামাযে দাঁড়াত, তখন ইহুদিরা বলত, দেখ! দেখ! দাঁড় হয়ে আছে! মুসলমানরা রুকু বা সাজদা করলে তারা হাসাহাসি করত। আর আযান দিলে তারা বলত, এরা এমন একটি বিষয় নতুন সৃষ্টি করেছে যা আমরা কোন কালে শুনিনি। এ গাধার আওয়াজ কোথা থেকে পেল! এটা খুব বিভৎস আওয়াজ। খুবই নিকৃষ্ট কাজ এবং নামাযের সময় হলে তারা নামাযীদেরকে বোকা বলত এবং উপহাসের চলে হাসাহাসি ও খৌচাখুঁচি করত।’^২

এ আযাতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসিমী স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে বলেছেন, এ আযাত সম্পর্কে আরও দু’টি ঘটনা আছে, যা এ আযাতের মর্ম উদ্ধারের সহায়তা করে। যথা—

১. আবু সুফিয়ানের ঘটনা: মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَعَتَّابُ بْنُ أُسَيْدٍ وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عَتَّابُ بْنُ أُسَيْدٍ: لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ أَسِيدًا أَلَّا يَكُونَ سَمِيعَ هَذَا، فَيَسْمَعَ مِنْهُ مَا يَغِيظُهُ، فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ: أَمَا وَاللَّهِ، لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّهُ مُحِقٌّ لَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا أَقُولُ شَيْئًا، لَوْ تَكَلَّمْتُ لَأَخْبَرْتُ عَنِّي هَذِهِ الْحَصَى، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي قُلْتُمْ»، ثُمَّ ذَكَرَ

^১ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ২২৪

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ২২৪

ذَلِكَ لَهُمْ، فَقَالَ الْحَارِثُ وَعَتَّابٌ: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهُ! مَا أَطْلَعَ
عَلَى هَذَا أَحَدٌ كَانَ مَعَنَا، فَتَقُولُ أَخْبَرَكَ.

‘মক্কা বিজয়ের রাসূল ﷺ কাবা ঘরে প্রবেশ করলে সাথে হযরত বিলাল
আনসি ছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর আদেশে তিনি আযান দিলেন।
তখন আবু সুফিয়ান, আত্তাব ইবনে আসীদ এবং হারিস ইবনে হিশাম
কাবার চত্বরে বসা ছিল। আত্তাব বললেন, আলাহ তাআলা আসীদকে
রহম করেছেন, অন্যথায় তিনি থাকলে এ আওয়াজ শ্রবণ করে শুধু রাগই
করতেন। হারিস বলল, আমি যদি জানতাম সে সত্যবাদী তবে অনুসরণ
করতাম। আবু সুফিয়ান বলল, আমি কিছুই বলব না তাহলে এ
পাথরগুলো তা মুহাম্মদকে জানিয়ে দেবে। অতঃপর রাসূল ﷺ এসে
বললেন, ‘তোমরা যা বলছ তা আমি জানি’ এবং সব ঘটনা বলে দিলেন।
অতঃপর হারেস ও আত্তাব বলল, আপনাকে সংবাদ দেওয়ার মতো কেউ
নেই। আমরাও কেউ বলিনি। অতঃপর কালিমা পড়ে তারা মুসলমান
হয়ে গেল।’^১

২. আবু মাহজুরার ঘটনা: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল-মুদাওয়ানি বর্ণনা করেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ... قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي مُحْدُورَةَ: يَا عَمَّ! إِنِّي خَارِجٌ إِلَى
الشَّامِ، وَأَخَشَى أَنْ أَسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مُحْدُورَةَ، قَالَ لَهُ: نَعَمْ
خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنَّا بَعْضُ طَرِيقِ حُنَيْنٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ،
فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ، وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَّخْنَا
نَحْكِيهِ، وَنَسْتَهْرِئُ بِهِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْتَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنْ
وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ
ارْتَفَعَ؟» فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ، وَصَدَفُوا فَأَرْسَلَ كُلُّهُمْ، وَحَبَسَنِي، فَقَالَ:
«فَمُ فَاذَّنَ بِالصَّلَاةِ» فَقُمْتُ، وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا مِمَّا
يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَلْفَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

^১ (ক) আল-কাসিমী, *মাহাসিনুত তাওযীল*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮, (খ) ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাওয়ায়া*,
খ. ২, পৃ. ৪১৩

التَّائِذِينَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «ارْجِعْ فَاْمُدِّ مِنْ صَوْتِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ فَضِيتُ التَّائِذِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ فَضِيَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مُحَمَّدُورَةَ، ثُمَّ أَمَارَهَا عَلَى وَجْهِهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صُرَّةَ أَبِي مُحَمَّدُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَرَّنِي بِالتَّائِذِينَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ، وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীজ রাহুল আল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মাহজুরা রাহুল আল্লাহ কে বললেন, হে পিতা! আমি সিরিয়া যাচ্ছি। আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে পারি। দয়া করে আপনার আযান সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। আবু মাহজুরা বললেন, শোন, একদিন আমরা একদল ছেলেপুলে হুনাইনের পথে বের হলাম। দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন থেকে ফিরছেন। রাস্তায় তাঁর সাথে আমাদের দেখা হলো। নামাযের সময় হলে তার মুয়ায্বিন আযান দিলে আমরাও উচ্চৈঃস্বরে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করে ব্যঙ্গ করলাম। অতঃপর আওয়ায শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডেকে পাঠালেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘কে বেশি জোরে ব্যঙ্গ করেছে?’ সবাই আমাকে দেখিয়ে দিলে তিনি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে আটকে রাখলেন। অতঃপর বললেন, ‘উঠ, আযান দাও।’ তখন আযানের বাক্য এবং নবীর চেয়ে বেশি ঘৃণিত আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে আযান শিখাতে লাগলেন। আমিও বলতে লাগলাম, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

ও

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ পর্যন্ত এসে এগুলো পুনরায় জোরে বলতে লাগলেন। অতঃপর আযান শেষ হলে আমাকে ডেকে এক পুটলি রূপা দান করলেন এবং তাঁর পবিত্র হাত আমার মাথার সম্মুখভাখে রেখে

দু'বার আমার মুখ মুছে দিলেন, দু'বার দু'হাতে অতঃপর বুকে এবং নাভি পর্যন্ত মুছে দিলেন এবং 'আলাহ তোমার বরকত দিন' বলে তিনবার দুআ করলেন। এর ফলে আমার অন্তরে রাসুলের ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়াতে আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং মক্কায় আযান দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। তখন আমাকে মক্কায় আযানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এর থেকে আমি সেভাবেই আযান দিতে থাকলাম।^১

নামায ও আযান ব্যঙ্গ করার পরিণতি

নামায ও আযান নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার পরিণতি খুবই ভয়বহ। নিম্নের ঘটনা দুটি থেকে তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

১. তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী রাহিতুল আলাযাহ-এর সূত্রে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ رَجُلٌ مِّنَ النَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَادِيَّ يُنَادِي أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: حُرِّقَ الْكَاذِبُ، فَدَخَلَتْ خَادِمُهُ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي بِنَارٍ وَهُوَ نَائِمٌ وَأَهْلُهُ نِيَامٌ، فَسَقَطَتْ شَرَارَةً، فَأَحْرَقَتْ الْبَيْتَ، فَاخْتَرَقَ هُوَ وَأَهْلُهُ.

‘মদীনায় জনৈক খ্রিস্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (আলাহ তাআলা মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করুক)। পরিণামে তার এ বাক্যটি তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মিভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাতে সে যখন ঘুমিয়েছিল এবং ঘরের সবাই নিদ্রায় বিভোর, তখন তার চাকর প্রয়োজনবশত ঘরে আগুন নিয়ে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অঙ্গাঙ্গে একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।’^২

২. সহীহ আল-বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিতুল আলাযাহ থেকে বর্ণিত আছে,

^১ (ক) আল-কাসিমী, *মাহাসিনুত তাওয়ীল*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮-১৭৯, (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৪, পৃ. ৯৭-৯৮, হাদীস: ১৫৩৮০

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৪, পৃ. ১১৬৩-১১৬৪, হাদীস: ৬৫৫৭, (খ) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৩, পৃ. ১৩৬

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يَحْيِي بَسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَأَنْبَعَثَ أَشَقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَظَرَّ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ.

‘কাফিররা নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখে হাসাহাসি করত, এমনকি নবী করীম ﷺ সাজদায় গেলে তারা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ত। একদিন তারা নবী ﷺ-এর মাথার ওপর উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। নরাধম ওকবা ইবনে আবু মুঈত গিয়ে উটের নাড়ি-ভুড়ি এনে নবী ﷺ-এর মাথার ওপর চাপিয়ে দিল। হযরত ফাতিমা রা এসে তা সরিয়ে দিলেন। পরে নবী ﷺ তাদের নাম ধরে বদ দুআ করলে তারা সবাই বদর যুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে অপমৃত্যুর কবলে পড়ে।’^১

আযানের বিবরণ

ক. আভিধানিক অর্থ

فَعَالَ শব্দটি فَعَالَ-এর ওযনে বাবে تَفَعَّلَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক

অর্থ হচ্ছে,

১. الْإِعْلَانُ (ঘোষণা দেওয়া)।
২. الْإِعْلَامُ (জানিয়ে দেওয়া)।
৩. الْتِدَاءُ (আহ্বান করা)।
৪. الْإِخْبَارُ (সংবাদ পৌছানো)।

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৫৭, হাদীস: ২৪০

৫. اَلنِّدَاءُ لِلصَّلَاةِ (নামাযের জন্য আহ্বান করা) ।

৬. اَلصَّوْتُ الرَّفِيعُ لِيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْجَمَاعَةِ (মানুষকে জামাআতের প্রতি উচ্চ আওয়াজে আহ্বান করা) ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. তানযীমুল আশতাত প্রণেতা বলেন,

اَلْاَذَانُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْفَاظِ مَحْصُوصَةٍ.

‘নির্দিষ্ট শব্দাবলির দ্বারা নামাযের ওয়াক্ত জানিয়ে দেওয়াকে আযান বলে ।’

২. কেউ কেউ বলেন,

اَلْاَذَانُ هُوَ اِعْلَانٌ مَّحْصُوصٌ بِالْفَاظِ مَحْصُوصَةٍ فِي اَوْقَاتٍ مَّحْصُوصَةٍ.

‘নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি ঘোষণার নাম আযান ।’

আযান ও ইকামতের শব্দাবলির সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যথা—

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رحمتهما اللہ -এর মতে, আযানের শব্দ মোট ১৫ টি আর ইকামতের শব্দ মোট ১৭ টি ।

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস رحمتهما اللہ -এর মতে, আযানের শব্দ ১৭ টি আর ইকামতের সংখ্যা ১০ টি ।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী رحمتهما اللہ -এর মতে, আযানের শব্দ সর্বমোট ১৯ টি আর ইকামতের শব্দ মোট ১১ টি ।

নিচে চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

আযান

শব্দাবলি	হানাফী মত	মালিকী মত	শাফিয়ী মত
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার	২ বার	৪ বার
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার	৪ বার	৪ বার
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার	৪ বার	৪ বার
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	২ বার	২ বার	২ বার

১ মাওলানা আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত লি-হগ্লি আওয়ীয়াতিল মিশকাত, খ. ১, পৃ. ২৪৩

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	২ বার	২ বার
اللَّهُ أَكْبَرُ	২ বার	২ বার	২ বার
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	১ বার	১ বার	১ বার
মোট	১৫ বার	১৭ বার	১৯ বার

ইকামত

শব্দাবলি	হানাফী মত	মালিকী মত	শাফিয়ী মত
اللَّهُ أَكْبَرُ	৪ বার	২ বার	২ বার
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	২ বার	১ বার	১ বার
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ	২ বার	১ বার	১ বার
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	২ বার	১ বার	১ বার
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	১ বার	১ বার
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ	২ বার	১ বার	২ বার
اللَّهُ أَكْبَرُ	২ বার	২ বার	২ বার
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	১ বার	১ বার	১ বার
মোট	১৭ বার	১০ বার	১১ বার

সর্বপ্রথম আযান প্রচলন হওয়ার ঘটনা

আযান শুরু হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত শাহ ওয়ালী উলাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী মুহাদ্দিস আলিয়াহি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে হিজরত করার পর যখন সেখানে মসজিদ নির্মিত হলো, তখন তিনি মুসল্লিদেরকে নামায়ে একত্রিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। অথচ নামাযের সময় হলে লোকদেরকে ডাকার জন্য কোন সংকেত বা চিহ্ন ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে একটি অধিবেশনে বসলেন। এ অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব আসে। যথা— নামাযের সময় হলে ১. পতাকা উড়িয়ে দেওয়া, ২. অগ্নিপ্রজ্বলন করা, ৩. শিঙা বাজানো, ৪. ঢোল বাজানো। কিন্তু একটি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হলো না। কারণ যারা কাজ করবে তারা পতাকা দেখবে না। তাই প্রথমটি গ্রহণীয় নয়। অগ্নি জ্বালানো অগ্নিপূজকের কাজ। সূতরাং দ্বিতীয়টিও প্রত্যাখ্যান। শিঙা বাজানো খ্রিস্টানদের এবং ঢোল বাজানো ইহুদিদের কাজ। তাই তৃতীয় ও চতুর্থটিও প্রত্যাখ্যাত হলো। অতএব কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিন সভা মূলতবি হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
 طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَافُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ
 النَّافُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا
 أَذْكَكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ
 أَكْبَرُ، ... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ، قَالَ:
 وَتَقُولُ: إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، اللَّهُ أَكْبَرُ ... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ،
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرَوْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَالْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ»،
 فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ
 الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يُجِزُّ رِذَاءَهُ، وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى.

‘আমি স্বপ্নে দেখলেন যে, জনৈক লোক হাতে শিঙা নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! শিঙাটি বিক্রি করবে? তিনি বললেন, এটি কী করবেন? আমি বললাম, আমি শিঙা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযে ডাকব। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বিষয় শিক্ষা দেব কি? আমি তাঁকে বললাম, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, ওই ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-কে আযানের বিষয়গুলো শিখিয়ে দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু রাসূল এরশাদ করলেন-এর দরবারে হাজির হয়ে স্বপ্নের ঘটনাটি ব্যক্ত করলেন। রাসূল এরশাদ করলেন বললেন, ‘নিশ্চয় এটা একটি সত্য স্বপ্ন। তুমি হযরত বিলাল রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-কে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও।’ অতঃপর হযরত বিলাল রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-কে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিলাম এবং তিনি এই শব্দগুলো সহকারে আযান দিলেন। আযান শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু দৌড়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ করে বলছি, আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ স্বপ্নে যা দেখেছেন হুবহু আমিও তাই স্বপ্নে দেখেছি।’^১

^১ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৩৫-১৩৬, হাদীস: ৪৯৯

বর্ণিত আছে, সেই রাতে চৌদ্দজন সাহাবী একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। সুতরাং এভাবে সর্বপ্রথম ইসলামে আযানের প্রচলন হয়।

আযান ও ইকামত অহী না স্বপ্নযোগে প্রবর্তিত

আযান ও ইকামতের বিধান দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে না স্বপ্ন যোগে হয়েছে, এ বিষয়ে আলেমের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা—

১. জমহুর ওলামার ঐকমত্যে, প্রথমে আযান স্বপ্নযোগে প্রবর্তিত হয়েছে। পরে অহীর মাধ্যমে তার সত্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন-নাওয়ায়ী রাহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন,

رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ، فَشَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا بَوْحَى وَإِمَّا بِاجْتِهَادِهِ ﷺ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাহমতুল্লাহু আলাইহ আযানের পদ্ধতি স্বপ্ন দেখেছেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে বা নিজ গবেষণার মাধ্যমে তা বিধিবদ্ধ করেন।’^১

৩. কেউ কেউ বলেন, আযান অহীর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছে। মিরাজের রাতে নামাযের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সাথে আযান ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

যেমন— ইমাম আহমদ ইবনে নসর আদ-দাউদী রাহমতুল্লাহু আলাইহ বর্ণনা করেন,

عَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْأَذَانِ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ بِمَنِيَةِ أَيَّامٍ.

‘ইমাম ইবনে ইসহাক রাহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাহমতুল্লাহু আলাইহ ও হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাহমতুল্লাহু আলাইহ আযানের ব্যাপারে তাঁদের স্বপ্ন বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করার আট দিন পূর্বেই তাঁর কাছে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম আযান নিয়ে এসেছিলেন।’^২

স্বপ্ন শরীয়তের দলীল কিনা

নবী-রাসূলদের স্বপ্ন শরীয়তের দলীল। যেমন— হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ».

^১ আন-নাওয়ায়ী, *আল-মিনহাজ শরহু সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ৪, পৃ. ৭৬

^২ ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ২, পৃ. ৮২

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ^{রাযিআল্লাহু আনহুমা} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীদের স্বপ্ন অহীর অন্তর্ভুক্ত।’^১

আর এটি শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ আছে।
যথা—

১. হযরত ইবরাহীম ^{আলাইহিস সালাম} স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল ^{আলাইহিস সালাম}-কে কুরবানী দিচ্ছেন। যেমন— কুরআনের ভাষায়:

قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَى ۖ

‘ইবরাহীম বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিযে, তোমাকে যবেহ করছি।’^২

সুতরাং স্বপ্ন মোতাবেক তিনি তাই করলেন।

২. হযরত ইউসুফ ^{আলাইহিস সালাম} স্বপ্ন দেখেছেন, এগারটি তারকা এবং চন্দ্র, সূর্য তাকে সাজদা করছে। যেমন— কুরআনের ভাষায়:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

‘যখন ইউসুফ পিতাকে বললেন, পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সাজদা করতে দেখেছি।’^৩

৩. আল্লাহর রাসূল ^{আলাইহিস সালাম} স্বপ্ন দেখলেন, তিনি সাহাবীদের নিয়ে পবিত্র কাবাঘর তওয়াফ করছেন। যেমন— কুরআনের ভাষায়:

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُحْيَ بِالْحَقِّ ۚ لَنَنصُرَنَّ الْمُسْلِمِينَ ۚ إِن شَاءَ اللَّهُ ۚ

‘আলাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে।’^৪

আর নবী ও রাসূল ছাড়া আর কারো স্বপ্ন শরীয়তের দলীল হতে পারে না। তবে কোন নিদর্শন থাকলে নির্ভরযোগ্য লোকের স্বপ্ন দলীল হতে পারে। যেমন— আযানের স্বপ্ন দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কেননা অগণিত সাহাবী এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন। আর অহীর দ্বারা এই স্বপ্নটির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

^১ আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরক আল্লাস-সাহীহাইন*, খ. ২, পৃ. ৪৬৮, হাদীস: ৩৬১৩

^২ আল-কুরআন, *সূরা আস-সাফাত*, ৩৭:১০২

^৩ আল-কুরআন, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৪

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:২৭

মূলকথা হচ্ছে নবী ও রাসূলদের স্বপ্ন নিঃসন্দেহে শরীয়তের দলীল। এছাড়া অন্যদের স্বপ্ন যদি مُتَّصِلٌ بِالْفَرَايِنِ (নিদর্শনযুক্ত হয়) এবং নবী ﷺ তা গ্রহণ করে নেন, তাহলে সেটিও শরীয়তের দলীল হতে পারে নিঃসন্দেহে।

সর্বপ্রথম আযান স্বপ্ন দেখেছেন

এ ব্যপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা—

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযিয়ার্হু আনহু আযানের শব্দগুলো স্বপ্ন দেখেছেন।
২. আত-তালীক গ্রন্থকার বলেন, সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়ার্হু আনহু আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেছেন।

তবে জমহুরের অভিমতটি গ্রহণীয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযিয়ার্হু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন,

طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبْعُ النَّاقُوسَ.

‘আমি ঘুমে স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক লোক হাতে শিঙা নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম, হে আবদুল্লাহ! শিঙাটি বিক্রি করবে?’^১

হযরত বিলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ প্রদানের কারণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ অথবা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়ার্হু আনহু সর্বপ্রথম স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু যিনি দেখেছেন রাসূল ﷺ তাকে আযান দিতে বলেননি, বরং তিনি হযরত বিলাল রাযিয়ার্হু আনহু-কে আযান দিতে বলেছেন। যেমন— হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়ার্হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘হযরত বিলাল রাযিয়ার্হু আনহু-কে আযান জোড়া শব্দে এবং ইকামত বেজোড় শব্দে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’^২

এর কারণ বর্ণনায় হাদীস বিশারদগণ বলেছেন,

১. আযানের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী হওয়া। হযরত বিলাল রাযিয়ার্হু আনহু ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী। তাই রাসূল ﷺ তাঁকেই আযান দিতে বলেছেন।

^১ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৬, পৃ. ৪০২, হাদীস: ১৬৪৭৮

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৮৬, হাদীস: ২ (৩৭৮)

২. হযরত বিলাল রাঃ-এর আযানের ধ্বনি এমন দূর পর্যন্ত পৌঁছত, অন্য কারো ধ্বনি সে পর্যন্ত পৌঁছত না। তাই রাসূল সঃ তাঁকে আযান দিতে বলেছেন।
৩. হযরত বিলাল রাঃ-এর আযানের মধ্যে যে আবেগ ছিল, অন্য কারো মধ্যে তা ছিল না। তাই আল্লাহর রাসূল সঃ তাঁকে আযান দিতে নির্দেশ করেছেন।

ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম

এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা—

১. ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাঃ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফি'রী রাঃ-এর মতে, ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য আযান দিতে হবে না। শুধু ইকামত দিলেই যথেষ্ট হবে।
২. ইমামে আযম আবু হানিফা রাঃ ও ইমাম আবু সওর ইবরাহীম ইবনে খালিদ আল-কালবী রাঃ-এর মতে, ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য আযান, ইকামত উভয়টি দিতে হবে। কেননা রাসূল সঃ لَيْلَةُ النَّعْرِيسِ-এর ফজরের নামাযে হযরত বিলাল রাঃ-কে আযান দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ইকামতের মাধ্যমে নামায আদায় করেছিলেন। যেমন— হাদীসে এসেছে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত,

ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا، فَأَذَّنَ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى
الْفَجْرَ.

‘অতঃপর মুয়াযযিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন, তারপর তিনি আযান দেন। অতঃপর ফজরের দু’রাকাআত নামায আদায় করেন এবং দাঁড়িয়ে ফজরের নামায পড়েন।’^১

মুসাফিরের জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম

মুসাফিরগণ যদি নিজেরা জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতে চায়, তাহলে আযান ও ইকামত উভয়টি দিতে হবে। আর যদি কোন এলাকার ইমামের পেছনে নামায আদায় করে, তাহলে সে মসজিদের আযান ও ইকামত তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

নফলের জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম

সকল ইমামের ঐকমত্যে, নফল নামাযের জন্য আযান ও ইকামত কোনটিরই প্রয়োজন নেই।

^১ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১২১, হাদীস: ৪৪৩

সাহরী খাওয়ার জন্য আযান দেওয়ার হুকুম

সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সকলকে জাগিয়ে তোলার জন্য আযান দেওয়া জাযিয় আছে। কেননা সাহরীর জন্য হযরত বিলাল রাঃ আযান দিতেন। এজন্য রাসূল সঃ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলছেন,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ রাঃ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ সঃ: «لَا يَغْرَزْكُمْ أَذَانٌ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا».

‘হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সঃ ইরশাদ করেন, ‘হযরত বিলাল রাঃ-এর আযান ও ভোরের এ সাদা স্তম্ভ যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে ভোর হওয়ার ক্ষেত্রে, বরং চারদিকে চওড়াভাবে আলোকিত হওয়াই প্রকৃত ভোর।’^১

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ সঃ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

‘হযরত আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সঃ ইরশাদ করেন, ‘হযরত বিলাল রাঃ রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই ইবনে উম্মু মাকতুম রাঃ যতক্ষণ আযান না দেন ততক্ষণ তোমরা সাহরী (পানাহার) করতে পার।’^২

তবে বর্তমানে এ আযান না দেওয়াই উত্তম।

দু’নামায একত্রে আদায়ের জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম

ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে দু’নামায একসাথে পর পর আদায় করতে হলে ভিন্ন ইকামত দেওয়া অপরিহার্য। তবে আযান ভিন্ন ভিন্ন দিতে হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১. কেউ কেউ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আযান দিতে হবে না, তবে প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়াই যথেষ্ট।
২. আবার কেউ বলেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য ভিন্ন আযান দিতে হবে।

আযান প্রচলনের স্থান ও কাল

কোথায় এবং কখন আযান প্রবর্তিত হয়েছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা—

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৬৯, হাদীস: ৪২ (১০৯৪)

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১২৭, হাদীস: ৬২২

১. কতিপয় আলেমের মতে, হযরতের পূর্বে মক্কায় আযান প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جِرْبِيلَ أَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْأَذَانِ حِينَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ.

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক ^{রয্যাহু} থেকে বর্ণিত, হযরত জিবরীল ^{আলাইহিস সালাম} নবী করীম ^{আলাইহিস সালাম}-কে যখন নামায ফরয করা হয়েছে তখনই আযানের নির্দেশনা দেন।’^১

২. অপর এক বর্ণনা মতে, মিরাজের রাতে রাসূল ^{আলাইহিস সালাম}-কে নামাযের সাথে আযান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
৩. জমহূর মুহাদ্দিস ও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আযান প্রথম হিজরীতে মদীনায প্রবর্তিত হয়েছে। এ কারণে ইমাম আবু বকর ইবনুল মুনযির ^{রহমাহু} অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন,

أَنَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ مُنْذُ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

‘নবী করীম ^{আলাইহিস সালাম} মদীনা শরীফে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যতদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করেছেন নামায ফরয হওয়ার সময় থেকেই তিনি আযান ছাড়া নামায পড়েছেন।’^২

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাজার আল-আসকলানী ^{রহমাহু}-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে মদীনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলার ঘোষণা,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

‘মুমিনগণ! জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরান্বিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।’^৩

আযান প্রবর্তনের হিকমত

ইসলামে আযান প্রবর্তনের পেছনে অনেকগুলো হিকমত রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখ্যযোগ্য:

^১ ইবনে আব্বাদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ১, পৃ. ৩৮৩

^২ ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ২, পৃ. ৭৯

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আল-জুমআ*, ৬২:৯

১. আযান দ্বারা মহান আলহর একত্ববাদ, মহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়।
২. আযান দ্বারা মহনবী ﷺ-এর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়।
৩. আযানের মাধ্যমে নামাযে ইসলামের যে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, তা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়।
৪. আযানের দ্বারা গণমানুষের মধ্যে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়।
৫. আযানের মাধ্যমে উভয় জাহানের কল্যাণের ঘোষণা দেওয়া হয়।
৬. আযানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব নমুনা প্রস্ফুটিত হয়।
৭. আযানের ফলে মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার মিলনের শুভসূচনা হয়।
৮. আযান দেওয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ জামায়াতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে সমবেত হতে পারে।
৯. আযানে মুয়াযযিন যখন ﷻ ধ্বনি দেয়, তখন আলহর শ্রেষ্ঠত্বের বজ্রধ্বনিতে অবিশ্বাসীর আত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠে।
১০. আযানে ﷻ বলার দ্বারা মুশরিকদের অংশীদারিত্বের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষিত হয় এবং গুরুগম্ভীর উপস্থাপনে তার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।
১১. আযানে ﷻ বলার সাথে সাথে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রাসূল ﷺ-এর রিসালাত ও নুবুওয়াতের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয় এবং তার পক্ষে যাবতীয় বাধা বিপত্তির উপেক্ষা ও মোকাবিলা করার শপথ নেওয়া হয়।
১২. আযানে ﷻ এবং অন্যান্য বাক্যগুলো দ্বারা জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, আমাদের যাবতীয় ইবাদতের মূল লক্ষ্য হলেন মহান আলহ। আর তিনি যেহতু সর্বশ্রেষ্ঠ, একক, অদ্বিতীয় তাই ইবাদত একমাত্র তারই জন্য হবে। অন্যকারো জন্য নয়।
১৩. সর্বোপরি আযান মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়ার ছকুম

সকল ইমামের ঐকমত্যে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাযের ক্ষেত্রে সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়ার জায়য নেই। তবে ফজরের নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী রহমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমাহুল্লাহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাহুল্লাহ ও ইমাম আবু ইউসুফ রহমাহুল্লাহ-এর মতে, ফজর নমাযের বেলায় সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জাযিয় আছে। তাঁদের দলীল হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّىٰ يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘হযরত বিলাল রহমাহুল্লাহ রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই ইবনে উম্মু মাকতুম রহমাহুল্লাহ যতক্ষণ আযান না দেন ততক্ষণ তোমরা সাহরী (পানাহার) করতে পার।’^১

২. ইমামে আযম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাহুল্লাহ-এর মতে, ফজরের নামাযসহ সকল নামাযের ক্ষেত্রে সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জাযিয় নেই। তাঁদের দলীল হচ্ছে,

عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَا تُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا»، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرَضًا.

‘হযরত বিলাল রহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, ‘পূর্ব দিগন্তে ফজরের আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দেবে না’-এই বলে তিনি স্বীয় হস্তদ্বায় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করেন।’^২

عَنْ حَفْصَةَ ٱلرَّحْمَنِ، أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

‘হযরত হাফসা রহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তাঁরা নামাযের জন্য উষা উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেওয়া হতো না।’^৩

ইমামত্রয়ের উপস্থাপিত সময় হওয়ার পূর্বে হযরত বিলাল রহমাহুল্লাহ-এর আযান সংক্রান্ত হাদীসের জবাবে বলা হয়, সময় হওয়ার পূর্বে হযরত বিলাল রহমাহুল্লাহ যে আযান দিতেন তা হলো তাহাজ্জুদের আযান। এটা ফজরের নামাযের আযান ছিল না।

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১২৭, হাদীস: ৬১৭

^২ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৫৩৪

^৩ আত-তাহাওয়া, *শরহু মা‘আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৮৬৫

আযান ও ইকামতের সুন্নতসমূহ

জামায়াতের সাথে নামায পড়া হলে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান ইকামত দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তবে ঈদের নামায, বিতরের নামায, তারাবীহের নামায, কুসূফ-খুসূফ ও ইসতিসকার নামায ইত্যাদির জন্য আযান দেওয়া সুন্নত নয়।

আযানের সুন্নত তরীকা

১. উচ্চ আওয়াজে আযান দেওয়া।
২. আযানের প্রত্যেক বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করা।
৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী رحمہ اللہ -এর মতে, شَهِادَتَيْنِ-এর মধ্যে تَرْجِعُ করা।

আর ইকামতের সুন্নত তরীকা

১. ইকামতের দুটি বাক্য একসাথে উচ্চারণ করা।
২. ইকামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি করে বলা।
৩. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এর পর حَيَّ দু'বার বৃদ্ধি করা।

কাফিররা সত্য ধর্মের ব্যাপরে যে উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রোপ করছে এর অন্য কোন কারণ নেই, বরং এর একমাত্র কারণ হলো তারা নিরোধ। কেননা বুদ্ধিমান তাকেই বলা হয়, যে ঠাট্টা-বিদ্রোপ পরিহার করে এবং বস্তুত ভালো-মন্দ উভয়দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থকার আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী رحمہ اللہ বলেন,

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرِينَ مَعَ كَوْنِهِمْ عَاقِلِينَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا كَمَا يَشْهَدُهُ الْبَدَاهَةُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا مِّنْ أُمُورِ الدِّينِ.

‘আলোচ্য আয়াতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিররা পার্থিব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী সত্ত্বেও দীনী ব্যাপারে তারা মোটেই অনুধাবন করত না।’^১

আর আল্লাহ তাআলার কাছে বুদ্ধিমান সেই যে দীন ও পরকালের ব্যাপরে জ্ঞান রাখে। কাফিররা দুনিয়ার সংসার ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখলেও আখিরাতে ব্যাপারে তারা ছিল চরম উদাসীন। যেমন- অন্য আয়াতে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

^১ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৩, পৃ. ১৩৭

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٦٠﴾

‘তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো বেশ বুঝে, কিন্তু পরকালীন জীবনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন।’^১

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ...وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٦١﴾-এর ব্যাখ্যা

৫৯ ও ৬০ আয়াতে আলাহ তাআলা ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপকারী ইহুদিদেরকে লক্ষ করে নবী ﷺ-কে বলতে বলেছেন, ‘হে বিদ্রূপকারীরা! তোমরা আমাদেরকে যে দোষে দোষারূপ কর তার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা আলাহ তাআলা, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের প্রতি অবতারিত কিতাব এবং আমাদের ওপর নাযিলকৃত কিতাবকে বিশ্বাস করি। বস্তুত তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক। তোমরা যদি তোমাদের দাবি অনুযায়ী যারা খারাপ, তাদের চেয়ে আরও খারাপ লোকের কথা জানতে চাও, তবে তারা হলো সেসব লোক যাদের ওপর আলাহ তাআলার লানত এবং গযব নাযিল হয়েছিল এবং যারা বানর, শোয়োর এবং মূর্তিপূজারি হয়েছিল। তারা সঠিক পদচ্যুত।’

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ...وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٦٢﴾-এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতে মহান আলাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তাদের অধিকাংশই ফাসিক خَارِجٌ عَنِ الطَّاعَةِ (আনুগত্য থেকে বিচ্যুত) অর্থাৎ তাদের সকলেই ফাসিক এমন নয়। কারণ তাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিল, যারা সর্ববিস্তার ঈমানের ওপর বহাল ছিল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়্যাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইনযীলের অনুসারী, আবার মহান নবী ﷺ নবুওয়্যাত লাভ করলেন, তখন থেকে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে থাকে। তবে তাদের অধিকাংশই সত্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ ﴿٦٣﴾-এর ব্যাখ্যা

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর رحمته الله আলোচনা করেন,

قُلْ ... هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ جَزَاءٍ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِمَّا تَعْمَلُونَ بِنَا؟

‘হে মুহাম্মদ! আপনি ইহুদি সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বলে দিন, তোমরা যে দীনকে মন্দ মনে করছ, আসলে তা মন্দ নয়, বরং আমি কি

^১ আল-কুরআন, সূরা আর-রুম, ৩০:৭

তোমাদেরকে এমন কথা বলব, যার পরিণাম কিয়ামত দিবসে আলাহ তাআলার নিকট অধিকাংশ মন্দ?''^১

হ্যাঁ সেই কথাতো তাদের ব্যাপারে যাদেরকে আলাহ তাআলা লানত করেছেন, যারা আলাহ তাআলা ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং যাদের মধ্য থেকে আলাহ তাআলা কতিপয়কে শোয়োর অথবা বানরে পরিণত করেছেন এবং যারা সর্বদা শয়তানের দাসত্ব করে। তাদের চরম বাড়াবাড়ি, অনাচার, অশীল্লতাই ছিল এ দূরাবস্থার মূল কারণ। এ সমস্ত লোকের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং পরিণাম খুবই মন্দ। অতএব পরিণতির নিকৃষ্টতা বিচার করলেই তারা চরম নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

^১ ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৩, পৃ. ১৩০

মুনাফিকের সালাত আদায়ের বর্ণনা

সঠিক ও সুন্দরভাবে সালাত আদায় করা মুমিনের কাজ। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা সুন্দর করে সালাত আদায়ে ব্রতী হয় না। তাদের অন্তরের কপটতা সালাতে প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে ইরাশাদ হয়েছে,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ۖ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

‘নিশ্চয় মুনাফিকরা আলাহ তাআলার সাথে প্রতারণা করছে, অথচ তিনি তাদের এই প্রতারণার প্রতিফল দান করবেন। আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন নিতান্ত অলসতার সাথেই দাঁড়ায়। তারা শুধু লোকদেরকে দেখায়। আর তাদের প্রতি অল্পসংখ্যক লোকই আলাহ তাআলাকে স্মরণ করে।’^১

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

‘৪. অতএব ধ্বংস সেসব নামাযীদের। ৫. যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। ৬. তারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। ৭. এবং নিত্য ব্যবহার্যবস্তু অন্যকে দেয় না।’^২

মূল আলোচনা

আলোচ্য আয়াত গুলোতে আলাহ তাআলা মুনাফিকদের খারাপ চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা নামাযে অলসতা করে, লোকদেখানো ইবাদত করে এবং কৃপণতা করে। তারা আলাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিতে চায়। মূলত তারা নিজেরাই ধোঁকাগ্রস্ত ও দিকভ্রান্ত। কখনো তারা সঠিক পথ পাবে না। তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

শানে নুযূল

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ আয়াতের শানে নুযূল

আলোচ্য আয়াতটি মুনাফিকদের দু’টি মন্দ চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করার নিমিত্তে অবতীর্ণ হয়। তাদের চরিত্র দু’টি হলো:

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪২

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-মাউন, ১০৭:৪-৭

১. এরা সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দে ভোগে অর্থাৎ মুসলমান এবং কাফির কোন দলেই তারা একান্ত আন্তরিকতার সাথে যোগদান করে না।
২. তাদের আরেকটি বদ-অভ্যাস হলো তারা যখন নামায আদায়ে নিমিত্তে দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা নিতান্ত অলসতা এবং অমনোযোগিতার সাথে দাঁড়ায়, তারা এ নামাযকে ফরযই মনে করে না। এতে পূণ্য আছে বলেও বিশ্বাস করে না। মূলত তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ... الْاٰیَةُ... ۝

এ আয়াতসমূহ সূরা আল-মাইনের অন্তর্গত। এ সূরায় শানে নুযূল উপস্থাপনে মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন মতভেদ আছে, আর তা হলো:

১. লুবার গ্রন্থের বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ الْاٰیَةُ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَرَاؤُونَ الْمُؤْمِنِينَ بِصَلَاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا وَيَتْرَكُونَهَا إِذَا غَابُوا، وَيَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةَ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুনাফিকরা নিজেদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এবং নিজেদের মুসলমান প্রমাণের জন্য প্রকাশ্যে মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো আর তাদের নিকট হতে চলে যাওয়ার পর সালাত পরিত্যাগ করতো, এতিম ও মিসকীনদের সাহায্য প্রদান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অপরকে প্রদান থেকে বিরত থাকত। তাদের এমন কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উৎঘাটন করার জন্য আলাহ তাআলা উক্ত সূরা নাযিল করেন।’^১

২. তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, এ সূরার প্রথম তিন আয়াত মক্কার ধনাঢ্য কাফির আস ইবনে ওয়ায়িল আস-সাহমী এবং অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মদীনার মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।^২
৩. অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আবু জাহালের অভ্যাস কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত হলে সে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলত, আপনার সম্পদ আমার দায়িত্বে রেখে যান; আমি তা দেখাশোনা করব। কিন্তু উক্ত লোকের মৃত্যুর

^১ (ক) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৯, পৃ. ১৭০, হাদীস: ৬৪৩৭, (খ) আস-সুযুতী, *লুবারুন নুহুল ফী আসবাবিন নুযূল*, পৃ. ২১৬

^২ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আখীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ১৫, পৃ. ৪৭৪

পর তার ছেলে আবু জাহালের নিকট গমন করলে আবু জাহাল তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। একদিন এক এতিম বালক রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করল, আবু জাহালের নিকট আমার অনেক সম্পদ রয়েছে সে আমাকে কিছুই দেয় না। ছেলেটির কান্নাকাটি ও অনুনয়-বিনয়ের পর রাসূল ﷺ নিজে আবু জাহালকে কিয়ামত দিবসের জবাবদিহিতা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক এতিমের সাথে ভালো ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চাইলে আবু জাহাল বলে উঠল, পরকাল আবার কী? আবু জাহালের এ উক্তির প্রতিবাদে মহান আলাহ এ সূরা নাযিল করলেন।

৪. ইমাম মুকাতিল রহঃ আলিয়াহি, ইমাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী রহঃ আলিয়াহি ও ইমাম জামাল উদ্দীন ইবনে জওয়ী রহঃ আলিয়াহি-এর মতে, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়।
৫. ইমাম যাহহাক রহঃ আলিয়াহি-এর মতে, হযরত আমির ইবনে আযিয় আল-মাখযুমী রহঃ আলিয়াহি সম্পর্কে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।^১

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহান আলাহ তাআলার বাণী: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ৯-এর অর্থ হলো: মুনাফিকরা আলাহ তাআলার সাথে প্রতারণা করে আর তিনিও তাদের প্রতারণার ফল দান করেন। বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে গোপন রাখাই মুনাফিকী। রাসূল ﷺ-এর সময়ে কতিপয় লোক অন্তরে কুফরী আকীদা লুকিয়ে রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলামের কথা বলত, অথচ তাদের মন-মানসিকতা সর্বদা ইসলামের ধ্বংস সাধনে তৎপর থাকত। এদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ ছিল এমন যে, বন্ধু বেশে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে গোপনীয় বিষয়সমূহ অবগত হয়ে তা কাফিরদের নিকট পৌঁছে দিত। প্রকাশ্য কাফিরদের চেয়ে এ বর্ণচোরা কাফিররা মুসলমানের জঘন্য শত্রু ছিল। প্রতারণা করা যায় সেই ব্যক্তির সাথে, যে ওই বিষয়ের কিছুই জানে না। আলাহ তাআলা তো সবকিছুই জানেন, তাহলে কিভাবে তাকে প্রতারিত করা যায়? এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী রহঃ আলিয়াহি বলেন,

يَفْعَلُونَ مَا يُفْعَلُ الْمُخَادِعُ، فَيُظْهَرُونَ الْإِثْمَانَ وَيُضْمِرُونَ نَيْيُضَهُ.

‘ধোঁকাবাজরা যে কাজ করে তারাও অনুরূপ কাজ করে, তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু এর বিপরীত জিনিস তথা কুফরী গোপন করে রাখে।’^২

^১ ইবনুল জওয়ী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৫

এটা আলাহ তাআলার সাথে ধোঁকাবাজিরই নামান্তর। মূলত মুনাফিকদের অনুসৃত কর্মনীতি যেহেতু প্রতারণার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল, সেহেতু তাদের কর্মবিচারে একে রূপক অর্থে আলাহ তাআলাকে প্রতারিত করা বলা হয়েছে।

অথবা তারা আল্লাহকে প্রতারিত করেছে এর অর্থ হলো, যারা আলাহর নবীকে প্রতারিত করেছে। আর নবীকে প্রতারিত করার অর্থ হলো আল্লাহকে প্রতারিত করা। কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ

‘যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে।’^২

আসলে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। তিনি সকল কিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ -এর ব্যাখ্যা

আলাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় মুনাফিকরা আলাহর সাথে প্রতারণা করছে আর আলাহ তাদের সাথে প্রতারণা করছেন। এ আয়াতে দু’টি প্রশ্ন জাগে। যথা—

১. আলাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিভাবে আলাহর সাথে প্রতারণা করছে?
২. আলাহ তাআলা কর্তৃক মুনাফিকদের সাথে প্রতারণার স্বরূপ কী?

প্রথম প্রশ্নে জবাব

১. ইমাম শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী রাহমতুল্লাহি বলেন, তারা আলাহকে ধোঁকা দেয় এর অর্থ হলো:

يَفْعَلُونَ مَا يُفْعَلُ الْمُخَادِعُ، فَيُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ وَيُضْمِرُونَ نَفْيَهُ.

‘তারা ধোঁকাবাজদের মতো কাজ করছে তথা ঈমান প্রকাশ করে এবং কুফরী গোপন রাখে।’^৩

২. অথবা বাক্যে مُضَافٌ উহ্য আছে। তখন মূল ইবারত হবে إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ -কে ধোঁকা দিচ্ছে)।

اللَّهُ (নিশ্চয় মুনাফিকরা আলাহর রাসূল রাহমতুল্লাহি কে ধোঁকা দিচ্ছে)।

৩. ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর রাহমতুল্লাহি বলেন, যদিও আলাহকে ধোঁকা দেওয়া যায় না, কারণ তিনি সবকিছুই জানেন। কিন্তু মুনাফিকরা অজ্ঞাতবশত

^১ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৩, পৃ. ১৬৮

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:১০

^৩ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৩, পৃ. ১৬৮

মনে করত যে, মানুষকে তারা যেমন- ধোঁকা দেয় তদ্রূপ আলাহ তাআলাকে তারা ধোঁকা দেবে। কিয়ামতে তারা কসম করে বলবে তারা সঠিক পথেই ছিল। যেমন- অন্য আয়াতে উল্লেখ আছে,

يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللَّهُ جَبِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ ۗ ۝

‘কিয়ামতের দিন দুনিয়ায় যেভাবে তারা শপথ করে ধোঁকা দিত, সেভাবে তারা আলাহর সামনেও কসম করবে।’^১

অর্থাৎ তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাইবেই, যদিও তাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নে জবাব

১. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله বলেন, প্রতারণা করা যদিও খারাপ, কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আলাহ তাদের সাথে প্রতারণা করবেন।’ এর অর্থ হলো: তাদের প্রতারণার প্রতিফলন দেবেন।
২. অথবা সাধারণত ধোঁকা দিতে যা করা হয়, আলাহ তাআলা তাদের সাথে তাই করবেন। যেমন- দুনিয়াতে তাদের জান-মাল সুরক্ষিত রেখে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান এবং জাহান্নামের তলদেশ তাদের জন্য নির্ধারণ করা।
৩. ইমাম হাসান আল-বাসারী رحمته الله বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, আলাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার এ প্রতারণার জবাব দেবেন। এভাবে পুলসিরার পার হওয়ার সময় মুমিন ও মুনাফিক সকলকেই আলাহ তাআলা একটি করে আলো দেবেন। এতে মুনাফিকরা খুশি হবে। তারা মনে করবে, তারা মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তারা যখন পুলসিরাতের কাছাকাছি আসবে, তখন তাদের আলো নিভে যাবে। এভাবে তাদের ধোঁকার জবাব দেওয়া হবে।^২

মুনাফিকদের পরিচয়

اَلْمُنَافِقُ-এর আভিধানিক অর্থ

اَلْمُنَافِقُ শব্দটি نَفَقٌ থেকে উদ্ভূত। এটি اِسْمٌ فَاعِلٌ-এর একবচনের শব্দ।

এর আভিধানিক অর্থ হলো:

১. اَلْخُرُوجُ (বের হওয়া)। যেহেতু মুনাফিকরা ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়, তাই তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়।
২. اِظْهَارُ خِلَافٍ مَا يُبْطِنُ (মনের বিপরীত প্রকাশ করা)।
৩. কপট বা প্রবঞ্চক।

^১ (ক) আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালা, ৫৮:১৮, (খ) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ.

২, পৃ. ৩৮৭

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ৪২২

الْمُنَافِقُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

এর পারিভাষিক পরিচয় নিম্নরূপ:

১. আল-মুজমাল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন,

الْمُنَافِقُ مَنْ يُخْفِي الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِيمَانَ، وَمَنْ يُضْمِرُ الْعَدَاوَةَ وَيُظْهِرُ الصَّدَاقَةَ، وَمَنْ يُظْهِرُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ.

‘মুনাফিক হচ্ছে সেই লোক যে অন্তরে কুফরী গোপন রাখে আর মুখে ঈমান প্রকাশ করে, যে অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে আর বাইরে বন্ধুত্বের ভাব দেখায় এবং ভেতরের বিপরীত প্রকাশ করে।’^১

২. আলামা বদরুদ্দীন আল-আইনী رحمہ اللہ আলিয়াহি-এর মতে,

هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ.

‘মুনাফিক হলো সেই লোক যে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে কুফরী গোপন রাখে।’^২

৩. কেউ কেউ বলেন,

هُوَ الدَّاخِلُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْهِ، وَخَارِجٌ عَنْهُ مِنْ آخَرٍ.

‘মুনাফিকরা এক দিক দিয়ে মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত, আবার অন্য দিক দিয়ে তারা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত।’

৪. ইকদুল ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে আছে,

هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِيمَانَ مَعَ الْكُفْرِ فِي الْقَلْبِ.

‘মুনাফিক হলো সেই লোক যে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে কুফরী গোপন রাখে।’

৫. কারো কারো মতে,

الْمُنَافِقُونَ هُمُ الَّذِينَ دَاخِلُونَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْهِ، وَخَارِجُونَ عَنْهُ مِنْ آخَرٍ.

‘মুনাফিকরা এক দিক দিয়ে মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত, আবার অন্য দিক দিয়ে তারা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত।’

^১ সম্পাদকমণ্ডলী, আল-মুজামাল ওয়াসীত, খ. ২, পৃ. ৯৪২

^২ বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী শরহ সহীহিল বুখারী, ক. ১, পৃ. ২১৭

৬. ইমাম ইবনে হিশাম ^{আবু হাশিম} বলেন,

هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُطْغِنُ الْكُفْرَ.

‘মুনাফিক হলো সেই লোক যে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে কুফরী গোপন রাখে।’

৭. কেউ কেউ বলেন,

الْمُنَافِقُونَ هُمُ الَّذِينَ يَضْمُرُونَ الْعَدَاوَةَ وَيُظْهِرُونَ الصَّدَاقَةَ.

‘মুনাফিকরা হচ্ছে সেসব লোক যারা অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে আর বাইরে বন্ধুত্বের ভাব দেখায়।’

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের বিবরণ

ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের বিবরণ

আলাহ রাক্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের বিবরণ প্রদান করেছেন। তার মধ্যে কতিপয় আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. মুনাফিকদের দ্বিমুখিতার কথা আলাহ তাআলা মুমিনদেরকে জানিয়ে দিয়ে বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ذُرِّيَّتِهِ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

‘অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।’^১

২. আলাহ তাআলা কপটতার কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

‘আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।’^২

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪২

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৮-৯

৩. আলাহ তাআলা তাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলেন,

مُذَبِّدَيْنَ بَيْنَ بَيْنٍ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكَ بِهِ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾

‘এরা দোদুল্যমান অবস্থায় বুলন্ত, এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও।’^১

৪. মুনাফিরা একই সাথে মুমিন ও কাফির বলে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। আলাহ বলেন,

وَإِذَا الْقَوَالِيْنِ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَوْا۟ اِلٰى شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنْتَبَا۟ وَنَحْنُ مُسْتَهْزَءُوْنَ ﴿٣٨﴾

‘আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্রা।’^২

৫. মুনাফিকদের অশুভ ও চরম পরিণতি সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَكُنْ تَجِدْ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿٣٩﴾

‘নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোষখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।’^৩

হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের বিবরণ

হাদীস শরীফে মুনাফিকদের যে সকল স্বভাবের কথা বর্ণিত আছে, তা হলো:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রাযিহালাহু আনহুমা} থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ করেছেন, ‘মুনাফিকের দৃষ্টান্ত সে ছাগলের ন্যায়, যে যৌন উত্তেজনা নিয়ে ছুটাছুটি করে, যৌন সুডুসুড়ির কারণে সে অস্থির

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪৩

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪৫

চিঙে একবার এ পালের দিকে দৌড়ায় আরেকবার সেদিকে পালের দিকে দৌড়ায়।”^১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। যথা— ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ও ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।”^২

মুনাফিকের প্রকারভেদ

ইসলামে গবেষকদের নিকট মুনাফিকরা দু’ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. الْمُنَافِقُ فِي الْعَقِيدَةِ (বিশ্বাসগত মুনাফিক) ও
২. الْمُنَافِقُ فِي الْعَمَلِ (কর্মের দিক দিয়ে মুনাফিক)।

এক. বিশ্বাসগত মুনাফিক

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুনাফেক সে ব্যক্তি চরম কাফির। এরা কখনো নিস্তার পাবে না। যেমন— আলাহ তাআলার বাণী:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَكُنْ تُجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

‘নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।’^৩

অন্তরে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাস প্রকাশকে নিফাকে ই’তিকাদী বলা হয়। উল্লেখ্য এ ধরনের নিফাক ছয় প্রকারের। যথা—

১. تَكْذِيبُ الرَّسُولِ ﷺ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা)।

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২১৪৬, হাদীস: ১৭ (২৭৮৪)

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৪

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:১৪৫

২. تَكْذِيبُ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ (রাসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তার কতিপয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) ।
 ৩. بُغْضُ الرَّسُولِ (রাসূল ﷺ-কে ঘৃণা করা) ।
 ৪. بُغْضُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ (রাসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তার কতিপয় ঘৃণা করা) ।
 ৫. الْمَسَرَّةُ بِإِنْخِفَاضِ دِينِ الرَّسُولِ (রাসূল ﷺ-এর ধর্মের পতনে বা ক্ষতি আনন্দ লাভ করা) ।
 ৬. الْكَرَاهِيَّةُ لِإِتِّصَارِ دِينِ الرَّسُولِ (রাসূল ﷺ-এর দীনের বিজয় অপছন্দ করা) ।
- খ. কর্মের দিক দিয়ে মুনাফিক

কিছু স্বভাব এমন রয়েছে, যেগুলোর কোনো একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে الْمُنَافِقُ فِي الْعَمَلِ বলা হয়। আর এ জাতীয় স্বভাবকে মুনাফেকের আলামত বলা হয়।

মুনাফিকের আলামত

মুনাফিকের আলামত অনেক। তবে হাদীসে নির্দিষ্টভাবে চারটি আলামতের কথা ব্যক্ত করেছেন আর তা হলো:

১. কথা বললে মিথ্যা বলে।
২. অঙ্গীকার বা চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।
৩. আমানত রাখলে খিয়ানত করে।
৪. ঝগড়া করলে গালিগালাজ করে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা গুলো হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ».

‘হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি। যথা— ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানতের খিয়ানত করে।’^১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا

^১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস: ১০৭ (৫৯)

خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدْعَهَا: إِذَا أُوْمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। যথা— ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. অঙ্গীকার বা চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ও ৪. বাগড়া করলে গালিগালাজ করে।’^১

মুনাফিকের পরিণাম

১. মুনাফিকের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। কিয়ামত দিবসে মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ سَاءَ كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

‘তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।’^২

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

‘সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।’^৩

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

‘নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোষখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।’^৪

^১ (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৪, (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস: ১০৬ (৫৮)

^২ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১০

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:১৩৮

২. মুনাফিকের ইবাদতের কোন সওয়াব নেই। ইবাদতের সওয়াব লাভের জন্য ঈমান থাকা অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু মুনাফিকের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়, তাই তার ইবাদতও গ্রহণযোগ্য নয়। আলাহ তাআলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

‘আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।’^২

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ۖ يُزْأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يُذْكَرُونَ اللَّهَ إِلَّا

قَلِيلًا ۝

‘আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন নিতান্ত অলসতার সাথেই দাঁড়ায়। তারা শুধু লোকদেরকে দেখায়। আর তাদের প্রতি অল্পসংখ্যক লোকই আলাহ তাআলাকে স্মরণ করে।’^৩

৩. মুনাফিকের আনুগত্য নাজায়িয। আলাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۝

‘হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও কপটদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।’^৪

ইমাম ইমাদ উদ্দীন ইবনে কসীর رحمته الله বলেন, এ আয়াতে কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করার মূল অর্থ হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোন পরামর্শ না করেন। কারণ তাদের সাথে পরামর্শ হলে তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের সুযোগ হয়ে যেতে পারে। এরূপ সুযোগই যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের কোন প্রশ্নই উঠে না।^৫

৪. মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ। মহান আলাহ তার রাসূল ﷺ-কে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন— তিনি বলেছেন,

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৮

^৩ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৪২

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১

^৫ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৬, পৃ. ৩৩৫

اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ
 اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفٰسِقِيْنَ ۝

‘আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন (সবই সমান)। যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তথাপি কখনোই আলাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আলাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আলাহ ন্যায়বান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।’^১

৫. মুনাফিকদের জানাযা পড়া এবং কবর যিয়ারত করা নিষিদ্ধ। মহান আলাহ কপটদের জানাযা ও কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন— আলাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدَ أَوْ لَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهٖ ۝

‘তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না।’^২

৬. মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা। মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমন— ইরশাদ হচ্ছে,

مَّا يُعٰوَنِينَ ۚ اٰيَنَمَا تُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقَتِلُوْا قَتْلًا ۝

‘অভিশপ্ত মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে।’^৩

নিফাকীর নিদর্শন মুমিনের মধ্যে পাওয়া গেলে তার হুকুম

রাসূলে করীম ﷺ মুনাফিকদের যেসব নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বর্তমান সমাজে কোন কোন মুমিনের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাই বলে তাদেরকে মুনাফিক বলা যাবে কি? অথচ তারা আন্তরিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসী। এর সমাধানে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত জবাবগুলোই দিয়েছেন,

১. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে আমাদের যুগে মুসলমানের মধ্যে নিফাকের উল্লেখিত নিদর্শনগুলো বিদ্যমান থাকলেও তারা হাদীস অনুযায়ী খাঁটি মুনাফিক নয়। কারণ তাদের নিফাক হচ্ছে আমলগত, যা ঈমানের পরিপন্থী নয়। তাই তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামবাসী হবে না।

^১ আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৮০

^২ আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৮৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৬১

২. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ বলেন, রোগীর মধ্যে যেমন- সুস্থতার স্বভাব তেমনি সুস্থ ব্যক্তির মধ্যেও রুগ্নতার স্বভাব পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে মুমিনদের মধ্যে كُفْرٌ ও نِفَاقٌ-এর স্বভাব পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِّنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ».

‘যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়।’^১

তাই তাকে কাফির বা মুনাফিক কোনটাই বলা যাবে না, বরং مُؤْمِنٌ

فَاسِقٌ (ত্রুটিপূর্ণ মুমিন) বলা যাবে।

৩. কাযী আয়ায রহমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়, তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে মুনাফিক। এটা মুসলমানদেরকে নিফাক থেকে বাঁচার জন্য সতর্কীকরণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সে মুনাফিক হবে না। যেমন- অন্যত্র তিনি বলেছেন,

«مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ».

‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরী করল।’^২

৪. ইমাম আবু সুলায়মান আল-খত্তাবী রহমাহুল্লাহ বলেছেন, নিফাক দু’প্রকার। যথা- ক. النِّفَاقُ فِي الْإِعْتِقَادِ, এটা রাসূলের যুগে ছিল।

খ. النِّفَاقُ فِي الْعَمَلِ, এ নিফাক দ্বারা দীন থেকে বহিস্কৃত হয় না।

তাই বর্তমানে কোন মুমিন থেকে এই স্বভাব পাওয়া গেলে তাকে الْمُنَافِقُ فِي الْعَمَلِ বলা যেতে পারে।

৫. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন-নাওয়ায়ী রহমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত স্বভাব পাওয়া গেলে রূপক অর্থে মুনাফিক হবে, প্রকৃত অর্থে নয়।^৩
৬. ইমাম মুহাম্মদ ঈসা আত-তিরমিযী রহমাহুল্লাহ বলেন, মুমিনের মধ্যে নিফাক পাওয়া গেলে نِفَاقٌ عَمَلِيٌّ (কর্মগত মুনাফিক) উদ্দেশ্য হবে।

^১ (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৪, (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস: ১০৬ (৫৮), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

^২ আত-তাবারানী, *আল-মুজামিল আওসাত*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩, হাদীস: ৩৩৪৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক রহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত

^৩ আন-নাওয়ায়ী, *আল-মিনহাজ শরহ সহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ২, পৃ. ৪৬-৪৭

৭. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী رحمۃ اللہ علیہ বলেন, **عِلَّة** এবং **عَلَامَةُ**-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা **عَلَامَةُ**-এর অস্তিত্ব **مَعْلُومٌ**-এর অস্তিত্বকে লাঘিম করে। কিন্তু **عِلَّة**-এর অস্তিত্ব **ذُو عِلَالَةٍ**-এর অস্তিত্বকে লাঘিম করে না। সুতরাং যে মুমিনের মধ্যে নিফাকের আলামত পাওয়া যাবে, তার ওপর নিফাকের হুকুম দেওয়া যায় না, বরং এতটুকু বলা যায় যে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব রয়েছে।

৮. কারো কারো মতে, এ ধরনের চরিত্র কোন মুমিনের মধ্যে পাওয়া গেলে তা **مُشَبَّهٌ بِالْمُنَافِقِينَ** বলা হবে।

وَاِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ۖ

كُسَالَى শব্দের অর্থ অলসতা সহকারে। এর স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী رحمۃ اللہ علیہ বলেন,

﴿ كُسَالَى ﴾: أَيُّ مُتَعَاتِلِينَ مُتَبَاطِلِينَ لَا نَشَاطَ لَهُمْ، وَلَا رُغْبَةَ كَالْمُكْرِهَةِ عَلَى

الْفِعْلِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَفِدُونَ ثَوَابًا فِي فِعْلِهَا وَلَا عِقَابًا عَلَى تَرْكِهَا.

‘যারা মনমরা ঢিলেঢালা হয়ে নামাযে দাঁড়ায়। তাতে নেই কোন প্রাণচঞ্চলতা, নেই কোন আগ্রহ। মনে হয় যেন খুব চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে আনা হয়েছে। আসলে এর কারণ হলো, তারা এ কাজে কোন পূণ্য হবে বলে বিশ্বাস করে না আর এটা পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে বলেও তারা ভয় করে না।’

মূলত তারা বেকায়দায় পড়ে নামাযে এসে হাজির হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ-এর যুগে বড় বড় ও কঠোর মুনাফিকদেরকেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াতে হাজির হতে হতো। কেননা এটা ব্যতীত তাদেরকে মুসলিম জামায়াতের মধ্যে গণ্য করা হতো না। ফলে আযানের ধ্বনি যদিও তাদের মনে প্রস্তুত বর্ষণ করত; তথাপি মনের বিরুদ্ধে তাদেরকে জোর করেই নামাযে উঠতে হতো। এজন্য তারা চরম অলসতা প্রদর্শন করত।

মুনাফিকরা নামাযে যেসকল ত্রুটি করে

মুনাফিকদের অন্তর কুটিলতায় পরিপূর্ণ। তাই তারা নামাযে গড়িমসি করে, লোক দেখানো নামায পড়ে এবং নামায সংক্ষেপে করে। মুনাফিকরা নামাযে তিন ধরনের ত্রুটি করে থাকে। তা হলো:

^১ আল-আলুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাউল মাসানী*, খ. ৩, পৃ. ১৬৮

১. যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসভঙ্গিতে দাঁড়ায়। নামাযের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকে না। মনে হয় যেন তাকে জবরদস্তি করা হচ্ছে। যেমন- সূরা আত-তাওবায় বলা হয়েছে,

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ۝

‘তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।’^১

এজন্য তারা নামাযে রুকু-সাজদা সঠিকভাবে আদায় করে না। অথচ হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْني صَلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

‘হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী রাযিয়ার্হা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি রুকু-সাজদায় তার মেরুদণ্ড সোজা না রাখে, তার নামায হবে না।’^২

মুনাফিকদের নামাযের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় সে মনোযোগসহ করে নামায আদায় করে না। এর কারণ হিসেবে ইমাম শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী রাযিয়ার্হা আলাইহি বলেন,

لَا تَنْهَمُ لَا يَعْتَقِدُونَ ثَوَابًا فِي فِعْلِهَا وَلَا عِقَابًا عَلَى تَرْكِهَا.

‘কারণ তারা তা পালন করাতে সওয়াবের আশা করে না এবং পরিত্যাগ করাতে শাস্তির ভয় করে না।’^৩

এর বিপরীত হলো মুমিনদের নামায। কারণ সে ঈমানের কারণে আগ্রহ সহকারে মনোযোগের সাথে নামায সম্পাদন করে। যেমন- আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝

‘মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, তারা তাদের নামাযে ভীত-সম্ভ্রান্ত।’^৪

২. মুনাফিকের নামাযের দ্বিতীয় দ্রুটি হলো: يُرَاءُونَ النَّاسَ ۝ (তারা নামাযে রিয়া করে তথা লোক দেখানো নমায পড়ে)। তাদের নামাযে ইখলাস বা

^১ আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৫৪

^২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, খ. ২, পৃ. ৫১, হাদীস: ২৬৫

^৩ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৩, পৃ. ১৬৮

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১-২

লিলাহিয়াত নেই। তারা নামায পড়ে এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা যেন তাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ কারণে যে সকল নামায রাতের আঁধারে পড়া হয়, প্রায় সময় দেখা যায় তারা তাতে শরীক হয় না। যেমন- ইশা ও ফজরের নামায। যেমন- সহীহ হাদীসে আছে,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْقُلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ».

‘নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘মুনাফিকদের নিকট সবচেয়ে কষ্টকর নামায হলো ইশা ও ফজরের নামায।’^১

এর ব্যাখ্যায় ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله বলেন, দিনের বেলায় কাজ-কর্মের ক্লাস্তির কারণে তারা ইশার নামাযে হাজির হওয়াকে কঠিন কিছু মনে করে। আর শেষ রাতে তাদের কাছে নামায অপেক্ষা ঘুম বেশি প্রিয় হওয়াই ফজরের নামাযে হাজির হওয়া কঠিন মনে হয়।^২

নামাযে মুনাফিকরা রিয়া করার অর্থ এটাও হতে পারে, তারা মানুষের সামনে খুব মনোযোগের সাথে নামায পড়ে আর গোপনে পড়লে ত্রুটি করে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسْوَأَهَا حَيْثُ يَخْلُو، فَبِكَذَا اسْتِهَانَهُ يَسْتَهِينُ بِهَا رَبُّهُ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি লোকের সমাগমে সুন্দর করে নামায পড়ে। আর একাকী নামাযে ত্রুটি করে। তাহলে সে এর দ্বারা আল্লাহর সাথে হটকারিতা করে।’^৩

মুমিনের বৈশিষ্ট্য এর বিপরীত। সে সর্বদা নামাযের জামায়াতে হাজির হয় এবং সকল স্থানেই নামাযকে সুন্দর করে পড়ে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই।

৩. মুনাফিকের নামাযের তৃতীয় ত্রুটি হলো: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (আর তারা নামাযে আল্লাহর যিক্র কম করে থাকে)। এখানে যিক্রের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন হতে পারে। যেমন—

^১ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১১৭, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ২১২

^৩ (ক) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুস সগীর*, খ. ১, পৃ. ৩০৩-৩০৪, হাদীস: ৮৪৮, (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুস সগীর*, খ. ২, পৃ. ৪১২, হাদীস: ৩৫৮৪

ক. যিক্র বলে নামায উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে, তারা খুব কমই নামায পড়ে থাকে। রিয়ার কারণে জনসমাবেশে শুধু তারা নামায পড়ে। লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলে তারা নামায পড়ে না।

খ. যিক্র বলে নামাযের ভেতরে যিক্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা তাদের নামাযের মধ্যে আলাহ তাআলাকে খুব কমই স্মরণ করে। কারণ তারা নামাযে অমনোযোগী থাকে। তাদের নামাযে মনোযোগ না থাকায় কি পড়ছে বা বলছে তারা তাও জানে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল ﷺ বলেন,

«تِلْكَ صَلَاةُ الْمُتَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْفُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا».

‘এটি মুনাফিকের নামায। সে সূর্যের অপেক্ষায় বসে থাকে। যখন এটি শয়তানের দু’শিঙয়ের মাঝখানে থাকে, তখন উঠে চারটি ঠোকর মারে। (দু’রাকাত নামায পড়ে) সে এতে খুব কমই আলাহর যিক্র করে থাকে।’

অর্থাৎ শেষ সময়ে এসে সংক্ষেপে নামায আদায় করে।

গ. অথবা আয়াতের অর্থ হলো: তারা তাসবীহ-তাহলীল কম করে। এখানে যিক্র সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ মুনাফিক দুনিয়াবী কথা-বার্তায় সারাক্ষণ ডুবে থাকে। আলাহর যিক্র খুব কম করে। পক্ষান্তরে মুমিন অধিকহারে আল্লাহ তাআলার যিক্র করে।

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ-এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতকগুলোতে মুনাফিকের আরো কিছু বদাভ্যাস, তার নামাযের আরো কিছু বেহাল দশা এবং তার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কসীর ও রুহুল মাআনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা, ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাযিআল্লাহু আনহু ও ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর মত বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতে মুসল্লী বলে মুনাফিক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুনাফিকের জন্য দুর্ভোগ। আয়াতে মুনাফিকদের নামাযে দু’টি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

১. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (যারা তাদের নামায থেকে গাফিল থাকে) অর্থাৎ মুনাফিকরা নামায থেকে অমনোযোগী থাকে। নামায থেকে গাফিল বা অমনোযোগী থাকার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন-

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৩৪, হাদীস: ১৯৫ (৬২২), হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

ক. নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে নামায পড়ত।

খ. নামাযের সময়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দিত না।

গ. নবী করীম ﷺ এবং সলফে সালিহীনের মতো গুরুত্ব দিয়ে নামায আদায় করতো না, বরং মোরগের মতো কয়েকটি ঠোকর মারে, একাগ্রচিত্তে নামায পড়ে না।

ঘ. স্বাভাবিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মাকরুহ ওয়াক্তে নামায আদায় করে।

২. اَلَّذِيْنَ هُمْ اَلَّذِيْنَ هُمْ اَلَّذِيْنَ هُمْ (তারা তাদের নামাযে রিয়া করে)।^১

মুফতী মুহাম্মদ শফী আলোহাউল বলেন, اَلَّذِيْنَ هُمْ থেকে اَلَّذِيْنَ هُمْ

পর্যন্ত আয়াতে মুনাফিকদের ইবাদতের কথা বর্ণিত আছে। তারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয এ ব্যাপারে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ রাখে না এবং নামাযের খেয়ালও রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নতুবা ছেড়ে দেয়।

নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার কথা একানে বোঝানো হয়নি। কেননা এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। তা উদ্দেশ্য হলে عَنْ

اَلَّذِيْنَ هُمْ না বলে বরং فِيْ صَلَاتِهِمْ বলা হতো। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রাসূল আলোহাউল -এর জীবনেও কয়েকবার নামাযের মধ্যে ভুল হয়েছে। তাই এটা আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে না।^২

রিয়ার বিবরণ

আভিধানিক অর্থ

اَلَّذِيْنَ (রিয়া) শব্দটি আরবি, এর অর্থ: প্রদর্শন করা, আত্মপ্রদর্শন, ভান,

কপটতা, ভণ্ডামী, প্রদর্শনেচ্ছা, লৌকিকতা, লোক দেখানোর জন্য কাজ করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. মুফতী আমীমুল ইহসান আল-বরকতী আলোহাউল বলেন,

اَلرِّيَاءُ: تَرْكُ الْاِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ بِمُلَاحَظَةِ غَيْرِ اللَّهِ اَوْ عَمَلِ الْخَيْرِ لِارِءَاءِ الْغَيْرِ.

^১ (ক) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৮, পৃ. ৪৬৮, (খ) আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ১৫, পৃ. ৪৭৬

^২ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ১৪৭৭

‘রিয়া হলো কাজে ইখলাস বর্জন করা অথবা প্রদর্শনেচ্ছায় নেক কাজ করা।’^১

২. কেউ কেউ বলেন,

الرِّيَاءُ: إِظْهَارُ الْعَمَلِ لِلنَّاسِ لِيَرَوْهُ، وَيَظُنُّوا بِهِ خَيْرًا.

‘মানুষকে দেখানোর জন্য আমল প্রকাশ করা। যাতে তারা তার সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে।’

৩. ইমাম শরীফ আল-জুরজানী رحمته الله عليه বলেন,

الرِّيَاءُ: تَرْكُ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ بِمُلاحَظَةِ غَيْرِ اللَّهِ فِيهِ.

‘আলাহ ভিন্ন অন্য দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমলের মধ্যে ইখলাস পরিত্যাগ করাকে রিয়া বলে।’^২

৪. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله عليه বলেন,

الرِّيَاءُ: إِظْهَارُ الْجَمِيلِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، لَا لِاتِّبَاعِ أَمْرِ اللَّهِ.

‘রিয়া হলো মানুষ যাতে দেখানোর উদ্দেশ্যে ভালো কাজ প্রকাশ করা, যা আল্লাহর হুকুমের অনুসরণে নয়।’^৩

রিয়া বলতে, সহজে বুঝতে হবে, ব্যক্তি কোন নেক আমল করার প্রকালে এ উদ্দেশ্য পোষণ করবে যে, লোকে তার এ সমস্ত আমল দেখুক, মানুষের মধ্যে তার সম্মান প্রতিপত্তি অর্জিত হোক। রিয়া চালচলনেও হতে পারে, কথা কাজেও হতে পারে।

রিয়ার পরিণতি

১. ইবাদতে ইখলাস থাকে না। আত্মপ্রদর্শন, লোক দেখানো ইবাদত বা কর্মের কোন মূল্য নেই। রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত ও কর্মে ইখলাছ ও আস্তরিকতা থাকে না। এসব ইবাদত ও কর্মে আল্লাহর ভয় ও রাসূল ﷺ-এর মুহব্বত সৃষ্টির পথে মন মানসিকতা তৈরি হয় না।
২. রিয়াকারী ধ্বংসশীল। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ‘সে ব্যক্তির জন্য এ অপকারই যথেষ্ট যে, দীন বা দুনিয়ার ব্যাপারে মানুষ তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। কেবল সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে আল্লাহ তাআলা এ অপকারিতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।’

^১ আল-বরকতী, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, পৃ. ৩১১

^২ শরীফ আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, পৃ. ১১৩

^৩ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৪২২

৩. রিয়াকারী জাহান্নামী । হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ: «وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، يُتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِمِائَةٍ مَرَّةً»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ «أَعَدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাযি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আলাহর নিকট জুব্বুল হযন (চিস্তার অতল গহবর) হতে রক্ষাপ্রাপ্তির কামনা কর। সাহাবায়ে কেরাম রাযি আল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন, জুব্বুল হযন কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ‘জাহান্নামের একটি প্রান্তর, যা রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।’”

৪. রিয়া হচ্ছে ছোট শিরক। হাদীসে রিয়া করাকে ছোট শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং আলাহর নিকট তার কোন পুরস্কার নেই। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ» إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءَوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَاَنْظُرُوا هَلْ تَحِدُونِ عِنْدَهُمْ جَزَاءً».

‘হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ রাযি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি তোমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি যা ভয় করি তা হলো ছোট শিরক।’ সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আলাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, ‘রিয়া।’ ‘আলাহ তাআলা যেদিন বন্দাদেরকে তাদের আমলের পুরস্কার দেবেন, সেদিন তাদেরকে বলবেন, গিয়ে দেখ! দুনিয়াতে যাদেরকে দেখাতে তাদের কাছে ভালো কোনকিছু পাও কিনা।’”

^১ ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৯৪, হাদীস: ২৫৬

^২ আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৯, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২৩৬৩৬

রিয়ামুক্ত ইবাদত আলাহর সাক্ষাত পেতে সহায়ক। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

‘যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সাক্ষাত চায়, সে যেন নেক আমল করে এবং স্বীয় রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।’^১

তবে যদি কারো মনে লোক দেখানো উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও আপনাআপনি তার ভালো কাজ প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এতে তার ভালো লাগে তাহলে এটা রিয়া হবে না, বরং এ ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ،

فَيُطْلَعُ عَلَيْهِ، فَيُعْجِبُنِي، قَالَ: «لَكَ أَجْرَانِ، أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ

الْعَلَانِيَةِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমল করি, অতঃপর সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ে, এতে আমার ভালো লাগে। নবী করীম সঃ ইরশাদ করেন, ‘তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। যথা— গোপন করার সওয়াব এবং প্রকাশ হওয়ার সওয়াব।’^২

রিয়ার পর্যায়

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী রাঃ বলেন, রিয়ার চারটি পর্যায় রয়েছে। যথা—

১. **الرِّيَاءُ بِالسَّمْتِ (আচরণগত রিয়া):** প্রশংসা লাভ ও তাদের মাঝে প্রাধান্য বিস্তারের আশায় চরিত্র সুন্দর করা।
২. **الرِّيَاءُ بِالثِّيَابِ (আবরণগত রিয়া):** মানুষ যাতে দরবেশ বা দুনিয়াবিরাগী বলে, এ উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করা।
৩. **الرِّيَاءُ بِالْقَوْلِ (উক্তিগত রিয়া):** কথার মাঝে দুনিয়াদারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা, উপদেশ দেওয়া এবং ছুঠে যাওয়া নেক কাজের জন্য আফসোস প্রকাশ করা ইত্যাদি।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:১১০

^২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১৪১২, হাদীস: ৪২২৬

৪. الرِّيَاءُ بِالْعَمَلِ (আমলগত রিয়া): নামায, দান ইত্যাদি প্রকাশ করা, মানুষকে দেখানোর জন্য নামাযকে সুন্দর করা বা দীর্ঘ করা ইত্যাদি।^১

রিয়ার হাকীকত

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী رحمته الله বলেন, এর হাকীকত হলো: طَلَبُ مَا فِي الدُّنْيَا بِالْعِبَادَةِ (ইবাদতের বিনিময়ে দুনিয়ার কোন বস্তু কামনা করা)।^২

ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আলাহ তাআলার সন্তুষ্টি। কেননা মানব সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র ইবাদতের জন্য। আলাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

‘আমি জিন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।’^৩

মহান আলাহ আরও বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝

‘তাদেরকে আলাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।’^৪

سَاهُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য

سَاهُونَ শব্দটি سَهْوٌ শব্দমূল হতে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ: অলসতা, উদাসীনতা, পরিত্যাগ ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে সাহ্ন শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেলাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন—

১. ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী رحمته الله বলেন,

﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ غَافِلُونَ يُؤَخَّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا

সালাত আদায়ে উদাসীনও সালাত আদায়ে বিলম্ব করে।^৫

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন,

هُوَ الْمُصَلِّيُّ الَّذِي إِنْ صَلَّى لَمْ يَرْجُ لَهَا ثَوَابًا، وَإِنْ تَرَكَهَا لَمْ يَحْشَ

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ২১২-২১৩

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ২১২

^৩ আল-কুরআন, *সূরা আয-যারিয়াত*, ৫১:৫৬

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আল-বাইয়িনা*, ৯৮:৫

^৫ আল-মহল্লী ও আস-সুয়ুতী, *তাকফীরুল জালালাঈন*, পৃ. ৮২৩

عَلَيْهَا عِقَابًا.

‘উক্ত আয়াত দ্বারা এমন মুসলী উদ্দেশ্য, যে সালাত আদায় করলেও সওয়াবের আশা করে না এবং আদায় না করলেও আযারেব ভয় করে না।’^১

৩. হযরত আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

لَا يُصَلُّونَهَا لِمَوَاقِيتِهَا، وَلَا يُتِمُّونَ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا.

‘যারা নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে না এবং রুকু-সাজদাও ঠিক মতো করে না।’^২

৪. সাফওয়াতুত তাফাসীর গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, سَاهُونَ দ্বারা মুনাফিকদের বোঝানো হয়েছে।^৩

৫. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তবারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، عَنْ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا».

‘হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করেন, এর অর্থ হলো: ‘নামাযের সময় নষ্ট করা তথা সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা।’^৪

৬. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত-তবারী রাহিমাহুল্লাহ ও আবু আওয়ানা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, সাহুন শব্দ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সঠিক সময়ের পর নামায আদায় করে।

৭. ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাবর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা নামাযে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে।^৫

৮. ইমাম হাসান আল-বাসারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي إِنْ صَلَّاهَا صَلَّاهَا رِيَاءً، وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَنْدَمْ.

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ২১১

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ২১১

^৩ আস-সাবুনী, *সাফওয়াতুত তাফসীর*, পৃ. ৫৮৩

^৪ ইবনে জরীর আত-তবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন*, খ. ২৪, পৃ. ৬৬৩

^৫ ইবনে জরীর আত-তবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ায়িল কুরআন*, খ. ২৪, পৃ. ৬৬২

‘এর অর্থ হল, যারা আলাহর জন্য নয়, বরং লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে। আর যখন পড়ে না তখন তাদের কোন আক্ষেপও থাকে না।’^১

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَوْنَ ۚ

১-এর ব্যাখ্যা

এ আয়াতে মুনাফিকের আরেকটি দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এ মর্মে যে, তারা ٱلْمُصَلِّينَ থেকে বাধা দেয় বা বিরত থাকে। মা’উন কী? এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুমা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহুমা, হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু প্রমুখের মতে, এখানে ٱلْمُصَلِّينَ বলে যাকাতকে বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে মা’উন বলার কারণ হলো মা’উনের অর্থ হচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ বা তুচ্ছ বস্তু। আর যাকাতও এক চতুর্থাংশ হওয়াই পূর্ণ মালের কাছে তুচ্ছ বস্তুর মতো। অর্থাৎ মুনাফিকরা যেমন নামাযে ক্রটি করে, তেমনি যাকাত আদায়েও।^২
২. ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, এখানে মা’উন বলে গৃহস্থালির উপকরণ তথা কুঠার, ডেগ, বালতি, কাঁচি, দা, কড়াই ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের স্বভাব এমন নিচু যে, তারা এ সামান্য বস্তুও ধার দিতে চায় না, সুতরাং যাকাত প্রদানের তো প্রশ্নই উঠে না।^৩

^১ আল-বগওয়ী, মা’আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ৩১২

^২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ২০, পৃ. ২১৩

^৩ আল-মহন্বী ও আস-সুয়ুতী, তাফসীরুল জালালাঈন, পৃ. ৮২৪

প্রমাণঞ্জি

॥আ ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুল আওসাত**, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর

৩. আত-তাহাওয়া : আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামা আল-আযদী আত-তাহাওয়া (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), **শরহ মা'আনিয়াল আসার**, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৪. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহহাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), **আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান**, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

৫. আদ-দারাকুতনী : শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), **আস-সুনান**, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬. আন-নাওয়াযী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিযী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), **আল-মিনহাজ শরহ সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ**, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী,

বয়স্কৃত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = ১৯৭২ খ্রি.)

৭. আন-নাসাফী : আবুল বারাকাত, হাফিযুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী (০০০-৭১০ হি. = ০০০-১৩১০ খ্রি.), *মনারুল আনওয়ার ফী উসুলিল ফিকহ*, মতবায়ে আহমদ কামিল, কায়রো, মিসর (১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.)

৮. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান = আস-সুনানুস সুগরা*, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৯. আবদুর রহমান আল-জযীরী: আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আওয় আল-জযীরী (১২৯৯-১৩৬০ হি. = ১৮৮২-১৯৪১ খ্রি.), *আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাবা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়স্কৃত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

১০. আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী: আবু বকর, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিমযারী আস-সান'আনী (১২৬-২১১ হি. = ৭৪৪-৮২৭ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়স্কৃত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

১১. আবদুল হাই লাখনবী: আবুল হাসানাত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-রাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪-১৩০৪ হি. = ১৮৪৮-১৮৮৭ খ্রি.), *আল-আসারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওযুআ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়স্কৃত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

১২. আবদুল হাই লাখনবী: আবুল হাসানাত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-রাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪-১৩০৪ হি. = ১৮৪৮-১৮৮৭ খ্রি.),

উমদাতুর রিয়াআ বিতাহশিয়াতি শরহিল বিকায়া,
মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

১৩. আবু ইউসুফ

: ইমাম, কাযী, আবু ইউসুফ, ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম
ইবনে হাবীব ইবনে সা'দ ইবনে হাবতাতা আল-
আনসারী (১১৩-১৮২ হি. = ৭৩১-৭৯৮ খ্রি.), আল-
আসার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত,
লেবনান

১৪. আবু দাউদ

: আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে
ইসহাক ইবনে বশির আল-আযদী আস-সিজিসতানী
(২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-সুনান,
আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
(১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১৫. আবু দাউদ আত-তায়ালিসী: আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল
জারুদ আত-তায়ালিসী (১৩৩-২০৪ হি. =
৭৫০-৮১৯ খ্রি.), আল-মুসনদ, দারুল হিজরা,
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯
খ্রি.)

১৬. আবু হাইয়ান আল-উনদুলুসী: আসীরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে
আলী ইবনে ইউসুফ আল-উনদুলুসী (৬৫৪-৭৪৫ হি.
= ১২৫৬-১৩৪৪ খ্রি.), আল-বাহরুল মুহীত ফীত
তাফসীর, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২০
হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

১৭. আয-যাজাজ

: আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনুস সাররী আয-যুজাজ
(২৪১-৩১১ হি. = ৮৫৫-৯২৩ খ্রি.) মাআনিউল
কুরআন ওয়া ই'রাবুহ, দারুল আল-কুতুব আল-
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮
হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৮. আয-যামাখশারী

: আবুল কাসিম, মাহমুদ ইবনে আমর ইবনে আহমদ
আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি. = ১০৭৪-১১৪৩
খ্রি.), আল-কাশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত
তানযীল, দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত,
লেবনান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১৯. আল-আজলুনী

: আবুল ফিদা, ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে
আবদুল হাদী আল-জাররাহী আল-আজলুনী আদ-

দামিশকী (১০৮৭-১১৬২ হি. = ১৬৭৬-১৭৪৯ খ্রি.),
কাশফুল খিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্ম
ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন
নাস, মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
(১৪২০ হি. = ২০০ খ্রি.)

২০. আল-আলুসী

: আবুস সানা, শিহাবুদ্দীন, মাহবুদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-হুসাইনী আলা-আলুসী (১২১৭-১২৭০ হি. =
১৮০২-১৮৫৪ খ্রি.), *রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল
কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাব'উল মাসানী*, দারুল
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি. =
১৯৯৪ খ্রি.)

২১. আল-ইরাকী

: আবুল ফযল, যায়নুদ্দীন, আবদুর রহীম ইবনুল
হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে
ইবরাহীম আল-কুরদী আর-রাযনানী আল-মিহরানী
আল-মিসরী আশ-শাফিয়ী (৭২৫-৮০৬ হি. =
১৩২৫-১৪০৪ খ্রি.), *আল-মুগনী আন হামলিল
আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া মিনাল
আখবার*, দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

২২. আল-ওয়াহিদী

: আবুল হাসান, আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ
ইবনে আলী আল-ওয়াহিদী আন-নায়সাবুরী আশ-
শাফিঈ (১০০০-৪৬৮ হি. = ১০০০-১০৭৬ খ্রি.),
আসবাবু নুয়লিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি.
= ১৯৯১ খ্রি.)

২৩. আল-কাসানী

: আলাউদ্দীন, আবু বকর ইবনু মাসউদ ইবনি আহমদ
আল-কাসানী (১০০০-৫৮৭ হি. = ১০০০-১১৯১ খ্রি.),
বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ শারায়ি, দারুল
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয়
সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

২৪. আল-কাসিমী

: জামাল উদ্দীন (মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন) ইবনু
মুহাম্মদ ইবনি সাঈদ ইবনি কাসিম আল-হিলাক
(১২৮৩-১৩৩২ হি. = ১৮৬৬-১৯১৪ খ্রি.),

মাহাসিনুত তাওয়ীল, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

২৫. আল-কুরতুবী

: আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খায়রাজী আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি. = ১২০৪-১২৭৩ খ্রি.) *আত-তায়কিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উম্মিরিল আখিরা*, মকতাবাতু দারিল মিনহাজ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

২৬. আল-কুরতুবী

: আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খায়রাজী আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি. = ১২০৪-১২৭৩ খ্রি.) *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. = ১৯৬৪ খ্রি.)

২৭. আল-খাযিন

: আবুল হাসান, 'আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনি ইবরাহীম ইবনি 'উমর আশ-শায়হী আল-বগদাদী আল-খাযিন (৬৭৮-৭৪১ হি. = ১২৮০-১৩৪১ খ্রি.), *লুবাবুত তাওয়ীল ফী মা'আনিত তানযীল*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২৮. আল-গাযালী

: হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তুসী (৪৫০-৫০৫ হি. = ১০৫৮-১১১১ খ্রি.) *ইয়াহইয়াউ উলুমিদীন*, দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান

২৯. আল-বগওয়ী

: রুকনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনু মাস'উদ ইবনি মুহাম্মদ ইবনিল ফাররা আল-বগওয়ী আশ-শাফি'ঈ (৪৩৬-৫১০ হি. = ১০৪৪-১১১৭ খ্রি.), *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৩০. আল-বয়যাওয়া : কাযী, নাসিরুদ্দীন, আবু সাঈদ, আবুল খাইর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শীরাযী আল-বয়যাওয়া (০০০-৬৯১ হি. = ০০০-১২৯২), *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাওয়ায়ীল*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)
৩১. আল-বরকতী : মুফতী, মাওলানা, সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দি আল-বরকতী (১৩২৯-১৪০৫ হি. = ১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.), *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, আস-সদফ পাবলিশার, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
৩২. আল-বাবরতী : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ, আকমল উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ ইবনুশ শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুশ শায়খ জামাল উদ্দীন আর-রুমী আল-বাবরতী (৭১৪-৭৮৬ হি. = ১৩১৪-১৩৮৪ খ্রি.), *আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান
৩৩. আল-বায়যার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে ওবায়দিল্লাহ আল-আতাকী আল-বায়যার (০০০-২৯২ হি. = ০০০-৯০৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখখার*, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪-১৪২৯ হি. = ১৯৮৮-২০০৯ খ্রি.)
৩৪. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আস-সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
৩৫. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী

আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আস-সুনানুস সগীর*, জামিয়াতুদ দারাসাত আল-ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

৩৬. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-আদাবুল মুফরদ*, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

৩৭. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উম্মিরি রাসূলিল্লাহি* আল-মুহাম্মদ আল-বুখারী *ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারু তওকিন নাজাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৩৮. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *জুযউল কিরাআতি খলফাল ইমাম*, আল-মাকতাবা আস-সালাফিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

৩৯. আল-মহল্লী ও আস-সুয়ুতী:

জালাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মহল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি. = ১৩৮৯-১৪৫৯ খ্রি.) ও জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *তাকসীরুল জালালাঈন*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

৪০. আল-মাওয়ারদী

: আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-বাসারী আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি. = ৯৭৪-১০৫৮ খ্রি.), *আন-নুকাত ওয়াল উয়ুন = তাকসীরুল মাওয়ারদী*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৪১. আল-মারগীনানী

: বুরহানুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল আল-ফিরগানী আল-মারগানানী

(৫৩০-৫৯৩ হি. = ১১৩৫-১১৯৭ খ্রি.), *আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান : আবু মুহাম্মদ, যকীউদ্দীন, আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কওরী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুনযিরী (৫৮১-৬৫৬ হি. = ১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.), *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

৪২. আল-মুনযিরী

৪৩. আলী ইবনে নসর আত-তুসী: আবু আলী আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে নসর আত-তুসী, করদুশ (০০০-৩১২ হি. = ০০০-৯২৪ খ্রি.), *মুখতাসরুল আহকাম = আল-মুসতাখরজ আলা জামিয়িত তিরমিযী*, মকতবাতুল গুরাবা আল-আসরিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৪৪. আল-হাকিম

: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৪৫. আল-হাকীম আত-তিরমিযী: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান ইবনে বশর আল-হাকীম আত-তিরমিযী (০০০-অনু. ৩২০ হি. = ০০০-অনু. ৯৩২ খ্রি.), *নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল* দারুল উলুম
আল-ইলমিয়া
১৪১১, দারুল জলীল, বয়রুত, লেবনান

৪৬. আল-হালবী

: আবুল ফরজ, নুরুদ্দীন ইবনে বুরহানুদ্দীন, আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ (৯৭৫-১০৪৪ হি. = ১৫৬৭-১৬৩৫ খ্রি.), *আস-সিরাতুল হালবিয়া = ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন মামুন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৪৭. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী: আবুল কাসিম, আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ ইবনিল মফযল আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী

(০০০-৫০২ হি. = ০০০-১১০৮ খ্রি.), *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান / দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৪৮. আর-রাফিযী : আবুল কাসিম, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম আর-রাফিযী আল-কাযওয়ীনী (৫৫৭-৬২৩ হি. = ১১৬২-১৯৮৭ খ্রি.), *ফতহুল আযীয বি-শরহিল ওয়াজীয = আশ-শরহুল কবীর*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

৪৯. আশ-শা'রাওয়ী : মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রাওয়ী (১৩২৯-১৪১৯ হি. = ১৯১১-১৯৯৮ খ্রি.), *তাকসীরুল কুরআন*, মাতাবিউ আখবারিল ইয়াওম

৫০. আস-সা'লবী : আবু ইসহাক, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আস-সা'লাবী (০০০-৪২৭ হি. = ০০০-১০৩৫ খ্রি.), *আল-কাশফু ওয়াল বয়ান*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৫১. আস-সাবুনী : মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী (জন্ম: ১৩৪৮ হি. = ১৯৩০ খ্রি.), *সাফওয়াতুল তাকসীর*, দারুস সাবুনী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৫২. আস-সারাখসী : শামসুল আয়িম্মা, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু সাহল আস-সারাখসী (০০০-৪৮৩ হি. = ০০০-১০৯০ খ্রি.), *আল-মবসূত*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৫৩. আস-সুযুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *আল-ইকলীল ফী ইসতিম্বাতিত তানযীল*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

৫৪. আস-সুযুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি. =

১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *নুবাবুন নুকুল ফী আসবাবিন
নুযুল*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৫৫. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল
ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী
(১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ*,
মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

৫৬. ইবনে আতিয়া

: আবু মুহাম্মদ, আবদুল হক ইবনে গালিব ইবনে
আবদুর রহান ইবনে তামাম ইবনে আতিয়া আল-
উন্দুলুসী আল-মাহারিবী (৪৮১-৫৪২ হি. =
১০৮৮-১১৪৮ খ্রি.) *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী
তাফসীরিল কিতাব আল-আযীয*, দারুল আল-কুতুব
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ:
১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৫৭. ইবনে আবিদীন

: মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয
আবিদীন আদ-দামিস্কী আল-হানাফী (১১৯৮-১২৫২
হি. = ১৭৮৪-১৮৩৬ খ্রি.), *রদ্দুল মুহতার আলাদ
দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন =
ফতোয়ায়ে শামী*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৫৮. ইবনে আবু শায়বা

: আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে
ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু
শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯
খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*,
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৫৯. ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী:

আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ
ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-
হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮
খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, মাকতাবাতু
নিযার মুস্তাফা আল-বায়, মক্কা মুকাররমা, সুউদি আরব
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬০. ইবনে ওয়াহ্ব : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব ইবনে মুসলিম আল-মিসরী আল-কুরাশী (১২৫-১৯৮ হি. = ৭৪৩-৮১৩ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআন মিনাল জামি' লিবনি ওয়াহ্ব*, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
৬১. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
৬২. ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী: আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি. = ৮২৮-৮৮৯ খ্রি.), *গরীবুল কুরআন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)
৬৩. ইবনে জরীর আত-তাবারী: আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি. = ৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ালিল কুরআন*, দারু হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
৬৪. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান
৬৫. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
৬৬. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

৬৭. ইবনে হিশাম

: আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মআফিরী (০০০-২১৩ হি. = ০০০-৮২৮ খ্রি) *আস-সীরাতুন নাবাওয়ায়া*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. = ১৯৫৫ খ্রি.)

৬৮. ইবনুল জওযী

: আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *তাযকিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গরীব (গরীবুল কুরআন আল-করীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)*

৬৯. ইবনুল জওযী

: আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ক॥

৭০. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী: মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী আল-উসমানী আল-মাযহারী (১১৪৩-১২২৫ হি. = ১৭৩০-১৮১০ খ্রি.), *আত- তাফসীরুল কুরআন বি-কালামির রহমান = আত-তাফসীরুল মাযহারী*, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করাচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

॥খ॥

৭১. থানবী : হাকীমুল উম্মত, মাওলানা, আশরফ আলী ইবনে আবদুল হক আত-থানবী (১২৮০-১৩৬২ হি. = ১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.), *তফসীরে বয়ানুল কুরআন*, ইদারাতুল তালিফাতে আশরাফিয়া, করাচি, পাকিস্তান (১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

॥ফ॥

৭২. ফখরুদ্দীন আর-রাযী: ফখরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তায়মী আর-রাযী

(৫৪৪-৬০৬ হি. = ১১৫০-১২১০ খ্রি.), *মাফাতীহুল গায়ব* = *আত-তাফসীরুল কবীর*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ব॥

৭৩. বদরুদ্দীন আল-আইনী: বদরুদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল-আইনী (৭৬২-৮৫৫ হি. = ১৩৬১-১৪৫১ খ্রি.), *আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)


৭৪. বদরুদ্দীন আল-আইনী: বদরুদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল-আইনী (৭৬২-৮৫৫ হি. = ১৩৬১-১৪৫১ খ্রি.), *উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবি, বয়রুত, লেবনান

॥ম॥

৭৫. মাওলানা আবুল হাসান: হাফিয, মাওলানা, মুহাম্মদ আবুল হাসান ইবনে নযীর আহমদ ইবনে শাকির আলী ইবনে গোলাম নবী ইবনে খুলন চৌধুরী ইবনে কাযী মুঈনুদ্দীন ইবনে কাযী আইনউদ্দীন (১৩৩৮-১৪১২ হি. = ১৯১৮-১৯৯২ খ্রি.), *তানযীমুল আশতাত লি-হল্লি আওয়ীযাতিল মিশকাত*, দারুল ইশাতাত আল-ইসলামিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৫ হি. = ১৪০১ খ্রি.)

৭৬. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৭৭. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম উবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা*

রাসূলিল্লাহ  = আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৭৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী: মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, খাদিমুল
হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প,
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব

৭৯. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী: ইমাম, হাফিয়, আবু আবদুল্লাহ,
মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (১৩১-১৮৯ হি.
= ৭৪৮-৮০৪ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা লি-মালিক
ইবনে আনাস*, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বয়রুত,
লেবনান

৮০. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ
আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০-১০১৪ হি. =
০০০-১৬০৬ খ্রি.), *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ
মিশকাতিল মাসাবীহ*, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৮১. মোল্লা খসরু : মুহাম্মদ ইবনে ফরামুরযি ইবনে আলী
মোল্লা/মুনলা/মওলা খসরু (০০০-৮৮৫ হি. =
০০০-১৪৮০ খ্রি.), *দুরারুল হক্কাম ফী শরহ
গুয়ারিল আহকাম*, দারু ইয়াহইয়ায়ির কুতুব আল-
আরবিয়া, বয়রুত, লেবনান

॥য॥

৮২. যফর আহমদ আল-উসমানী: মাওলানা, যফর আহমদ ইবনে লতীফ আল-
উসমানী আত-থানওয়ী (১৩১০-১৩৯৪ হি. =
১৮৯৩-১৯৭৪ খ্রি.), *ইলাউস সুনান*, ইদারাতুল
কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

॥শ॥

৮৩. শফীকুর রহমান নদবী: শফীকুর রহমান নদবী, *আল-ফিকহুল মায়সির
আলা মায়হাবিল ইমামিল আযম আবী হানিফা
আন-নুমান*, ফারেখ অফসেট, লক্ষৌ, ভারত (পঞ্চম
সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

৮৪. শরীফ আল-জুরজানী: আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আয-যাইন আশ-
শরীফ আল-জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হি. =

১৩৪০-১৪১৩ খ্রি.), *আত-তারীফাত*, দারুল কুতুব
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ:
১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

॥স ॥

৮৫. সম্পাদকমণ্ডলী

: ইবরাহীম মুস্তফা, আহমদ আয-যাইয়াত, হামিদ
আবদুল কাদির ও মুহাম্মদ আন-নাজ্জার, *আল-
মু'জামুল ওয়াসীত*, দারুল দাওয়া, বয়রুত, লেবনান

৮৬. সাইয়েদ সাবেক

: আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আয-যাইন আশ-
শরীফ আল-জুরজানী (মৃত্যু: ১৪২০ হি. = ২০০০
খ্রি.), *ফিকহুস সুন্নাহ*, দারুল কিতাব আল-আরাবী,
বয়রুত, লেবনান (১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.)